বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

লোকরহস্য

[১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

লোকরহস্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৩৬ : দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৫২,
তৃতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৫৯
মূল্য দেড় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
৭.২—৭।৯।১৯৫২

ভূমিকা

'বিজ্ঞানরহস্য,' 'সাম্য' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে' এবং পরবর্ত্তী জীবনের অনুশীলন-তত্ত্বমূলক রচনাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের যে দিক্‌টির পরিচয় পাই, তাহাকে তাঁহার গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ গম্ভীর দিক্‌ বলিতে পারি। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক-হিসাবে পৃষ্ঠা-পূরণের এবং বিবিধ বিষয়ক আলোচনার দ্বারা পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সব্যসাচী বঙ্কিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে—'কমলাকান্ত,' 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘু দিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘু নহে। তাঁহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে। 'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল চরম কথা বলিতে পারেন নাই, 'লোকরহস্যে' ও 'কমলাকান্তে' বিদ্রূপের আবরণে সে সকল কথা অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। বাংলা দেশের চিরন্তন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে হুতোমের পরেই কমলাকান্তী বঙ্কিমের এই বিদ্রোহ। ভঙ্গীর দিক্‌ দিয়া 'লোকরহস্য'ও কমলাকান্তী। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং ইহাকে "কৌতুক ও রহস্য" (প্রথম সংস্করণের টাইটেল পেজে) বলিয়াছেন।

'বঙ্গদর্শনে' ও 'প্রচারে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সহিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির কিছু কিছু পার্থক্য আছে। যাঁহারা মিলাইয়া দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য প্রবন্ধগুলির প্রকাশের তালিকা, সংখ্যা ও পৃষ্ঠা সহ নিম্নে দেওয়া হইল—

বঙ্গদর্শন

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, প্রথম প্রবন্ধ	—বৈশাখ,	১২৭৯,	পৃ. ৩৮-৪৪
ঐ দ্বিতীয় প্রবন্ধ	—শ্রাবণ,	১২৭৯,	পৃ. ১৫৫-১৬১
ইংরাজস্তোত্র	—অগ্রহায়ণ,	১২৭৯,	পৃ. ৩৬৯-৩৭১
বাবু	—ফাল্গুন,	১২৭৯,	পৃ. ৫১০-৫১২
গর্দ্দভ	—শ্রাবণ,	১২৮০,	পৃ. ১৮৭-১৮৯

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন	—আষাঢ়,	১২৮০,	পৃ. ১২৩-১৩১*
বসন্ত এবং বিরহ	—বৈশাখ,	১২৮০,	পৃ. ১৭-২০
সুবর্ণগোলক	—চৈত্র,	১২৮০,	পৃ. ৫৫৪-৫৬১
রামায়ণের সমালোচন	— পৌষ	১২৭৯,	পৃ. ৪২০-৪২২†

[১৮৭৮ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে (পৃ. ৯৯) মাত্র উপরের রচনা কয়টি ছিল।]

বর্ষ সমালোচন	—অগ্রহায়ণ,	১২৮২,	পৃ. ৩৮১-৩৮৪
কোন "স্পেশিয়ালের" পত্র	—কার্ত্তিক,	১২৮২,	পৃ. ৩১৩-৩১৭
Bransonism	—ফাল্গুন,	১২৮৯,	পৃ. ৪৯৯-৫০৫
হনূমদ্বাবুসংবাদ	—মাঘ,	১২৮৯,	পৃ. ৪৭১-৪৭৫

প্রচার

গ্রাম্য কথা, প্রথম সংখ্যা,	—ভাদ্র,	১২৯১,	পৃ. ৬২-৬৮
ঐ দ্বিতীয় সংখ্যা,	—পৌষ,	১২৯১,	পৃ. ১৯০-১৯৪
বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর	—চৈত্র,	১২৯১,	পৃ. ৩১৭-৩২৩
New Year's Day	—পৌষ,	১২৯২,	পৃ. ২৩৭-২৪০

'লোকরহস্য' সম্বন্ধে সমালোচনামূলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও প্রবন্ধাদি লেখা হয় নাই।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত *The Indian Magazine and Review* পত্রের মার্চ সংখ্যায় মিরিয়ম এস. নাইট-কৃত "সুবর্ণগোলকে"র অনুবাদ "The Globe of Gold" নামে প্রকাশিত হয়।

* রচনাটির শেষে 'বঙ্গদর্শনে' "ক্রমশঃ" লেখা ছিল।

† এই প্রবন্ধটি দ্বিতীয় সংস্করণে পুনর্লিখিত। 'বঙ্গদর্শনে' ও প্রথম সংস্করণে "শ্রীমদ্ধনুমদ্বংশজ শ্রীমহামর্কট প্রণীত" ছিল।

সূচী

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল

প্রথম প্রবন্ধ

একদা সুন্দরবন-মধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বহুতর ব্যাঘ্র লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রাপ্রভায় অরণ্য প্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণপূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—

"অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্রকুলতিলক সকল পরস্পরের মঙ্গল সাধনার্থ এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি। আহা! কুৎসাকারী, খলস্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা এক বনেই বাস করিতে ভাল বাসি, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্যজাতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিন দিন এইরূপ জাতি-হিতৈষিতা প্রকাশপূর্ব্বক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন।" (সভামধ্যে লাঙ্গুল চট্‌চটারব।)

"এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-সমাজে বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদিগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান্ হইব। কেন না, আজি কালি সকলেই বিদ্বান্ হইতেছে। আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে, আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন।"

সভাপতির এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভ্যগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন যথারীতি কয়েকটি প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভ্যগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল। সে সকল

ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট বটে, তাহাতে শব্দবিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর ; বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপিয়া গেল।

পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, "আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গুল নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যাঘ্র বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।"

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন কোন নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পব্লিক ডিনরের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সভাপতি কর্তৃক আহূত হইয়া, গর্জ্জনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। এবং পথিকের ভীতি-বিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন ;—

"সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! মনুষ্য একপ্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহারা পক্ষবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যে যে অঙ্গ, যে যে অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেইরূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ্য নাই। কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে ; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কাল-প্রভাবে লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপন আপন মুখ চাটিলেন।) তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে। মৃগাদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মহিষাদির ন্যায় বলবান্ বা শৃঙ্গাদি আয়ুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ সংসার ব্যাঘ্র জাতির সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত—নখ দন্ত শৃঙ্গাদি বর্জ্জিত, গমনে মন্থর এবং কোমলপ্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাঘ্র জাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্য জাতিকে বড় ভাল বাসি। দৃষ্টি মাত্রেই ধরিয়া খাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারাও

বড় ব্যাঘ্রভক্ত। এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্‌বৃত্তান্ত বলি। আপনারা অবগত আছেন, আমি বহুকালাবধি দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি। আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্রভূমি সুন্দরবনের উত্তরে আছে। তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ; এক জাতি কৃষ্ণবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।"

শুনিয়া মহাদংষ্ট্রানামে এক জন উদ্ধতস্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষয়-কর্ম্মটা কি?"

বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় কহিলেন, "বিষয় কর্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোকে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্ত্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি; বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা; লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা; যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা যখন সভ্যসমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র্য স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই; এক উদর-পূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম, শ্রবণ করুন। মনুষ্যেরা বড় ব্যাঘ্রভক্ত। আমি একদা মনুষ্যবসতি মধ্যে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল, এই সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল।"

মহাদংষ্ট্রা পুনরায় বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু?"

বৃহল্লাঙ্গুল কহিলেন, "তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। ঐ জন্তুর আকার, হস্তপদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, ঐ জন্তু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত; মনুষ্যদিগেরই হৃদয়-শোণিত পান করিত; এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মরিয়া গিয়াছে। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন আপন বধোপায় সর্ব্বদা আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কথার প্রমাণ। মনুষ্যবধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি, কখন কখন সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির

দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যে মধ্যে রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বক্তৃতা হয় না। সভ্যজাতিদিগের এরূপ নিয়ম নহে। আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যদিগের নিয়মানুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বাসস্থান মাতলায় বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। তথায় এক বংশমণ্ডপ-মধ্যে একটা কোমল মাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ মণ্ডপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি, মনুষ্যেরা উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতকগুলি মনুষ্য তৎপরে সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত হইল, এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার, হাস্য, পরিহাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেহ আমার আকারের প্রশংসা করিতেছিল, কেহ আমার দন্তের, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গুলের গুণগান করিতে লাগিল। এবং অনেকে আমার উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই প্রিয়সম্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে আমাকে মণ্ডপ-সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। দুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অর্দ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি সুখে শকটারোহণ করিয়া ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। এবং লৌহদণ্ডাদিভূষিত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্য হত ছাগ মেষ গবাদির উপাদেয় মাংস শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত। অন্যান্য দেশবিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুঝিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত।

আমি বহুকাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব? আহা! তোমাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি ছাগমাংস ত্যাগ করিতাম, মেষমাংস ত্যাগ

করিতাম। (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম্ম মাত্র ত্যাগ করিতাম)—এবং সর্ব্বদা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাইতাম। হে জন্মভূমি! যত দিন আমি তোমাকে দেখি নাই, তত দিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই। দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।"

তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেক ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রুপতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।

লেক্‌চরর তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর ভুলক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য এক দিন আমার মন্দির-মার্জ্জনান্তে দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি—মনুষ্যচরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। অন্য পর্য্যটকদিগের ন্যায় অমূলক উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ, মনুষ্যসম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি; আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পুর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রজীবী হইয়াও পর্ব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঐরূপ পর্ব্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয়, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্ব্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে।*

---

* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের তারণায়ে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মাক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেমস মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা। বস্তুতঃ এই ব্যাঘ্র পণ্ডিতে এবং মনুষ্য পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

মনুষ্য-জন্তু উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী; এবং ফলমূলও আহার করে। বড় বড় গাছ খাইতে পারে না; ছোট ছোট গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যেরা ছোট গাছ এত ভালবাসে যে, আপনারা তাহার চাষ করিয়া ঘেরিয়া রাখে। ঐরূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না।

মনুষ্যেরা ফল মূল লতা গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না, বলিতে পারি না। কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু সংশয় আছে। শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্ মনুষ্যেরা বহু যত্নে আপন আপন উদ্যানে ঘাস তৈয়ার করে। আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে। নহিলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন? এরূপ আমি একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখে শুনিয়াছিলাম। সে বলিতেছিল, 'দেশটা উচ্ছন্ন গেল—যত সাহেব সুবো বড় মানুষে বসে বসে ঘাস খাইতেছে।' সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি ঘাস খাই?' আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

মনুষ্যেরা পশু পূজা করে। আমার যে প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। অশ্বদিগেরও উহারা ঐরূপ পূজা করিয়া থাকে; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধৌত ও মার্জ্জনাদি করিয়া দেয়। বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহার পূজা করে।

মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ গবাদিও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে; তাহারা গোরুর দুগ্ধ পান করে। ইহাতে পূর্ব্বকালের ব্যাঘ্র পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোরুর বৎস ছিল। আমি তত দূর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ করি, গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সে যাহাই হউক, মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই। আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য। সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ। বোধ হয়, বংশমর্য্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ।

মনুষ্যচরিত্র অতি বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। তদ্ভিন্ন তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমে ক্রমে তাহা বিবৃত করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর, দূরে একটি হরিণশিশু দেখিতে পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। অমিতোদর এইরূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া, প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একজন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, সভাপতি মহাশয় বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে দৌড়িয়াছেন। হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গুলোত্থিত করিয়া, যিনি যে দিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয়কর্ম্মের চেষ্টায় ধাবিত হইলেন। লেকচররও এই বিদ্যার্থীদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে সে দিন ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল।

পরে তাঁহারা অন্য এক দিন সকলে পরামর্শ করিয়া আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন। সে দিন নির্ব্বিঘ্নে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল। তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ করিব।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

সভাপতি মহাশয়, বাঘিনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ।

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, মানুষের বিবাহপ্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আমি একবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সকলেই মধ্যে মধ্যে অবকাশ মতে বিবাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যবিবাহে কিছু বৈচিত্র্য আছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধীন, মনুষ্যপশুর সেরূপ নহে— তাহাদের মধ্যে অনেকেই এককালীন [illegible]

মনুষ্যবিবাহ দ্বিবিধ—নিত্য এবং নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে নিত্য অথবা পৌরোহিত বিবাহই মান্য। পুরোহিতকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত বিবাহ।

মহাদংষ্ট্রা। পুরোহিত কি?

বৃহল্লাঙ্গুল। অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী মনুষ্য-বিশেষ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুষ্ট। কেন না, সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে, অনেক পুরোহিত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন; অনেক পুরোহিত সর্ব্বভুক্। পক্ষান্তরে চাল কলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমত নহে। বারাণসী নামক নগরে অনেকগুলিন ষাঁড় আছে—তাহারা চালকলা খাইয়া থাকে। তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ, তাহারা বঞ্চক নহে। বঞ্চকে যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয়।

পৌরোহিত বিবাহে এইরূপ এক জন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্ত্তী হইয়া বসে। বসিয়া কতকগুলা বকে। এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে ঐ সকল মন্ত্রের একপ্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি। বোধ হয়, পুরোহিত বলে, "হে বরকন্যা! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চালকলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার গর্ভাধানে, সীমন্তোন্নয়নে, সূতিকাগারে, চাল, কলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। সন্তানের ষষ্ঠীপূজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে—অনেক চাল কলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। তোমরা সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বদা ব্রত নিয়মে, পূজা পার্ব্বণে, যাগ যজ্ঞে রত হইবে, সুতরাং আমি অনেক চাল কলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ রহিত করিও না। যদি রহিত কর, তবে আমার চাল কলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে এক এক চপেটাঘাতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এইরূপ আজ্ঞা।"

বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্যমধ্যে এরূপ বিবাহও সচরাচর প্রচলিত। অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই যে, নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে। যদি এক জন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আমার বিবেচনায় পুরোহিতেরাই এই

অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চাল কলা পায় না—সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষা মতে সকলেই নৈমিত্তিকবিবাহকারীকে ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে, অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে।

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাসকালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত, তাঁহারাই এ বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্যপণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন। তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, সম্মানবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্র-সমাজের অনরারি মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, তাঁহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেন না, তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে। তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মহাদংষ্ট্রা। মুদ্রা কি?

বৃহল্লাঙ্গুল। মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ। যদি আপনাদিগের কৌতূহল থাকে, তবে আমি সবিশেষে সেই মহাদেবীর গুণ কীর্ত্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইহার প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম্ম প্রভৃতিতে ইহার সিংহাসন রচিত হয়। মানুষগণ রাত্রিদিন ইহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,—এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যুক্তকরে স্তব স্তুতি করিতে থাকে। যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী এক বার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাহা হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম্মই নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইহাঁর অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে ; যাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি ? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি ? মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান্ হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি "বড় বাঘ" বলি, তবে অমিতোদর, মহাদংষ্ট্রা প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্রগণকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যালয়ে "বড় মানুষ" বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই "বড় মানুষ" বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে "ছোট লোক" বলে।

মুদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, মনুষ্যালয় হইতে ইহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্ব্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রাপূজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে, সকল মনুষ্যেই পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে সহস্রে প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন করে। মুদ্রাই তাহার কারণ। মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্ব্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যলোকে বোধ হয়, এমত অনিষ্টই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহপ্রেরিত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতাতেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী—সর্ব্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ত্ব যেমন কৌতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে, পাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে, আপনাদিগের বিষয়কর্ম্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এইখানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।"

এইরূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, বিপুল লাঙ্গুলচট্‌চটার মধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনখ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, হাউ মাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনখ মহাশয় গর্জ্জনান্তে বলিলেন, "হে ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! আমি অদ্য বক্তার সদ্বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্ত্তব্য যে, বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ; মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।"

অমিতোদর। আপনি শান্ত হউন। সভ্যজাতীয়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।

দীর্ঘনখ। "যে আজ্ঞা। বক্তা অতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ কথা অপ্রকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না। বিশেষ, আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন। ব্যাঘ্র জাতির কুলরক্ষার্থ যদি কোন বাঘ কোন বাঘিনীকে আপন সহচরী করে, (সহচরী, সঙ্গে চরে) তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি। মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে। মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং প্রভুভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটি প্রভু চাহি। সকল মনুষ্যই এক এক জন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভু নিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত বিবাহ বলা যায়। সাক্ষীর নাম পুরোহিত। বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় বিবাহমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ। সে মন্ত্র এইরূপ ;—

পুরোহিত। বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে?

বর। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুত্বে নিযুক্ত করিলাম।

পুরো। আর কি?

বর। আর আমি জন্মের মত ইঁহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম। আহার যোগানের ভার আমার উপর ;—খাইবার ভার উঁহার উপর।

পুরো। (কন্যার প্রতি) তুমি কি বল?

কন্যা। আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সে দিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া দিব।

পুরো। শুভমস্তু।

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে। যথা, মুদ্রাকে বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মুদ্রা একপ্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয়; এই জন্য সচরাচর মুদ্রাসংগ্রহজন্য যত্নবান্। মনুষ্যগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, 'না জানি, মুদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী; আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে হইবে।' একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। পরদিবস আমার উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি?"

দীর্ঘনখ এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিলে পর অন্যান্য ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে সভাপতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন;—

"এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয়কর্ম্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ, হরিণের পাল কখন্ আইসে, তাহার স্থিরতা কি? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কালহরণ কর্ত্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই বলিতে চাহি যে, আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, আমরা মনুষ্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সুন্দরবনভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদ হইতে পারে, এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন না, সভ্য হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ব্যাঘ্রদিগের আহারার্থ শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এইরূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য যে, মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন।"

সভাপতি মহাশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গুলচট্‌চটারবমধ্যে উপবেশন করিলেন, তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয়কর্ম্মে প্রয়াণ করিলেন।

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলিন বড় বড় গাছ ছিল। কতকগুলিন বানর তদুপরি আরোহণ করিয়া বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, "বলি ভায়া, ভালে আছ?"

দ্বিতীয় বানর বলিল, "আজ্ঞে, আছি।"

প্রথম বানর। আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

দ্বি, বা। কেন?

প্র, বা। এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।

দ্বি, বা। অবশ্য কর্ত্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।

প্র, বা। আচ্ছা, তবে দেখ, বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত?

দ্বি, বা। না। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।

প্র, বা। সেই কথাই ভাল! নইলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের সম্মুখে পড়িব, আর আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে।

দ্বি, বা। বলুন কি দোষ!

প্র, বা। প্রথম ব্যাকরণ অশুদ্ধ। আমরা বানরজাতি, ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাঁদুরে ব্যাকরণের মত নহে।

দ্বি, বা। তার পর?

প্র, বা। ইহাদের ভাষা বড় মন্দ।

দ্বি, বা। হাঁ; উহারা বাঁদুরে কথা কয় না!

প্র, বা। ঐ যে অমিতোদর বলিল, 'ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগকে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,' ইহা না বলিয়া যদি বলিত, 'অগ্রে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন,' তাহা হইলে সঙ্গত হইত।

দ্বি, বা। সন্দেহ কি—নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন?

প্র, বা। কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কি কথা বলিতে হয়, তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচমিচ করিতে হয়, কিছু লম্ফঝম্ফ করিতে হয়, দুই এক বার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয়; উহাদের কর্ত্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।

দ্বি, বা। আমাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে উহারা বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না।

এমত সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, "আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেকগুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব্বলেখকদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানর জাতি,

চিরকাল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহাপাপ।"

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, "আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি?"

আর একটি বানর কহিল, "আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি; এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।"

এইরূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক স্থূলোদর বানর বলিল যে, "আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম, তাহাতে বৃহল্লাঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে। আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।"

ইংরাজস্তোত্র

(মহাভারত হইতে অনুবাদিত)

হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।১॥

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট, বহুল সম্পদ্‌যুক্ত; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।২॥

তুমি হর্ত্তা—শত্রুদলের; তুমি কর্ত্তা—আইনাদির; তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।৩॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী, শিকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাস-বিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে কাঁটা চাম্‌চে ধারী; অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।৪॥

তুমি একরূপে রাজপুরী মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর; আর একরূপে পণ্য-বীথিকা মধ্যে বাণিজ্য কর; আর একরূপে কাছাড়ে চাষ চাস কর; অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে! আমি তোমাকে প্রণাম করি।৫॥

তোমার সত্ত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ; তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ; তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্রাদিতে প্রকাশ। —অতএব হে ত্রিগুণাত্মক! আমি তোমাকে প্রণাম করি।৬॥

তুমি আছ, এই জন্যই তুমি সৎ। তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ; এবং তুমি উমেদারবর্গের আনন্দ; অতএব হে সচ্চিদানন্দ। তোমাকে আমি প্রণাম করি।৭॥

তুমি ব্রহ্মা—কেন না, তুমি প্রজাপতি; তুমি বিষ্ণু—কেন না, কমলা তোমার প্রতিই কৃপা করেন; এবং তুমি মহেশ্বর—কেন না, তোমার গৃহিণী গৌরী। অতএব হে ইংরাজ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ৮॥

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র; তুমি চন্দ্র, ইন্‌কম টেক্‌স তোমার কলঙ্ক; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন; তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য; অতএব হে ইংরাজ। আমি তোমাকে প্রণাম করি।৯॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে; তুমিই অগ্নি—কেন না, সব খাও; তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের।১০॥

তুমি বেদ, আর ঋক্‌যজুষাদি মানি না; তুমি স্মৃতি—মন্বাদি ভুলিয়া গিয়াছি; তুমি দর্শন—ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজ! তোমাকে প্রণাম করি।১১॥

হে শ্বেতকান্ত! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদশুভ্র মহাশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ। আমি তোমাকে প্রণাম করি।১২॥

তোমার হরিতকপিশ পিঙ্গললোহিত কৃষ্ণশুভ্রাদি নানা বর্ণশোভিত, অতিযত্নরঞ্জিত, ভল্লুকমেদমার্জ্জিত কুন্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব; অতএব হে ইংরাজ। আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৩॥

তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গাবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপ-বেশের চূড়া; পেণ্টুলন সেই ধড়া—আর হুইপ্‌ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে গোপী-বল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৪॥

হে বরদ। আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাতায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৫॥

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোষামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মনরাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৬॥

হে মানদ। আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও;—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি।১৭॥

হে ভক্তবৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোকমণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্তলিখিত দুই

একখানা পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্দ্ধা করি—অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমাকে প্রণাম করি ।১৮॥

হে অন্তর্যামিন্! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া পরোপকার করি; তুমি বিদ্বান্ বলিবে বলিয়া আমি লেখাপড়া করি। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি ।১৯॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সরি করিব; তোমার প্রীত্যর্থ স্কুল করিব; তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি ।২০॥

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চস্‌মা দিব, কাঁটা চাম্‌চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি ।২১॥

হে মিষ্টভাষিন্! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব; পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি ।২২॥

হে শুভোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাঁউরুটি খাই; নিষিদ্ধ মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না; কুক্কুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম করি ।২৩॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব; কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।২৪॥

হে সর্ব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও;—আমার সর্ব্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি ।২৫॥

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্‌হোমে নিমন্ত্রণ কর; বড় বড় কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুষ্টিস কর, অনরারী মাজিষ্ট্রেট্ কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি ।২৬॥

আমার স্পীচ্ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও,—আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি ।২৭॥

হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন! আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি ।২৮॥

বাবু

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! আমি সেই বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চস্‌মাঅলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয় বাবুদিগের চরিত্র কীর্ত্তিত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্‌, যাঁহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল, এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন! যাঁহাদিগের দশেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম;—হস্ত দুর্ব্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটু;—চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ণু; যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জ্জন করিবেন, উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।

মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। যাঁহারা কলিযুগে ভারতবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট "বাবু" অর্থে কেরাণী বা বাজারসরকার বুঝাইবে। নির্ধনদিগের নিকটে "বাবু" শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভৃত্যের নিকট "বাবু" অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক্‌, কেবল বাবুজন্মনির্ব্বাহাভিলাষী কতকগুলিন মনুষ্য জন্মিবেন। আমি কেবল তাঁহাদিগেরই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। যিনি বিপরীতার্থ করিবেন, তাঁহার এই মহাভারত শ্রবণ নিষ্ফল হইবে। তিনি গোজন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন।

হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফাটিক পাত্র ইহাঁদিগের গণ্ডূষ। অগ্নি ইহাঁদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—"তামাকু" এবং "চুরট" নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ইহাঁদিগের মুখে লাগিয়া

থাকিবেন। ইহাঁদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন। এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ইহাঁদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন। ইহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি "মদন আগুন" এবং "মনাগুন" রূপে পরিণত হইবেন। বারবিলাসিনীদিগের মতে ইহাঁদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন। বায়ুকেই ইহাঁরা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্য্যের নাম রাখিবেন, "বায়ুসেবন"। চন্দ্র ইহাঁদের গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনাবৃত। কেহ প্রথম রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষ রাত্রে শুক্লপক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন। সূর্য্য ইহাঁদিগকে দেখিতে পাইবেন না। যম ইহাঁদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন। কেবল অশ্বিনীকুমারদিগকে ইহাঁরা পূজা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে "আস্তাবল"।

হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারযোষিতের চীৎকার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন, তিনিই বাবু। যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড় ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু। যিনি উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতীপূজা করিবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু। যাঁহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলী দগ্ধ, তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজাসিসৃক্ষু, এবং বিষ্ণুর তুল্য লীলা-পটু, তিনিই বাবু। হে কুরুকুলভূষণ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদৃশ্য হইবে। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁদের লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ই থাকিবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁরাও অনন্তশয্যাশায়ী হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁদিগেরও দশ অবতার—যথা, কেরাণী, মাষ্টর, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্রসম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁরা সকল অবতারেই অমিতবলপরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী; মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র; ষ্টেশন মাষ্টার অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক; ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলাপ্রত্যাশী পুরোহিত; মৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক্ ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী; উকিল অবতারে বধ্য মোয়াক্কল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী; জমিদার অবতারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্ম্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।

মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ "ন্যাশানেল থিয়েটর," তিনিই বাবু। যিনি মিসনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু।

হে নরনাথ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম, তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, আমরা তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।

গর্দ্দভ

হে গর্দ্দভ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন।১।

আমি বহুযত্নে, গোবৎসাদির অগম্য প্রান্তর সকল হইতে, নবজলকণানিষেকসুরভি তৃণাগ্রভাগ সকল আহরণ করিয়া আনিয়াছি, আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া, মুক্তানিন্দিত দন্তে ছেদনপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপাবান্ হউন।

হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে; কেন না, আপনাকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন।

আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা দেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্ব্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন।

হে গর্দ্দভ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র। যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ, দেখিয়া থাকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিসুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহন্মুণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্ব্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্ব্বস্ব কানাইকে দাও; তোমার দয়ার পার নাই।

হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপনপূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতীমণ্ডপমধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দ্দভলোক প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দ্দভলোকে প্রবেশ করিলে, "প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল" বলিয়া, মহা গর্জ্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই।

হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠীমধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া তৈলানিষিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী অঙ্কিত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি। অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর।

তোমারই প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা—তুমি নহিলে আর কাহারও প্রতি কমলার দয়া হয় না। তিনি তোমাকে কখনও ত্যাগ করেন না, কিন্তু তুমি তাঁহাকে বুদ্ধির গুণে সর্ব্বদাই ত্যাগ করিয়া থাক। এই জন্যই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ক। অতএব হে সুপুচ্ছ! তৃণ ভোজন কর।

তুমিই গায়ক। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত স্বরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে বহুকাল তোমার অনুকরণ করিয়া, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস করিয়া, তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস খাও।

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন? তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেনরাজা দিলে,—নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন?

তুমি নানা রূপে, নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে

লোমশাবতার! আমার সমাস্থৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহ্লাদিত হইব।

হে মহাপৃষ্ঠ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোবার গাঁটরি বহ। হে লোমশ! কোন্‌টি গুরুভার, আমায় বলিয়া দাও।

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও; হে লোমশ! কোন্‌টি সুভক্ষ্য, অর্ব্বাচীনকে বলিয়া দাও।

হে সুন্দর! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি যখন গাছতলায় দাঁড়াইয়া, নববর্ষাসারসিক্ত হইতে থাক, দুই মহাকর্ণ উর্দ্ধোত্থিত করিয়া, মুখচন্দ্র বিনত করিয়া, চক্ষু দুটি ক্ষণে মুদ্রিত, ক্ষণে উন্মেষিত করিতে করিতে ভিজিতে থাক,—তোমার পৃষ্ঠে, মুণ্ডে এবং স্কন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে—তখন তোমাকে আমি বড় সুন্দর দেখি। হে লোকমনোমোহন! কিছু ঘাস খাও।

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান্; এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি; ঘাস খাইয়া সুখী কর।

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

আমরা স্ত্রীজাতি, নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া আজি কালি আমাদিগের উপর বড় অত্যাচার হইতেছে। পুরুষের এক্ষণে বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, ভর্তৃগণ স্ত্রীকে আর মানে না, স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার বশবর্ত্তী নহে। এই সকল বিষয়ের সুনিয়ম করিবার জন্য আমরা স্ত্রীস্বত্বরক্ষিণী সভা সংস্থাপিতা করিয়াছি। সে সভার পরিচয় যদি সাধারণে সবিশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপনী পশ্চাৎ প্রকাশ করিব। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের স্বত্বরক্ষার্থ সভা হইতে একটি বিশেষ সদুপায় হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছি। এবং তৎসমভিব্যাহারে ভর্তৃশাসনার্থ একটি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছি।

সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে আমাদিগের চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন আইন হয় না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাস হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে অবগত করিবার জন্য আমি তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম। অনেক বাবুলোক বাঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশেষতঃ আইনের বাঙ্গালা

অনুবাদ সচরাচর ভাল হয় না, এবং আইন আদৌ ইংরাজিতেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং ইহার বাঙ্গালা অনুবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানে স্থানে ইংরাজির সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা দুই পাঠালাম। ভরসা করি, বঙ্গদর্শনকারক একবার আমাদিগের অনুরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ত্যাগ করিয়া ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার করিবেন। সকলেই দেখিবেন যে, এই আইনটিতে নূতন কিছু নাই; সাবেক Lex Non Scripta কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

শ্রীমতী অনৃতসুন্দরী দাসী।

স্ত্রীস্বত্বরক্ষিণী সভার সম্পাদিকা।

THE MATRIMONIAL PENAL CODE.

CHAPTER I.

INTRODUCTION.

Whereas it is expedient to provide a special Penal Code for the coercion of refractory husbands and others who dispute the supreme authority of Woman, it is hereby enacted as follows :

I. This Act shall be entitled the "Matrimonial Penal Code" and shall take effect on all natives of India in the married state.

CHAPTER II.

DEFINITIONS.

2. A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal of a woman.

ILLUSTRATIONS.

(a) A trunk or a workbox is not a husband, as it is not a moving, though a moveable piece of property.

(b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion, they cannot be at the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own.

(c) Men in the married state, having no will of their own, are husbands.

3. A wife is a woman having the right of property in a husband.

EXPLANATIONS.

The right of property includes the right of flagellation.

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

প্রথম অধ্যায়

স্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসনের জন্য এক বিশেষ আইন করা উচিত, এই কারণ নিম্নের লিখিতমত আইন করা গেল।

১ ধারা। এই আইন "দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন" নামে খ্যাত হইবে। ভারতবর্ষীয় যে কোন দেশী বিবাহিত পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ ব্যাখ্যা

২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী বলা যায়।

উদাহরণ

(ক) বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে।

(খ) গোরু বাছুরও স্বামী নহে, কেন না, যদিও গোরু বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে।

(গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কার্য্য করিতে পারেন না, এজন্য গোরু বাছুরকে স্বামী না বলিয়া তাঁহাদিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে।

৩ ধারা। যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

অর্থের কথা

সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্বাধিকার থাকে, তাহাকে মারপিট করিবারও স্বত্বাধিকার থাকিবে।

৪ ধারা। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়শ্চিত্তবিশেষকে বিবাহ বলে।

CHAPTER III.

Of Punishments.

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are ;

First, Imprisonment.

Which may be either within the four walls of a bed-room, or within the four walls of a house.

Imprisonment is of two descriptions, namely,

(1) Rigorous, that is, accompanied by hard words.

(2) Simple.

Secondly, Transportation, that is to another bed-room.

Thirdly, Matrimonial servitude.

Fourthly, Forfeiture of Pocket-money.

6. "Capital punishment" under this Code, means that the wife shall run away to her paternal roof, or to some other friendly house, with the intention of not returning in a hurry.

7. The following punishments are also provided for minor offences.

First, Contemptuous silence on the part of the wife.

Secondly, Frowns.

Thirdly, Tears and lamentation.

Fourthly, Scolding and abuse.

CHAPTER IV.

General Exceptions.

8. Nothing is an offence which is done by a wife.

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the commands of a wife.

10. No person in the married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial Penal Code.

তৃতীয় অধ্যায়

দণ্ডের কথা

৫ ধারা। এই আইনের বিধানমতে অপরাধীদিগের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

প্রথম। কয়েদ।

অর্থাৎ শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ, অথবা বাটীর চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ।

কয়েদ দুই প্রকার।

(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত।

(২) বিনা তিরস্কার।

দ্বিতীয়। শয্যান্তর প্রেরণ বা শয্যাগৃহান্তর প্রেরণ।

তৃতীয়। পত্নীর দাসত্ব।

চতুর্থ। সম্পত্তিদণ্ড, অর্থাৎ নিজখরচের টাকা বন্ধ।

৬ ধারা। এই আইনে "প্রাণদণ্ড" অর্থে বুঝাইবে যে, স্ত্রী বাপের বাড়ী, কি ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া যাইবেন, শীঘ্র আসিতে চাহিবেন না।

৭ ধারা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

প্রথম। মান।

দ্বিতীয়। ভ্রূকুটী।

তৃতীয়। অশ্রুবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

চতুর্থ। গালি তিরস্কার।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ বর্জ্জিত কথা

৮ ধারা। স্ত্রীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৯ ধারা। স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১০ ধারা। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ বলিতে পারিবেন না যে, আমি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই।

CHAPTER V.

Of Abetment.

11. A person abets the doing of a matrimonial offence who

First, Instigates, persuades, induces, or encourages a husband to commit that offence.

Secondly, Joins him in the commission of that offence, or keeps him company during its commission.

Explanation.

A man not in the married state or even a woman, may be an abettor.

Illustrations.

(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink together. Drinking is a matrimonial offence. C has abetted A.

(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money in other ways than those which C approves.

As spending money in such ways is a matrimonial offence, A has abetted B.

12. When a man in the married state abets another man in the married state in a matrimonial offence. the abettor is liable to the same punishment as the principal. Provided that he can be so punished only by a competent court.

Explanation.

A competent court means the wife having right of property in the offending husband.

13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations.

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধের সহায়তার বিধি

১১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি—

প্রথম। অন্য ব্যক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয় বা উৎসাহিত বা উত্ত্যক্ত করে

দ্বিতীয়। বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে,

তবে বলা যায় যে, ঐ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

অর্থের কথা

অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকও দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিতে পারে।

উদাহরণ

(ক) রাম, কামিনীর স্বামী। যদু অবিবাহিত পুরুষ। উভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল। মদ্যপান একটি দাম্পত্য অপরাধ। যদু, রামের সহায়তা করিয়াছে।

(খ) হরমণি, রামের মা। রাম কামিনীর স্বামী। কামিনী যেরূপে টাকা খরচ করিতে বলে, সেরূপে খরচ না করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল। স্ত্রীর অনভিমত খরচ করা একটি দাম্পত্য অপরাধ। হরমণি তাহার সহায়তা করিয়াছে।

১২ ধারা। যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয়। কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত আদালত নহিলে হইবে না।

অর্থের কথা

ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায়।

১৩ ধারা। স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে, তিরস্কার, ভ্রূকুটী, এবং অশ্রুবর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র।

CHAPTER VI.

OF OFFENCES AGAINST THE STATE.

14. "The State" shall in this Code mean the married state only.

15. Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished capitally, that is by separation, or by transportation to another bed-room and shall forfeit all his pocket-money.

16. Whoever induces friends or gains over children to side with him or otherwise prepares to wage war with the intention of waging war against the wife shall be punished by transportation to another bed-room and shall also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations.

17. Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife shall be guilty of incontinence.

EXPLANATION.

(1) To show the slightest kindness to a young woman who is not the wife, is to render such young woman allegiance.

ILLUSTRATION.

A is the husband of B, and C is a young woman. A likes C's baby because he is a nice child and gives him buns to eat. A has rendered allegiance to C.

EXPLANATION.

(2) Wives shall be entitled to imagine offences under this section, and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the offence.

The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of the offence.

EXPXANATION.

(3) The right of imagining offences under this section shall be held to belong in general to old wives, and to women with old and ugly husbands; and a young wife shall not be entitled to assume the right unless she can prove that she has a particularly cross temper, or was brought up a spoilt child or is herself supremely ugly.

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্ত্রী-বিদ্রোহিতার অপরাধ

১৪ ধারা। (অনুবাদক অক্ষম)

১৫ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ করিতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ করায় সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিবেন) বা শয্যাগৃহ পৃথক্ হইবে এবং তাহার খরচের টাকা জব্দ হইবে।

১৬ ধারা। যে কেহ বন্ধুবর্গকে মুরব্বি ধরিয়া বা সন্তানদিগকে বশীভূত করিয়া বা অন্য প্রকারে স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শয্যাগৃহান্তরে প্রেরিত হইবে, এবং তিরস্কার, অশ্রুবর্ষণ এবং রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

১৭ ধারা। যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত, তাহার অপরাধের নাম লাম্পট্য।

অর্থের কথা

প্রথম। স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য করিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে।

উদাহরণ

রাম কামিনীর স্বামী। বামা অন্য এক যুবতী। বামার শিশু সন্তানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয়। রাম বামার প্রতি আসক্ত।

অর্থের কথা

দ্বিতীয়। স্বামীদিগকে নিষ্কারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা, স্ত্রীলোকদিগের অধিকার রহিল। আমি এ অপরাধ করি নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না।

"অপরাধ করিয়াছে" বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

অর্থের কথা

তৃতীয়। নিষ্কারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীনা স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষরূপে বর্ত্তিবে, অথবা যাহাদিগের স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাদিগের পক্ষে বর্ত্তিবে। যদি কোন যুবতী স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে তাঁহাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি নিজে বদমেজাজি বা আদুরে মেয়ে বা তিনি নিজে কদাকার।

18. Whoever is guilty of incontinence shall be liable to all the punishments mentioned in this Code and to other punishments not mentioned in the Code.

CHAPTER VII.

OF OFFENCES RELATING TO THE ARMY AND NAVY.

19. The army and navy shall in this Code mean the sons and the daughters and daughters-in-law.

20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter or a daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding and tears and lamentations.

CHAPTER VIII.

OF OFFENCES AGAINST THE DOMESTIC TRANQUILLITY.

21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the common object of such husbands is,

FIRST, To drink as defined below or to gamble or to commit any other matrimonial offence,

SECONDLY, To overawe by show of authority their wives from the exercise of the lawful authority of such wives,

THIRDLY, To resist the execution of a wife's order.

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by imprisonment with hard words and shall also be liable to contemptuous silence or to scolding.

OF DRINKING WINE AND SPIRITS.

23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and spirits.

24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined is said to drink.

EXPLANATION.

He is said to drink even though he never touch the liquid himself.

25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall also be liable to scolding.

১৮ ধারা। যে কেহ লম্পট হইবে, সে এই আইনের লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্য দণ্ডও হইতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

পল্‌টন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয় অপরাধ

১৯ ধারা। এ আইনে পল্‌টন অর্থে ছেলের দল। নাবিকসেনা ঝি বউ।

২০ ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধূকর্ত্তৃক গৃহিণীর প্রতি বিদ্রোহিতার সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

গৃহমধ্যে শান্তি ভঞ্জনের অপরাধ

২১ ধারা। দুই, কি তাহার অধিক বিবাহিত ব্যক্তির জনতা হইলে যদি জনতাকারীদের নিম্নের লিখিত কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে "বে আইন জনতা" বলা যায়।

প্রথম। যদি মদ্যপান করা, কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায় থাকে,

দ্বিতীয়। যদি আস্ফালন দ্বারা পত্নীদিগকে আইন মত ক্ষমতা প্রকাশ করণে নিবৃত্ত করার জন্য ভয় প্রদর্শন করার অভিপ্রায় থাকে,

তৃতীয়। যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবার অভিপ্রায় থাকে।

২২ ধারা। যে কেহ "বে আইন জনতার ব্যক্তি" হয়, সে কঠিন তিরস্কারের সহিত কয়েদ হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের সহিত দণ্ডনীয় হইবে।

মদ্যপানের কথা

২৩ ধারা। যে কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে, এবং কাচের পাত্রে পীত হয়, তাহা মদ্য।

২৪ ধারা। উক্তরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে, সেই মদ্যপায়ী।

অর্থের কথা

সে ঐ দ্রব্য স্বহস্তে স্পর্শ না করিলেও মদ্যপায়ী।

২৫ ধারা। যে মদ্যপায়ী, সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে, এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

OF RIOTING.

26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic rioting.

27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentations.

হাঙ্গামার কথা

২৬ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর প্রতি কর্কশ স্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা করে।

২৭ ধারা। যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ ও রোদন।

বসন্ত এবং বিরহ

রামী। সখি, ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন। আইস, আমরা বসন্ত বর্ণনা করি। বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহিণী; পূর্ব্বগামিনী বিরহিণীগণ চিরকাল বসন্তবর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, আইস আমরাও তাই করি।

বামী। সই, ভাল বলিয়াছ। আমরা বালিকা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া কেবল কুটনো কুটিয়া মরিলাম, আইস অদ্য কাব্যালোচনা করি।

রামী। সই! তবে আরম্ভ করি। সখি! ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে। দেখ, পৃথিবী কেমন অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন। দেখ, চূতলতা কেমন নব মুকুলিত—

বামী। বৃক্ষে বৃক্ষে শজিনা খাড়া বিলম্বিত—

রামী। মলয় মারুত মৃদু মৃদু প্রধাবিত—

বামী। তদ্বাহিত ধূলায় দন্ত কিচ্‌কিচিত।

রামী। দূর ছুঁড়ী—ও কি! শোন্। ভ্রমরগণ পুষ্পের উপর গুণ্ গুণ্ করিতেছে—

বামী। মাছিগণ ভাতের উপর ভন্ ভন্ করিতেছে—

রামী। বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে কুহু কুহু করিতেছে—

বামী। গাজনতলায় ঢাকিগণ অষ্টমস্বরে চড় চড় করিতেছে।

রামী। না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত বর্ণন হয় না। আমি শ্যামীকে ডাকি। আয় সই শ্যামি, আমরা বসন্ত বর্ণনা করি।

(শ্যামী আসিল)

শ্যামী। আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা পড়া জানি না; একটু একটু জানি মাত্র, আমি সকল বুঝিতে পারিব না—আমাকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে হবে।

রামী। আচ্ছা। দেখ সখি, বসন্ত কি অপূর্ব্ব সময়। কেমন চূতলতা সকল নব মুকুলিত—

শ্যামী। সই, আঁবের গাছই দেখিয়াছি; আঁবের লতা কোন্‌গুলা?

রামী। আঁবের লতা আছে শুনিয়াছি, কিন্তু কখন চক্ষে দেখি নাই। দেখি না দেখি, চূতলতা ভিন্ন চূতবৃক্ষ কখন পড়ি নাই। তবে চূতলতাই বলিতে হইবে, চূতবৃক্ষ বলা হইবে না।

শ্যামী। তবে বল।

রামী। চূতলতিকা নব মুকুলিত হইয়া—

শ্যামী। সই! এই বলিলে চূতলতা—আবার লতিকা হইল কেন?

রামী। আরও কিছু মিষ্ট হইল। চূতলতিকা নব মুকুলিত হইয়া চারি দিকে সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে—

বামী। ভাই, আঁবের বোল যে বসন্তকালে চুঁইয়ে গিয়া কাড়য়া ধরে।

শ্যামী। বলিলে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ দেখি।

রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে, শুনিয়া আমাদিগের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। আহা! সখি, সত্যই বলিয়াছ। সই, ভ্রমর কাকে বলে?

রামী। মর্ নেকি, তাও জানিস্‌নে। ভ্রমর বলে ভোম্‌রাকে।

শ্যামী। ভোম্‌রা কোন্‌গুলো ভাই?

রামী। ভোম্‌রা বলে ভিম্‌রুলকে।

শ্যামী। তা ভাই ভিম্‌রুল আঁবের বোল দেখে পাগল হয় কেন? ভিম্‌রুলের পাগলামি কেমনতর? ওরা কি আবোল তাবোল বকে?

রামী। কে বলেছে পাগল হয়?

শ্যামী। ঐ যে তুমি বলিলে "উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে।"

রামী। কোন্ শালী আর তোদের কাছে বসন্ত বর্ণনা করিবে!

শ্যামী। ভাই, রাগ কর কেন? তুমি বেশী লেখা পড়া শিখেছ, আমি কম শিখেছি—আমায় বুঝাইয়া দিলেই ত হয়। সকলেই কি তোমার মত রসিকে?

রামী। (সাহঙ্কারে) আচ্ছা, তবে শোন্। ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। তাহাদিগের গুণ্ গুণ্ রবে আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। সই, ভোমরার ডাক "গুণ্ গুণ্" না "ভোঁ ভোঁ" ?

রামী। কবিরা বলেন, "গুণ্ গুণ্"।

শ্যামী। তবে গুণ্ গুণ্ই বটে। তা উহাতে আমাদের প্রাণ বাহির হয় কেন ? ভিম্রুল কামড়াইলে প্রাণ বাহির হয় জানি, কিন্তু ভিম্রুল ডাকিলেও কি মরিতে হইবে ?

রামী। এ পর্য্যন্ত সকল বিরহিণীগণ গুণ্ গুণ্ রবে মরিয়া আসিতেছে, তুই কি পীর যে মর্‌বি না ?

বামী। আচ্ছা ভাই, শাস্ত্রে যদি লেখে ত না হয় মরিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি ভিম্রুলের ডাকে মরিতে হইবে, না বোলতা মৌমাছি গুব্‌রে পোকার ডাক শুনিলেও অন্তর্জলে শুইব ?

রামী। কবিরা শুধু ভ্রমরের রবেই মরিতে বলেন।

বামী। কবিদের বড় অবিচার। কেন, গুব্‌রে পোকা কি অপরাধ করেছে ?

রামী। তোর মর্‌তে হয় মরিস্, এখন শোন্।

বামী। বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে।

শ্যামী। পঞ্চম স্বর কি ভাই ?

রামী। কোকিলের স্বরের মত।

শ্যামী। আর কোকিলের স্বর কেমন ?

রামী। পঞ্চম স্বরের মত।

শ্যামী। বুঝিয়াছি। তার পর বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে; তাহাতে বিরহিণীর অঙ্গ জ্বর জ্বর হইতেছে।

বামী। আর কুঁক্‌ড়োর পঞ্চম স্বরে অঙ্গ কেমন করে ?

রামী। মরণ আর কি, কুঁক্‌ড়োর আবার পঞ্চম স্বর কি লো ?

বামী। আমার তাতেই অঙ্গ জ্বর জ্বর হয়। কুঁকড়া ডাকিলেই মনে হয় যে, তিনি বাড়ী এলেই আমায় ঐ সর্ব্বনেশে পাকী রাঁধিয়া দিতে হবে।

রামী। তার পর মলয় সমীরণ। মৃদু মৃদু মলয় সমীরণে বিরহিণী সিহরিয়া উঠিতেছে।

শ্যামী। শীতে ?

রামী। না—বিরহে। মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে শীতল, কিন্তু আমাদের পক্ষে অগ্নিতুল্য।

বামী। সই, তা সকলের পক্ষেই। এই চৈত্র মাসের দুপুরে রৌদ্রের বাতাস আগুনের হল্কা বলিয়া কাহার বোধ হয় না ?

রামী। ও লো, আমি সে বাতাসের কথা বলিতেছি না।

শ্যামী। বোধ হয়, তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলিতেছ। উত্তুরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, মলয় বাতাস তেমন নয়।

রামী। বসন্তানিলস্পর্শে অঙ্গ সিহরিয়া উঠে।

বামী। গায়ে কাপড় না থাকিলে উত্তুরে বাতাসেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

রামী। মর্ ছুঁড়ি, বসন্তকালে কি উত্তুরে বাতাস বয় যে, আমি বসন্তবর্ণনায় উত্তুরে বাতাসের কথা বলিব ?

বামী। উত্তুরে বাতাসই এখন বয়। দেখ, এখনকার যত ঝড়, সব উত্তুরে। আমার বোধ হয়, বসন্তবর্ণনে উত্তুরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত। আইস, আমরা বঙ্গদর্শনে লিখিয়া পাঠাই যে, ভবিষ্যতে কবিগণ বসন্তবর্ণনে মলয় বাতাস ত্যাগ করিয়া উত্তুরে ঝড়ের বর্ণনা করেন।

রামী। তাহা হইলে বিরহীদের কি উপায় হইবে ? তাহারা কি লইয়া কাঁদিবে ?

শ্যামী। সখি, তবে থাক। এক্ষণে তোমার বসন্তবর্ণনা—উহুঃ উহুঃ সখি ! মোলেম, মোলেম, গেলেম রে ! গেলেম রে ! [ভূমে পতন, চক্ষু মুদিত]

রামী। কেন, কেন, সই, কি হয়েছে ? হঠাৎ অমন হলে কেন ?

শ্যামী। (চক্ষু বুজিয়া) ঐ শুনিলে না ? ঐ সেওড়া গাছে কোকিল ডাকিতেছে।

রামী। সখি, আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও, তোমার প্রাণকান্ত শীঘ্রই আসিবেন। সই, আমারও ঐরূপ যন্ত্রণা হইতেছে। নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছে। (চক্ষু মুছিয়া) পাড়ার সকল পুকুরের যদি জল না শুকাইত, তবে এত দিন ডুবিয়া মরিতাম। হে হৃদয়-বল্লভ, জীবিতেশ্বর ! হে রমণীজনমনোমোহন ! হে নিশাশেষোন্মেষোন্মুখ-কমলকোরকোপমোত্তেজিতহৃদয়সূর্য্য ! হে অতলজলদলতলস্থস্তরস্তরাজিবন্মহামূল্যপুরুষরত্ন ! হে কামিনীকণ্ঠবিলম্বিতরত্নহারাধিক প্রাণাধিক ! আর প্রাণ বাঁচে না। আমি অবলা, সরলা, চঞ্চলা, বিকলা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, পীনা, নবীনা, শ্রীহীনা,—আর প্রাণ বাঁচে না। আর কত দিন তোমার আশাপথ চাহিয়া থাকিব ? যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদবান্ধবের আশা করিয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের জলের আশা করিয়া থাকে—আমি তেমনি তোমার আশা করিতেছি।

শ্যামী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) যেমন রাখাল, হারাণ গোরুর আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন বালকে ময়রার দোকান হইতে লোক ফিরিবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণাহরক গ্রাসকর্টের আশা করিয়া থাকে, হে প্রাণবন্ধো ! আমি তেমনি তোমার আশা করিয়া আছি। যেমন মাছ ধুইতে গেলে পরিচারিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মার্জ্জার গমন করে,

তেমনি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার মন গিয়াছে। যেমন উচ্ছিষ্টাবশেষ ফেলিতে গেলে, বুভুক্ষু কুক্কুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ গিয়াছে। যেমন কলুর ঘানিগাছে প্রকাণ্ডাকার বলদ ঘুরিতে থাকে, তেমনি আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয়রূপ ঘানিগাছে ঘুরিতেছে। যেমন লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কৈমাছ ভাজে, তেমনি এই বিরহচাটুতে বসন্তরূপ তপ্ত তৈলে আমার হৃদয়রূপ কৈমাছকে অহরহ ভাজিতেছে। যেমন এই বসন্তকালের তাপে শজিনা খাড়া ফাটিতেছে, তোমার বিরহসন্তাপে তেমনি আমার হৃদয় খাড়া ফাটিতেছে। যেমন এক লাঙ্গলে যোড়া গোরু যুড়িয়া ক্ষেত্রকে চাসা ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি এক প্রেমলাঙ্গলে বিরহ এবং বারস্ত্রীভক্তিরূপ যোড়া গোরু যুড়িয়া আমার স্বামী চাসা আমার হৃদয়ক্ষেত্রকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন। কথায় আর কি বলিব। বিরহের জ্বালায় আমার ডালে নুণ হয় না, পাণে চূণ হয় না, ঝোলে ঝাল হয় না, ক্ষীরে মিষ্ট হয় না। সখি, বিরহের দুঃখ যে দিন মনে হয়, সে দিন আমি তিন বেলা বই খাইতে পারি না; আমার দুধের বাটি অমনি পড়িয়া থাকে। (চক্ষু মুছিয়া) সখি, তোমার বসন্তবর্ণনা সমাপ্ত কর, দুঃখের কথায় আর কাজ নাই।

রামী। আমার বসন্তবর্ণনা শেষ হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, মলয় মারুত এবং বিরহ, এই চারিটির কথাই বলিয়াছি, আর বাকি কি?

বামী। দড়ি আর কলসী।

সুবর্ণগোলক

কৈলাসশিখরে, নবমুকুলশোভিত দেবদারুতলায় শার্দ্দূলচর্ম্মাসনে বসিয়া হরপার্ব্বতী পাশা খেলিতেছিলেন। বাজি একটি স্বর্ণগোলক। মহাদেবের খেলায় দোষ এই—আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু—প্রমাণ, পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন পূজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অদ্বিতীয়া, কেন না, তিনিই আদ্যাশক্তি। মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাঁধান—আপনার যদি পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোয়া বারো। হাঁকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পায়েন না। বলা বাহুল্য যে, দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্ব্বতীকে স্বীকৃত কাঞ্চনগোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া, পঞ্চানন ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন?"

উমা কহিলেন, "প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।"

গিরিশ বলিলেন, "ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু, এবং আমি, এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া সৃষ্টিস্থিতিলয় করিতেছি, তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার, তাহা সেই সকল নিয়মাবলির বলেই ঘটিবে। কাঞ্চনগোলকের কোন প্রয়োজন নাই। যদি ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়মভঙ্গ দোষে লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য্য দর্শন কর।"

কালীকান্ত বসু বড় বাবু। বয়স বৎসর পঁয়ত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল, পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্তবাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলেন। শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রামে বাস। কালীকান্ত, ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমাণ্টো বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে কালীকান্তবাবু দেখিলেন, একটি স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন; বলিলেন, "এটা সোণার দেখিতেছি। কেহ হারাইয়া থাকিবে। যদি কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব। এখন রাখ।"

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে, পথে পোর্টমাণ্টো নামাইল। পরে কালীকান্তবাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইল।

কিন্তু রামা আর পোর্টমাণ্টো মাথায় তুলিল না। কালীকান্তবাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল, "ওরে রামা।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা?"

রামা বলিল, "তুই বড় বেআদব, দেখিস্ যেন আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়া বেআদবি করিস্ না। তাহারা ভদ্রলোক।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে তা কি পারি? আপনি হচ্ছেন মুনিব—আপনার কাছে কি বেআদবি করিতে পারি?"

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, "প্রভো, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার স্বর্ণগোলকের কি গুণ এ ?"

মহাদেব বলিলেন, "গোলকের গুণ চিত্তবিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী ; আমি ভাবিব, আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু, কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর। কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা, রামাকে ভাবিতেছে, কালীকান্তবাবু।"

কালীকান্তবাবু যখন শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার শ্বশুর অন্তঃপুরে। কিন্তু বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে, "আরে ও খানসামাজি, তোম ছুঁয়া মৎ বইঠিও—তোম হামারা পাশ আও।" শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে, "যা বেটা মেড়ুয়াবাদী যা—তোর আপনার কাজ করগে।"

দ্বারবান্ পোর্টমান্টো নামাইয়া নিল। কালীকান্ত বলিল, "দরওয়ানজি, বাবুকে অমন করিয়া অপমান করিও না। উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

দ্বারবান্ জামাইবাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল, যেখানে জামাইবাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশী বড় লোক হইবেন। দ্বারবান্ তখন ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "গোলামকি কসুর মাপ কিজিয়ে!" রামা কহিল, "আচ্ছা, তামাকু ভেজ দেও!"

শ্বশুরবাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য। সেই বাঁধা হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিল। রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া, তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া, কলিকায় তামাকু খাইতে লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল, "দাদা ঠাকুর, এ কি এ ?" কালীকান্ত কহিল, "ওঁর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি ?"

উদ্ধব গিয়া অন্তঃপুরে কর্ত্তাকে সংবাদ দিল, "জামাইবাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাইবাবু তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত খান না।"

কর্ত্তা নীলরতনবাবু শীঘ্র বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধূলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, "সঙ্গের লোকটা সভ্যভব্য বটে—তবে জামাই বাবাজিকে কেমন কেমন দেখিতেছি।"

নীলরতনবাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকান্ত বলিল, "বাপ রে, আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি। আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তার পর আমার হবে এখন। আমি, মাঠাকুরুণ, আপনাদের খাচ্চিই ত।"

"মাঠাকুরুণ" শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, "জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী টাশুড়ী মনে করিয়াছেন—না করবেন কেন; আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বই ত আর ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না। ওঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিন্‌তে পারেন—কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।" অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাইবাবুর উপর বড় খুসি হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলিল, "জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল—সঙ্গের মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও, তবে জামাই খাবেন।"

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, "সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা, তার যায়গা হউক বাহিরে, আর জামাইয়ের যায়গা হউক ভিতরে।" গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল, "এ কি অলৌকিকতা?" এদিকে দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল। ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই।" শুনিয়া শালীরা বলিল, "বোসজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখতে পাই।" কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমাকে ঠাট্টা করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য?" একজন প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি বলিল, "আমাদের তামাসার যোগ্য কেন?—যার তামাসার যোগ্য, তার কাছে চল।" এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

সেখানে কালীকান্তের ভার্য্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

কামসুন্দরী দেখিয়া, চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "ওকি ও রঙ্গ—এ আবার কোন্ ঠাট শিখিয়া আসিয়াছ?" শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, "আজ্ঞে, আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন—আমি আপনার চাকর—আপনি মুনিব!"

রসিকা কামসুন্দরী বলিল, "তুমি চাকর, আমি মুনিব, সে আজ না কাল? যত দিন আমার বয়স আছে, তত দিন এই সম্পর্কই থাকিবে। এখন জল খাও।"

কালীকান্ত মনে করিল, "বাবা, এঁর কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই। তা, আমার সবাই ভাল।" এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র ধরিল; বলিল, "ওরে আমার সোণার চাঁদ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না।" এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল।

কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই বৌঠাকুরাণি, আপনার সাত দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রের লোক নই।" কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, "তুমি যে চরিত্রের লোক, আমি বেশ জানি—এখন জল খাও।"

কালীকান্ত বলিল, "যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক—ঠকাম করিয়াছে। আপনার কাছে হাতযোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরুজন—আমায় ছাড়িয়া দিন।"

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয়; মনে করিল যে, এ একতর নূতন রসিকতা বটে। বলিল, "প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে।" এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল।

হস্তধারণ মাত্র কালীকান্ত সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া "বাবা রে, গেলাম রে, এগো রে, আমায় মেরে ফেল্লে রে" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়িয়া আসিল। মা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া কামসুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কালীকান্ত অবসর পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লা কামি—জামাই অমন করে উঠ্‌লো কেন? তুই কি মেরেছিস্?"

বিস্মিতা কামসুন্দরী মর্ম্মপীড়িতা হইয়া কহিল, "মারিব কেন? আমি মারিব কেন—আমার যেমন পোড়া কপাল!" ক্রমে ক্রমে সুর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল—"আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন্ আবাগী আমার সর্ব্বনাশ করেছে—কে ওষুধ করেছে—" বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল।

সকলেই বলিল, "হাঁ তুই মেরেছিস্; নহিলে অমন করে কাতরাবে কেন?" এই বলিয়া সকলে, কামকে "পাপিষ্ঠা" "ডাইনী" "রাক্ষসী" ইত্যাদি কথায় ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভর্ৎসিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতনবাবু স্বয়ং এবং দ্বারবান্ ও উদ্ধব, সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে ; কিল, লাথি, চড়, চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকর কেবল বলিতেছে, "ছেড়ে দে রে, বাবা রে, জামাই মারে, এমন কখন শুনি নাই, আমার কি—তোদেরই মেয়েকে একাদশী করতে হবে।" নিকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাকরাণী হাসিতেছে, সে সর্ব্বদা কালীকান্তবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সে রামা চাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে। কালীকান্তবাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ হইল ! বাবুকে মারিয়া ফেলিল।" ইহা দেখিয়া নীলরতনবাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে বলিতে লাগিলেন, "তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্—মার বেটাকে জুতো।" এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দ্দোষী রামার উপর প্রহারবৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্ত্রমধ্য হইতে লুকান স্বর্ণগোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাকরাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতনবাবুর হস্তে দিল। বলিল, "ও মিন্সে চোর! দেখুন, ও একটা সোণার তাল চুরি করিয়া রাখিয়াছে।" "দেখি" বলিয়া নীলরতনবাবু স্বর্ণগোলক হস্তে লইলেন,—অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইয়া কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন ; তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া পরিয়া, পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, "তুই মাগি আবার এর ভিতর এলি কেন ?"

তরঙ্গ বলিল, "কাকে মাগি বলিতেছিস্ ?"

উদ্ধব বলিল, "তোকে।"

"আমাকে ঠাট্টা ?" এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া, নীলরতনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন দেখি কর্ত্তা মহাশয়, মাগির কত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে জুতা মারে।" কর্ত্তা তখন একটুখানি ঘোমটা টানিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, মৃদুস্বরে কহিলেন, "তা মেরেছেন মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। মুনিব—মারতে পারেন।"

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ও আবার কিসের মুনিব—ওও চাকর, আমিও চাকর। আপনি এমনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব ? আমি এমন চাকরি করি না।"

শুনিয়া কর্ত্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি। বুড়ো বয়সে মিন্সের রস দেখ ? আমার চাকর আবার তুমি কিসে হতে গেলে ?"

উদ্ধব অবাক্ হইল, মনে করিল, "আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি ?" উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবর্দ্ধন ঘোষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল—তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। এদিকে কর্ত্তামহাশয় গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। গোবর্দ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "তুমি উহার ভিতর যাইও না।" গোবর্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল—সে কথা তাহার কাণে গেল না; সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। "নচ্ছার মাগ, তোর ভায়া নেই" এই বলিয়া গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া তরঙ্গ বলিল, "গোবরা, তুইও কি পাগল হয়েছিস না কি ? যা, গোরুর যাব দিগে যা।" শুনিয়া গোবর্দ্ধন, তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলরত্নবাবু বলিলেন, "যা! পোড়াকপালে মিন্সে কর্ত্তাকে ঠেঙ্গিয়া খুন করলে।" এদিকে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া "আমার গায়ে হাত তুলিস" বলিয়া গোবর্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা স্বর্ণ-গোলক পড়িয়া আছে দেখিয়া গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয়, এটা কি ?"

কৈলাসে পার্ব্বতী বলিলেন, "প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন—ঐ দেখুন, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পত্নী সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতেছে। এদিকে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়, আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মুহূর্ত্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সম্বরণ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি ? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল ? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে ? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা

কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা এক বার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সম্বৃত করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্ব্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে, এবং যাহা যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না। তবে, লোকহিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধ্যে প্রচারিত করিবে।"

রামায়ণের সমালোচন

কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। অনেক সময়ে রচনা প্রায় নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয় কবিদিগের তুল্য। হিন্দু কবির পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। গ্রন্থকার যে আর কিছুদিন যত্ন করিলে একজন সুকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই কাব্যগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য্য, বানরদিগের মাহাত্ম্যবর্ণন। বানরেরা বোধ হয়, আধুনিক Bonerwal নামা হিমাচল প্রদেশবাসী অনার্য্য জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষ। অনার্য্য বানরগণকর্তৃক লঙ্কাজয় ও রাক্ষসদিগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। তখন আর্য্যেরা অসভ্য ও অনার্য্যেরা সভ্য ছিল।

রামায়ণে কিছু কিছু নীতিগর্ভ কথা আছে। বুদ্ধিহীনতার যে কত দোষ, তাহা কবি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক নির্ব্বোধ প্রাচীন রাজার চারিটি ভার্য্যা ছিল। বহু-বিবাহের বিষময় ফল সহজেই উৎপন্ন হইল। বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্রের উন্নতির জন্য, অসভ্য বৃদ্ধকে ভুলাইয়া ছলক্রমে সপত্নীগর্ভজাত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রও ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্যবশতঃ আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। ইহার সহিত মহাতেজস্বী তুর্কবংশীয় ঔরঙ্গজেবের তুলনা কর ; মুসলমান কেন এত কাল হিন্দুর উপর প্রভুত্ব করিয়াছে বুঝিতে পারিবে। রাম গমনকালে আপনার যুবতী ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। তাহাতে যাহা ঘটিবার ঘটিল।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই অসতী, এই সীতার ব্যবহারই তাহার উত্তম প্রমাণ। সীতা যেমন গৃহের বাহির হইল, অমনই অন্য পুরুষ ভজনা করিল। রামকে ত্যাগ করিয়া রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্ব্বোধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। হিন্দুরা এই জন্যই স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের বাহির করে না।

হিন্দুস্বভাবের জঘন্যতার লক্ষ্মণ আর একটি উদাহরণ। তাহার চরিত্র এরূপে চিত্রিত

হইয়াছে যে, তদ্দারা লক্ষ্মণকে কর্ম্মক্ষম বোধ হয়। অন্যজাতীয় হইলে সে একজন বড় লোক হইতে পারিত, কিন্তু তাহার এক দিনের জন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতার ফল।

আর একটি অসভ্য মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ অকর্ম্মা লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ। ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য। রাম পত্নীকে হারাইলে অনার্য্য (বানর) জাতি তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সবংশে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া রামকে দিল, কিন্তু বর্ব্বর জাতির নৃশংসতা কোথায় যাইবে? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে একদিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। দৈবে সে দিন সেটার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারি দিন মাত্র সুখে ছিল। পরে বর্ব্বরজাতির স্বভাবসুলভ ক্রোধবশতঃ পরের কথা শুনিয়া স্ত্রীটাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে সীতা খাইতে না পাইয়া রামের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া রাগ করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিল। অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপই ঘটে। রামায়ণের স্থূল তাৎপর্য্য এই।

ইহার প্রণেতা কে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। কিম্বদন্তী আছে যে, ইহা বাল্মীকি প্রণীত। বাল্মীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়। বল্মীক হইতে বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বল্মীকমধ্যে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে কি সিদ্ধান্ত স্থির করা যায় দেখা যাউক।

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। ইহা কৃত্তিবাস প্রণীত। উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে; ইহা স্বীকার করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এ বিষয়ের এক প্রমাণ। "রামায়ণ" শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। বোধ হয়, "রামায়ণ" শব্দটি "রামা যবন" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল "ব"কার লুপ্ত হইয়াছে। রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীকমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গ্রন্থ বল্মীকমধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।

রামায়ণ গ্রন্থখানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত অশ্লীলতাঘটিত। সীতার

বিবাহ, রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ, এ সকল অশ্লীলতাঘটিত না ত কি? রামায়ণে করুণরসের অতি বিরল প্রচার। বানরকর্ত্তৃক সমুদ্রবন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণরসাশ্রিত বিষয়। লক্ষ্মণভোজনে কিঞ্চিৎ বীররস আছে। বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের কিছু হাস্যরস আছে। ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মের কথা লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন।

রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাঞ্জল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে। রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে "অযোদ্ধাকাণ্ড"। গ্রন্থকার তাহা "অযোদ্ধাকাণ্ড" না লিখিয়া "অযোধ্যাকাণ্ড" লিখিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃত প্রায় দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই বিশুদ্ধ সংস্কৃতে অধিকারী।

বর্ষ সমালোচন

সম্বাদ পত্রের প্রথা আছে, নব বর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল সমালোচনা করিতে হয়। বঙ্গদর্শন* সম্বাদ পত্র নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ষসমালোচনে বাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের কি সাধ করে না? যেমন অনেকে রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন, যেমন অনেকে কালা বাঙ্গালি হইয়াও সাহেব সাজিবার সাধে কোট পেণ্টেলুন আঁটেন, আমরাও তেমনি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা হইয়াও, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্বাদ পত্রের অধিকার গ্রহণ করিব, ইচ্ছা করিয়াছি।

কিন্তু মনুষ্যজাতির এমনই দুরদৃষ্ট যে, যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই সাধে তখন বিঘ্ন ঘটে। নূতন বৎসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা লিখিতেছি অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! সর্ব্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বঙ্গদর্শন রচনাসম্বন্ধে কোন নিয়মই মানে না—অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। অতএব আমরা মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাধে বিষাদ ইত্যাদি অনুপ্রাসের লোভ সম্বরণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ শালের সমালোচন করিব। অতএব হে গত বর্ষ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচন করিব।

গত বৎসরে রাজকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, এই বৎসরে তিন শত পঁয়ষট্টি দিবস ছিল, একদিনও কম হয় নাই। প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল। কোনটির আমরা একটিও কম পাই নাই। রাজপুরুষগণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন নাই।

* এই প্রবন্ধ প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

ইহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে। অনেকে বলেন যে, এ বৎসরে গোটাকত দিন কমাইয়া দিলে ভাল হইত ; আমরা এ কথার অনুমোদন করি না ; দিন কমাইলে কেবল চাকুরিয়াদিগের বেতন লাভ এবং সম্বাদপত্রলেখকদিগের শ্রমলাঘব ; সাধারণের কোন লাভ নাই ; (আমরা মাসিক, ১২ মাসে বারখানি কেহ ছাড়িবে না।) তবে গ্রীষ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে ভাল হয় বটে ! আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বার মাসই শীতকাল থাকে, এমন একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বৎসর সকলেরই এক এক বৎসর পরমায়ু চুরি গিয়াছে। কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমাদের ৭১ বৎসর বয়স ছিল, এ বৎসর ৭২ হইয়াছে। যদি পরমায়ু চুরি গেল, তবে এক বৎসর বাড়িল কি প্রকারে ? নিন্দক সম্প্রদায়ই এমত অযথার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে।

এ বৎসর যে সুবৎসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এ বৎসর অনেকেরই সন্তান জন্মিয়াছে। টিগ্নিমেষ্টেল ডিপার্টমেণ্টের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও পুত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহার গর্ভস্রাব হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ বৎসর কতকগুলি মনুষ্য, অধিক নহে, রোগাদিতে মরিয়াছে। শুনিয়াছি যে, এদেশীয় কোন মহাসভা পার্লিমেণ্টে আবেদন করিবেন যে, এই পুণ্যভূম ভারতরাজ্যে মনুষ্য না মরিতে পায়। তাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, যদি কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্যক হয়, তবে সে পুলিষে জানাইয়া অনুমতি লইয়া মরিবে।

এ বৎসরে ফাইন্যান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের কাণ্ড অতি বিচিত্র—আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, গবর্ণমেণ্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর হউক বা না হউক, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের টাকা, হয় কিছু উদ্বর্ত্ত হইয়াছে, নয় কিছু অকুলান হইয়াছে, নয় ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর (৭৮ শালে) টেক্স বসিবে কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না, কিন্তু ভরসা করি, ৭৭ শালের এপ্রেল মাসে আমরা এ কথা নিশ্চিত বলিতে পারিব।

এ বার বিচারালয় সকলের কার্য্যের আমরা বিশেষ সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। সত্য বটে যে, যে নালিশ করিয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে বা হইবে, এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা নালিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই। আমরা ইহা বুঝিতে পারি না ; যেখানে সাধারণ বিচারালয়, সেখানে নালিশ করুক বা না করুক, বিচার চাই। কেহ রৌদ্র চাহুক বা না চাহুক, সূর্য্যদেব সর্ব্বত্র রৌদ্র করিয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চাহুক বা না চাহুক, মেঘ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং

কেহ বিচার চাহুক বা না চাহুক, বিচারকের উচিত, গৃহে গৃহে ঢুকিয়া বিচার করিয়া আসেন। যদি কেহ বলেন যে, বিচারকগণ এরূপ বিচারার্থ গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের সম্মার্জ্জনী সকল অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সম্মার্জ্জনীকে তাদৃশ ভয় করেন না—সম্মার্জ্জনীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হাকিমদিগের বিলক্ষণ পরিচয় আছে এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হইয়া থাকে। যেমন ময়ূর সর্পপ্রিয়, ইঁহারাও তেমনি সম্মার্জ্জনীপ্রিয়—দেখিলেই প্রায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা এমনও শুনিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্টের কোন অধস্তন কর্ম্মচারী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যেমন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের পুরস্কারের জন্য "অর্ডর অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" সংস্থাপিত করা হইয়াছে, সেইরূপ নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের জন্য "অর্ডর অব দি ক্রমষ্টিক্" সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষ বিশেষ গুণবান্ ডিপুটি এবং সবজজ প্রভৃতিকে বাছিয়া বাছিয়া লাকলাইনের দড়িতে এই মহারত্নটিকে বাঁধিয়া তাঁহাদিগের গলদেশে লম্বমান করিয়া দেওয়া হউক। তাঁহাদের চাপকান চেন চাদরবিভূষিত সদাকম্পবান্ বক্ষে ইহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে। রাজপ্রসাদস্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে, এত উমেদওয়ার যুটিবে যে, ঝাঁটার সঙ্কুলান করা ভার হইবে।

গত বৎসর সুবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টে এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যাহাতে সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভূত হউক। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার সদুপায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটি সংস্থাপিত করা উচিত। কোন কোন মান্য সহযোগী বলেন যে, যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতেও সুবিধা হইবে না—কেন না, বঙ্গদেশের মেঘ সকল অত্যন্ত সৌদামিনীপ্রিয়—সৌদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার লোভেও দেশদেশান্তরে যাইতে স্বীকার করিবে না। আমরা প্রস্তাব করি যে, মেঘ সকল এবালিশ করিয়া দিয়া, ভিস্তীর বন্দোবস্ত করা হউক। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এক একজন চাপরাশী বা সুযোগ্য ডিপুটি এক একজন ভিস্তীকে দীর্ঘ বংশখণ্ডে বাঁধিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া তুলিয়া ধরিবেক, ভিস্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া, পারে ত নামিয়া আসিবে। ভাল হয় না?

আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশহিতৈষিণী নন—নহিলে ভিস্তীর প্রয়োজন

হইত না। তাঁহারা যদি প্রাত্যহিক সাংসারিক কান্নাটা মাঠে গিয়া কাঁদিয়া আসেন, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয় ও মেঘ ডিপার্টমেণ্ট এবালিশ করা যাইতে পারে। তবে আমরা লোকের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলার্থ বলি যে, আকাশবৃষ্টির পরিবর্ত্তে নারীনয়নাশ্রুর আদেশ করিতে গেলে, একটু পাকা রকম পুলিষের বন্দবস্ত করা চাই। মেঘের বিদ্যুতে অধিক প্রাণী নাশ হয় না; কিন্তু রমণীনয়নমেঘের কটাক্ষ-বিদ্যুতে, মাঠের মাঝখানে, চাষা-ভূষোর ছেলেদের কি হয় বলা যায় না—পুলিষ থাকা ভাল।

শুনিলাম, শিক্ষাবিভাগে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক একটা কাণমাপা কাটি প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—তাহারা বলে, অধ্যাপকদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়গুলি মাপিয়া দেখিব—নহিলে তাঁহাদিগের নিকট পড়িব না। আমরা ভরসা করি, মাপকাটি ছোট পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই।

যাহা হউক, দুর্বৎসর হউক, সুবৎসর হউক, তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা স্থির জানিতে পারিতেছি—তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

প্রথম, বৎসরটি চলিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মতান্তর নাই।

দ্বিতীয়, বৎসর গিয়াছে, আর ফিরিবে না। ফিরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাইবেন না। নিষ্ফল হইবে।

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক! আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, আপনার ও আমার পঁচাত্তরেও ঘাস জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

কোন "স্পেশিয়ালের" পত্র

যুবরাজের সঙ্গে যে সকল "স্পেশিয়াল" আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন কোন বিলাতীয় সম্বাদপত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সে বিলাতীয় সম্বাদপত্রের নামের জন্য যদি কেহ আমাদিগকে পীড়াপীড়ি করেন, তবে আমরা লাচার হইব। সম্বাদপত্রের নাম আমরা জানি না, এবং কোথায় দেখিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ নাই। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে আপ্যায়িত করিব ইচ্ছা আছে। আমি এদেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান

করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেরূপ ঠিক সম্বাদ পাইবেন, এমন অন্যের কাছে পাইবেন না। এদেশের নাম "বেঙ্গল"। এ নাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বলিতে পারে না। কিন্তু দেশী লোকে এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা জানিবে কি প্রকারে? তাহারা বলে, পূর্ব্বে ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বলিত, তৎপ্রদেশের লোককে এখনও "বাঙ্গাল" বলে, এজন্য এদেশের নাম "বাঙ্গালা"। কিন্তু এদেশের নাম বাঙ্গালা নহে—ইহার নাম "বেঙ্গল"—তাহা আপনারা সকলেই জানেন। অতএব এ কথা কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র। আমার বোধ হয়, বেঞ্জামিন গল (Benjamin Gall) সংক্ষেপতঃ বেন্ গল নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

রাজধানীর নাম "কালকাটা" (Calcutta) "কাল" এবং "কাটা" এই দুইটি বাঙ্গালা শব্দে এই নামের উৎপত্তি। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, এই জন্যই ইহার নাম "কালকাটা"।

এদেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি কিঞ্চিৎ গৌর। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষে বোধ হয়, আফ্রিকা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিল; কেন না, সেই কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকেরই কুঞ্চিত কেশ; নরতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কুঞ্চিত কেশ হইলেই কাফ্রি। আর যাহারা কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ, বোধ হয় তাহারা উপরিকথিত বেন্ গল্ সাহেবের বংশসম্ভূত।

দেখিলাম, অধিকাংশ বাঙ্গালি মাঞ্চেষ্টরের তন্তুপ্রসূত বস্ত্র পরিধান করে। অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভারতবর্ষ মাঞ্চেষ্টরের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত। এক্ষণে মাঞ্চেষ্টরের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ কেহ আমাদিগের মত পেণ্টুলন পরে, কেহ কেহ তুর্কদিগের মত পায়জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে।

অতএব দেখ, ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে এক শত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের যে কি পরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরেজেই জানে। বাঙ্গালিতে বুঝিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় যে, আমি কয়দিনে বাঙ্গালিদিগের ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই; তবে কিছু কিছু শিখিয়াছি। এবং গোলেস্তান্ এবং বোস্তান্ নামে

যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইখানি পুস্তকের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যুধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছু কাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। পরিশেষে তাঁহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।

আমি কিছু কিছু বাঙ্গালা শিখিয়াছি। বাঙ্গালিরা হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলে, গবর্ণমেণ্টকে গবর্ণমেণ্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে, ডিষমিষকে ডিষমিষ, রেলকে রেল, ডোরকে ডোর, ডবলকে ডবল, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র।

ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ, আমাদিগের খ্রীষ্টের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের* মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক তৎপ্রণীত ভগবদ্গীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্ব্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা একপ্রকার স্থির। তাহার পর কবে ইহাদিগের ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ করি, পণ্ডিতবর মক্ষমূলর মনোযোগ করিলে এ বিষয়ে মীমাংসা করিতে পারেন। যে পণ্ডিত মীমাংসা করিয়াছেন যে, অশোকের পূর্ব্বে আর্য্যেরা লিখিতে জানিত না, সেই পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম।

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমূলর পর্য্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে আসিয়া আমি কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই। সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। বোধ হয়, এটি সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারসাজি। তাঁহারা পশারের জন্য এ ভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন।†

যাহা হৌক, উহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমরা শুনিয়াছ যে, হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত; কিন্তু তাহা নহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের নাম নিম্নে লিখিতেছি।

---

* Dr. Lorinser &c.

† সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট যথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন।

১। ব্রাহ্মণ, ২। কায়স্থ, ৩। শূদ্র, ৪। কুলীন, ৫। বংশজ, ৬। বৈষ্ণব, ৭। শাক্ত, ৮। রায়, ৯। ঘোষাল, ১০। টেগোর, ১১। মোল্লা, ১২। করাজি, ১৩। রামায়ণ, ১৪। মহাভারত, ১৫। আসাম গোয়ালপাড়া, ১৬। পারিয়া ডগ্‌স্‌।

বাঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছি, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আমি অনেকগুলিন বাঙ্গালিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি কোন্ জাতি? সকলেই বলিল, তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারিল না; কেন না, আমি সেই পণ্ডিতবর মক্ষমূলরের গ্রন্থে* পড়িয়াছি যে, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে যে, "Mitra" শব্দ "Mitre" শব্দের অপভ্রংশ, অতএব মিত্র মহাশয়কে পুরোহিত-জাতীয়ই বুঝায়।

বাঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরূপ লাখে লাখে তাহারা যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদৃশ রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে পরদানিশীন করিয়া রাখে শুনা আছে। ইহা সত্য বটে, তবে সর্ব্বত্র নয়।† যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে। আমরা যেরূপ ফৌলিংপিস লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা পৌরাঙ্গনা লইয়াও সেইরূপ করে; যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পক্ষিজাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বলিতে পারি না। আমি বাঙ্গালির কন্যার অঙ্গাভরণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও ফৌলিংপিসটিকে দুই একখানা সোণার গহনা পরাইব—দেখি, পাখী ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কি না।

তবু নয়নবাণে কেন, শুনিয়াছি বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবাণ প্রয়োগেও বড় সুপটু। হিন্দু সাহিত্যোক্ত পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গকামিনীগণের পরিত্যক্ত পুষ্পশরে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমি জানি না; যদি থাকে, তবে বাঙ্গালির মেয়েকে দুরাকাঙ্ক্ষিণী বলিতে হইবে। শুনিয়াছি, কোন বাঙ্গালি কবি নাকি লিখিয়াছিলেন, "কি ছার মিছার ধনু, ধরে ফুলবাণ"; এখন কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিতে হইবে, "কি ছার মিছার

* *Chips from a German Workshop.*

† বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

ফুল, মারে ফুলবাণ।" যাহা হউক, ফুলবাণ সচরাচর প্রচলিত না হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় ইংরেজ টেঁকা ভার হইবে—আমার সর্ব্বদা ভয় করে, আমি এই গরিব দোকানদারের ছেলে, দু-টাকার লোভে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি—কে জানে, কখন বঙ্গকুলকামিনী-প্রেরিত কুসুমশর আসিয়া, এই ছেঁড়া তাম্বু ফুটা করিয়া, আমার হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি অমনি ধপাস্ করিয়া চিতপাত হইয়া পড়িয়া যাইব! হায়! তখন আমার কি হইবে! কে মুখে জল দিবে!

আমি এমত বলি না যে, সকল বাঙ্গালির মেয়ে এরূপ ফৌলিংপিস, অথবা সকলেই এরূপ পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণে সুচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তাঁহারা নাকি ভর্ত্তৃনিয়োগানুসারেই এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত। এই ভর্ত্তৃগণ দেশীয় শাস্ত্রানুসারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটি বেদ আছে—তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোক নামক বেদে (আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে,

আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।

ইহার অর্থ এই, হে পদ্মপলাশলোচনে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর।

BRANSONISM*

জন ডিক্‌সন সাহেবকে ফৌজদারী আদালতে ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব বড় কালো, তা হলে হয় কি, সাহেব ত বটে—পাড়াগেঁয়ে কাছারিতে বিচার দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক ছুটিয়া গেল। বিচার একটা দেশী ডেপুটির কাছে হইবে। তাহাতে সাহেবের কিছু কষ্ট; তবে মনে মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গালিটা ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবে। ডিপুটি মহাশয়ের রকম দেখিয়াও তাই বোধ হয়, একটা তেকেলে বুড়ো—নিরীহ রকম ভাল মানুষ; জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে কনষ্টেবল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে ডকস্থ করিলেন। সাহেব ডকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া একটু বাঁকা বাঁকা বুলিতে বলিলেন, "সে হামাকে টোমরা হেথানে কেন আনিলো?"

হাকিম বলিল, "কি জানি সাহেব! কেন আনিলো—তুমি কি করেছ?"

সাহেব। যা করে না কেন, টোমার সাতে হামার কোন বাট হোবে না।

---

* Ilbert বিল সম্বন্ধীয় বিবাদকালে ইহা লিখিত হয়।

হাকিম। কেন সাহেব ?

সাহেব। টুমি কালা বাঙ্গালি আছে।

হাকিম। তার পর ?

সাহেব। হামি সাহেব আছে।

হাকিম। তা ত দেখ্‌ছি—তাতে কি হলো ?

সাহেব। তোমার—কি বলে ? সেটা লেই।

হাকিম। তবু ভাল—মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন ? কি নেই ?

সাহেব। সেই ঝাতে মোকদ্দমা করে—সে তুমি জানে না ?

হাকিম। সাহেব, আমি ভাল মানুষ—তোমায় এখনও কিছু বলি নাই—কিন্তু আর "তুমি" "তুমি" করিও না—জরিমানা করিব।

সাহেব। টুমি মোর জরিমানা করিতে পারে না—হামি সাহেব আছে—তোমার সেই সেটা—কি বলে—সেটা লেই।

হাকিম। কি নেই সাহেব ?

সাহেব। সেই যে—জুষ্টিকেশন।

হাকিম। ওহো—Jurisdiction ? বটে। তুমি কি বিলাতী সাহেব ?

সা। হামি সাহেব আছে।

হা। রংটা এত কাল কেন ?

সা। মুই কোয়লার কাম করেছিল।

হা। তোমার বাপের নাম কি ?

সা। বাপের নামে কোটের কি কাম আছে ?

হা। বলি সেটা জানা আছে কি ?

সা। হামার বাপ বড় আদমি ছেলো—লেকেন লামটা এখন মনে পড়্‌ছে না।

হাকিম। মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি ?

সাহেব। আমার নাম জান সাহেব—জান ডিক্‌সন্।

হা। বাপের নাম ডিক্‌সন্ নয় ?

সা। হোবে—ডিক্‌সন্ হোতে পারে—লেকেন—

বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল, "হুজুর, ওর বাপের নাম গোবর্দ্ধন সাহেব।"

সাহেব রাগ করিয়া বলিল, "গোবর্দ্ধন হইলো ত কি হইলো—তোমার বাপের নাম যে রামকান্ত—তোমার বাপ চূড়া বেচিত—আমার বাপ বড় আদমি ছেলো।"

হাকিম। তোমার বাপ কি করিত ?

সাহেব। বড় লোকের সাদি দিত।

হাকিম। সে আবার কি ? ঘটকালি করিত না কি ?

মোক্তার। আজ্ঞে না—বিবাহের বাজনার জয়ঢাক ঘাড়ে করিত।

অনেকে হাসিল। হাকিম জুরিস্‌ডিক্‌সনের আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া, বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরিয়াদীকে তলব করায় রূপার পৈছা হাতে নধর কালো কোলো একজন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, আর সে যেরূপ উত্তর দিল, নিম্নে লিখিতেছি ;—

প্রশ্ন। তোমার নাম কি ?

উত্তর। রঙ্গিণী জেলেনী।

প্রশ্ন। তুমি কি কর ?

উত্তর। বিল খালে মাছ ধরে বেচি।

আসামী সাহেব কহিল, "ঝুটা বাত ! ও সুঁটকি মাছ বেচে।"

জেলেনী বলিল, "তাও বেচি। তাইতেই ত তুমি মরেছ।"

প্রশ্ন। তোমার কিসের নালিশ ?

উত্তর। চুরির নালিশ।

প্রশ্ন। কে চুরি করেছে ?

উত্তর। (সাহেবকে দেখাইয়া) এই বাগ্দীর ছেলে।

সাহেব। মুই সাহেব আছে—মুই বাগ্দী নই।

প্রশ্ন। কি চুরি করেছে ?

উত্তর। এই ত বলিলাম—এক মুঠা সুঁটকি মাছ।

প্রশ্ন। কি রকমে চুরি করিল ?

উত্তর। আমি ডালা পাতিয়া তাতে সুঁটকি মাছ সাজাইয়া বেচিতেছিলাম—একজন খদ্দের এলো—তা তার পানে ফিরে কথা কইতেছিলাম—এমন সময়ে সাহেব ডালা থেকে এক মুঠা মাছ তুলে নিয়ে পাকেটে পুরিল।

প্রশ্ন। তার পর, তুমি টের পেলে কেমন ক'রে ?

উত্তর। পাকেটের যে আধখানা বই ছিল না—তা সাহেবের মনে ছিল না। সুঁটকি মাছ সব ফুটো দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগ করিয়া বলিল, "না বাবুজি ! ওর চুপড়িটাই ফুটো, তাই মাছ বেরইয়ে পড়েছিল।"

জেলেনী বলিল, "ওর পাকেটে দুই চারিটা মাছ পাওয়া গিয়াছিল।"

সাহেব বলিল, "সে মুই দাম দেবে ব'লে নিয়েছেলো।"

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ডিক্সন সাহেব শুঁটকি মাছ চুরি করিয়াছেন। তখন হাকিম, সাহেবের জবাব লিখিতে বসিলেন। সাহেব জবাবে কেবল এই কথা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালীর আমার উপর "জুষ্টিকেশন নেই।" সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হাকিম তাহাকে এক হপ্তা কয়েদের হুকুম দিলেন। দুই চারি দিন পরে এই কথাটা কলিকাতার একখানা ইংরেজি দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাণে গেল। পর দিন প্রভাতে সেই পত্রের সম্পাদকীয় উক্তিমধ্যে নিম্নোদ্ধৃত লীডর দেখা গেল।

THE WISDOM OF A NATIVE MAGISTRATE.—A story of lamentable failure of justice and race antipathy has reached us from the Mofussil. John Dickson, an English gentleman of good birth though at present rather in straightened circumstances had fallen under the displeasure of a clique of designing natives headed by one Rungini Jeliani, a person, as we are assured on good authority, of great wealth, and considerable influence in native society. He was hauled up before a native Magistrate on a charge of some petty larceny which, if the trial had taken place before a European magistrate, would have been at once thrown out as preposterous, when preferred against a European of Mr. Dickson's position and character. But Baboo Jaladhar Gangooly, the ebony-coloured Daniel before whose awful tribunal, Mr. Dickson had the misfortune to be dragged, was incapable of understanding that petty larcenies, however congenial to sharp intellects of his own country, have never been known to be perpetrated by men born and bred on English soil, and the poor man was convicted on evidence the trumpery character of which, was probably as well known to the magistrate as to the prosecutors themselves. The poor man pleaded his birth, and his rights as a European British subject, to be tried by a magistrate of his own race, but the plea was negatived for reasons we neither know nor are able to conjecture. Possibly the Babu was under the impression that Lord Ripon's cruel and nefarious Government had already passed into Law the Bill which is to authorize every man with a dark skin lawfully to murder and hang every man with a white one. May that day be distant yet! Meanwhile we leave our readers to conjecture from a study of the names *Jaladhar* and *Jaliani* whether

the tie of kindred which obviously exists between prosecutor and magistrate has had no influence in producing this extraordinary decision."

এই লীডর বাহির হইলে পর উহা পড়িয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জলধরবাবুকে চাপরাশি পাঠাইয়া তলব করিয়া আনিলেন। গরিব ব্রাহ্মণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে হুজুরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেলাম না করিতে করিতে, সাহেব গরম হইয়া বলিলেন, "What do you mean, Babu, by convicting a European British subject?"

ডিপুটি। What European British subject, Sir?

মাজিষ্ট্রেট। Read here, I suppose you can do that. I am going to report you to the Government for this piece of folly.

এই বলিয়া সাহেব কাগজখানা বাবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বাবু কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন। সাহেব বলিলেন, "Do you now understand?"

Deputy. Yes, Sir, but this man was not a European British subject.

Magistrate. How do you know that?

Deputy. He was very dark.

Magistrate. Do you find it laid down in the Law that a fair skin is the only evidence by which a man shall be adjudged to be a European subject?

Deputy. No, Sir.

Magistrate. Well, what other evidence did you take?

এখন ডিপুটিবাবুটি বহুকালের ডিপুটি—জানিতেন যে, তর্কে তাঁহার জিত নিশ্চিত, কিন্তু তর্কে জিতিলেই বিপদ্। অতএব সুচতুর দেশী চাকুরের যাহা কর্ত্তব্য,—তাহা করিলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "I do not presume to discuss the matter with you, Sir, I see I was wrong, and I am very sorry for it."

এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিতান্ত বোকা নহেন, ভিতরে ভিতরে একটু রঙ্গদার। এই কথা শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "Very sorry for what?"

Deputy. For convicting a European British subject.

Magistrate. Why so?

Deputy. Because it is very wrong for a native to convict a European British subject.

Magistrate. Why very wrong ?

ডিপুটিটি সাহেবকে এক হাটে কিনিতে আর এক হাটে বেচিতে পারে। অমনি উত্তর দিল, "Very wrong, because a European British subject cannot commit a crime and a native cannot judge honestly."

Magistrate. Do you admit that ?

Deputy. I do not see why I should not. I try to do my duty to the best of my ability, but I speak of my countrymen generally.

Magistrate. You don't think your countrymen ought to try Europeans ?

Deputy. Most certainly they should not. The glorious British Empire will come to an end if they do.

Magistrate. Well, Babu, I am glad to see you are so sensible. I wish all our countrymen were equally so; at least that all native magistrates were like you.

Deputy. Oh Sir ! how can you expect it, when there are men at the top of our service who think differently.

Magistrate. Are you not yourself near the top ? You must have served long.

Deputy. Unfortunately my claims to promotion have always been overlooked. I thought of speaking to you, Sir, on the subject.

Magistrate. You certainly deserve promotion. I will write to the Commissioner and see what can be done for you.

ডিপুটি তখন দুই হাতে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে জয়েণ্ট সাহেব, বড় সাহেবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিপুটি বাহির হইয়া গেল জয়েণ্ট দেখিলেন। জয়েণ্ট, বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "What could you have been saying to this fellow ?"

Magistrate. Oh ! He is very amusing.

Joint. How so ?

Magistrate. He is both fool and knave. He thinks of pleasing me by traducing his own countrymen.

Joint. And did you tell him your mind ?

Magistrate. O no ! I promised him promotion, which I will try to get for him. He has at least the merit of not being conceited. A

conceited native is perfectly useless as a subordinate, and I prefer encouraging men to make a moderate estimate of their own merits.

এ দিকে, ডিপুটি ফিরিয়া আসিলে পর, আর এক ডিপুটি বাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দোশরা ডিপুটি জলধরকে বলিলেন, "সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না কি ?"

জলধর। হাঁ। কি পাপে পড়েছি ?

২রা ডিপুটি। কেন ?

জলধর। সে দিনকার সেই বাগ্দী বেটাকে কয়েদ দিয়াছিলাম বলিয়া, সাহেব বলে, গবর্ণমেণ্টে আমার নামে রিপোর্ট করিবে।

২রা ডিপুটি। তার পর ?

জলধর। তার পর আর কি ? প্রমোশ্যনের রিপোর্ট করিয়ে এলেম।

২রা ডিপুটি। সে কি ? কি মন্ত্রে ?

জলধর। মন্ত্র আর কি ? ছুটো মন রাখা কথা।

হনুমদ্বাবুসংবাদ

একদা প্রাতঃসূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত কদলীকুঞ্জে শ্রীমান্ হনূমান্ বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার পরম রমণীয় লাঙ্গুলবল্লী চক্রে চক্রে কুণ্ডলীকৃত হইয়া কখন পৃষ্ঠে, কখন স্কন্ধে, কখন বৃক্ষশাখায় শোভিত হইতেছিল। চারি পাশে মর্ত্তমান, চাঁপা, কাঁঠালি প্রভৃতি নানাজাতীয় সুপক্ক এবং অপক্ক রম্ভা বৃক্ষ হইতে থরে থরে, কাঁদিতে কাঁদিতে শোভা পাইয়া সুগন্ধে দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। বীরবর, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা পাড়িয়া, কখন আঘ্রাণ, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চর্ব্বণ করিয়া কদলীজাতীয় ফলমাত্রের অনন্ত মাধুর্য্য সম্বন্ধে বহুতর মানসিক প্রশংসা করিতেছেন। এমত সময়ে দৈবযোগে বুট, কোট, পেন্টালন, চেন, চসমা, চুরট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত। হনূমান্চন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "কে এ ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিষ্কিন্ধ্যা হইতে এ আসিতেছে। এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।"

এই ভাবিয়া, মহাত্মা পবনাত্মজ এক সরস চম্পককদলীবৃক্ষ হইতে উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ এক গুচ্ছ সুপক্ক কদলী উন্মোচন করিয়া আঘ্রাণ করিলেন। এবং তাহার ঘ্রাণে পরিতুষ্ট

হইয়া অতিথিসৎকারে তৎপ্রয়োগ মনে মনে স্থির করিলেন। ইত্যবসরে সেই টুপিকোট-পরিবৃত মোহন মূর্ত্তি বীরবরের সম্মুখাগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল। বলিল—"Good morning Mr. Hanuman! how do you do? So glad to see you! Ah! I see you are at break-fast already."

হনূমান্ কহিলেন, "কিমিদং? কিং বদসি?"

বাবু। What's that? I suppose that is the Kish-kinda patois? It is a glorious country—is it not? "There is a land of every land the pride."—and so on, as you know.

হনূ। কস্ত্বং! কস্মাজ্জনপদাৎ আগতোসি?

বাবু। (জনান্তিকে) It seems most barbarous gibberish—that precious lingo of his; but I suppose I must put up with it. (প্রকাশ্যে) My dear Mr. Monkey, I am ashamed to confess that I am not quite familiar with your beautiful vernacular. I dare say it is a very polished language. I presume you can talk a little English.

তখন সেই মহাবীর পবননন্দন সহসা মহাচক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বৃহৎ লাঙ্গুলপাশ বিস্তারণ পূর্ব্বক তাহা বাবুজি মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত করিলেন। এবং কুণ্ডলী করিয়া জড়াইতে লাগিলেন। তখন বাবু মহাশয় হাঁ করিয়া ফেলিলেন, মুখের চুরট পড়িয়া গেল। বলিলেন, "I say—this seems somewhat—"

লেজের আর এক পেঁচ।

"Somewhat unmannerly—to say the least—"

আর এক পেঁচ।

"Dear Mr. Hanuman—you will hurt me."

আর এক পেঁচ।

"Kind—good Mr. Hanuman."

হনূমান্ তখন বাবু মহাশয়কে লেজে করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া ফেলিলেন, বাবুর টুপি, চসমা, এবং চাবুক পড়িয়া গেল; কোট-পকেট হইতে ঘড়ি বাহির হইয়া চেনে ঝুলিতে লাগিল। তখন বাবুর মুখ শুকাইল—ডাকিলেন, "ও হনূমান্ মহাশয়, ঘাট হয়েছে, ছাড়! ছাড়! ছাড়! রক্ষা কর! গরিবের প্রাণ যায়।"

তখন হনূমান্, বাবুর প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে ভূতলে স্থাপনপূর্ব্বক লাঙ্গুলপাশ হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করিলেন। অবসর পাইয়া বাবু টুপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া

পরিলেন। হনুমান্ বলিলেন, "মহাশয়! দুঃখিত হইবেন না। আপনার বুলি ইংরেজি, বেশ কিষ্কিন্ধ্যা, এবং মূর্খতা পাহাড়ে-রকম দেখিয়া আপনার জাতি নিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়াছি। এক্ষণে—"

বাবু। এক্ষণে কি ?

হনূ। এক্ষণে বুঝিয়াছি যে, আপনার জন্ম বঙ্গদেশীয় কোন মহিলার গর্ভে। এখন আপনি ক্লান্ত আছেন—একটা কদলী ভোজন করিবেন ?

এখন বাবুজির যেরূপ জিব শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে একটু সরস কদলী ভোজন অতিশয় আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল—তিনি তখন প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন, "With the greatest pleasure."

হনূ। আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এবং বার্ত্তাকু অনুসন্ধানে আমি মধ্যে মধ্যে সে দেশে গমন করিয়া থাকি ; এবং তদ্দেশীয়া সুন্দরীগণ বড়ি নামে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাও কদাপি বিনানুমতিতে রামানুচর-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি। অতএব আমি বাঙ্গালা উত্তম বুঝি। অতএব মাতৃভাষাতেই আমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বাবু। তার আশ্চর্য্য কি ? আপনি কলা দিতে চাহিতেছেন ? আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত আপনার কদলী ভক্ষণ করিব।

হনুমান্ তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা ফেলিয়া দিলেন। সে দেবদুর্লভ কদলী খাইয়া বাবু অতিশয় প্রীত হইলেন। হনূমান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কলা ?"

বাবু। অতি মিষ্ট—delicious !

হনূ। হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ! মাতৃভাষায় কথা কও।

বাবু। ওটা আমার ভুল হইয়াছে, এইবার আমাকে Excuse করুন—

হনূ। তাই বা কাকে বলে ?

বাবু। আমাকে মাপ করুন—আমি বড়—কি বলব ?—ইংরেজি কথাটা forgetful—তার বাঙ্গালা কি ?

হনূ। বৎস! তোমার কথোপকথনে আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আরও কলা খাইতে পার। যত ইচ্ছা তত খাইতে পার। গাছে আছে, পাড়িয়া দিতেছি। আর আমা হইতে তোমার যদি কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহাও আমাকে বল, আমি তৎসাধনে তৎপর হইব।

বাবু। ধন্যবাদ, হে আমার প্রিয় বানর মহাশয়! এক্ষণে আপনার প্রতি আমি অতিশয় বাধ্য বোধ করিব, আপনি যদি দয়ালুরূপে আমাকে একটি বিষয় বুঝাইয়া দেন।

হনূ। কি বিষয়, হে বিদ্বন্ ?

বাবু। সেই বিষয়, হনূমন্, যাহার অনুরোধে আপনার এখানে আসিয়াছি। আপনি রামরাজ্য দেখিয়াছেন। রামরাজ্যের মত রাজ্য না কি কখন হয় নাই—কেহ কেহ বলেন, সে সকল গল্প মাত্র, fable—

হনূ। (চক্ষু আরক্ত, এবং দংষ্ট্রা বিমুক্ত) রামরাজ্য গল্প। বেটা, তবে আমিও গল্প? তবে আমার এই লাঙ্গুলও একটা গল্প? দেখ্, তবে কেমন গল্প!

এই বলিয়া মহাক্রোধে হনূমান্ সেই অনন্ত কুণ্ডলীকৃত মহালাঙ্গুল আবার বাবু বেচারার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। তখন বাবু বিশুষ্কবদনে বলিলেন, "থাম থাম, হে মহালাঙ্গুল, তুমিও গল্প নও—তোমার লাঙ্গুল ত নহেই—সে বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি। কাজে কাজেই তোমার রামরাজ্যও গল্প নহে—The proof of the pudding is in the eating thereof—কথাটা কি, তুমি রামের দাস—আমি ইংরেজের দাস। তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড়? আমার ইংরেজ রাজ্যে একটা নূতন জিনিস হইয়াছে—তোমার রামরাজ্যে তা ছিল কি?

হনূ। জিনিসটা কি? সুপক্ক কদলী?

বাবু। তা না। local self-government.

হনূ। সে কি?

বাবু। স্থানীয় আত্মশাসন। ছিল তোমাদের?

হনূ। ছিল না ত কি? স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থানবিশেষে আত্মশাসন? তাহা আমরা সর্ব্বদাই করিতাম। আমার আত্মশাসন ছিল লাঙ্গুলে। লাঙ্গুলে আমি আত্মশাসন না করিলে ত্রেতাযুগের অর্দ্ধেক লোক সমুদ্রে চুবুনি খেয়ে মরিত। যখনই আমার লেজ সড়্ সড়্ করিত, ইচ্ছা হইত অমুকের গলায় দিই; তখনই আমি লাঙ্গুল স্থানে আত্মশাসন করিতাম—লেজটাকে পদদ্বয়মধ্যে লুক্কায়িত করিতাম। এমন কি, যে দিন স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা দেবীকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বলেন, সে দিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাকিলে—এই লাঙ্গুল রামচন্দ্রের গলাতেই যাইত—আমার স্থানীয় আত্মশাসনগুণে লেজ পদদ্বয়মধ্যে বিন্যস্ত হইল। আরও আমরা যখন লঙ্কা অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম, তখন আহারাভাবে আমাদের সকলেরই আত্মশাসন উদরে নিহিত হইয়া সে অঞ্চলে স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

বাবু। মহাশয়ের বুঝিবার ভুল হইয়াছে—সেরূপ আত্মশাসনের কথা বলিতেছি না।

হনূ। শোনই না, স্থানীয় আত্মশাসন বড় ভাল। যথা—স্ত্রীলোকের আত্মশাসন রসনায় হইলে উত্তম স্থানীয় আত্মশাসন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আত্মশাসন শুনিয়াছি না কি ছানা সন্দেশের হাঁড়িতে স্থানীয় হইলেই বড় ভাল হয়। তোমাদের আত্মশাসন—

বাবু। কোথায়? পৃষ্ঠে?

হনূ। না। তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনান্তরের ক্ষেত্র বটে—কিন্তু তোমাদের আত্মশাসনের যথার্থ ক্ষেত্র তোমাদের চক্ষু দুইটি।

বাবু। সে কি রকম?

হনূ। তোমাদের কান্না পাইলেও তোমরা কাঁদ না। সে ভাল। রাত্রিদিন ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান করিলে, প্রভুগণ জ্বালাতন হইবার সম্ভাবনা।

বাবু। সে যাহাই হউক, আমি সে অর্থে স্থানীয় আত্মশাসনের কথা বলিতে-ছিলাম না।

হনূ। তবে কি অর্থে?

বাবু। শাসন কাহাকে বলে, জানেন ত?

হনূ। অবশ্য। তোমাকে চড় মারিলে তুমি শাসিত হইলে। এই ত শাসন?

বাবু। তা নয়, রাজশাসন জানেন না?

হনূ। তা জানি। কিন্তু সে অর্থে, তুমি নিজে রাজা না হইলে আত্মশাসন করিবে কি প্রকারে?

বাবু। (স্বগত) একেই বলে বাঁদুরে বুদ্ধি। (প্রকাশ্যে) যদি রাজা দয়া করিয়া আপনার কাজ আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেন?

হনূ। তা হলে সে রাজারই লাভ। তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়া পাটরাণী নিয়ে রঙ্গ করুন, আর আমরা তাঁর খাটুনি খেটে মরি। এই বুঝি তোমাদের রামরাজ্য? হা রাম!

বাবু। কথাটা এখনও আপনার বোঝা হয় নাই। Freedom—liberty কাহাকে বলে জানেন?

হনূ। কিষ্কিন্ধ্যার কলেজে ওসব শেখায় না।

বাবু। Freedom বলে স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানেন ত?

হনূ। আমি বনের পশু, স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি জান?

বাবু। ভাল। তা যে পরিমাণে মনুষ্য স্বাধীন হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

হনূ। অর্থাৎ যে পরিমাণে মনুষ্য পশুভাব প্রাপ্ত হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

বাবু। মহাশয়! রাগ করিবেন না। কিন্তু এ কথাগুলা নিতান্ত হনুমানের মত হইতেছে।

হনূ। আমি ত তাহাই, বাবুর মত কথাগুলি কি শুনি।

বাবু। স্বাধীনতাশূন্য মনুষ্যজন্মই পশুজন্ম। পরাধীনেরা গো মহিষাদির ন্যায়

রজ্জুবদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রাজপুরুষেরা আজন্ম স্বাধীন—free-born.

হনূ। আমাদের মত।

বাবু। আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ।

হনূ। আমরাও সেই লক্ষণবিশিষ্ট। আমাদের মধ্যে আত্মশাসন ভিন্ন রাজশাসন নাই। আমরা পৃথিবীমধ্যে স্বাধীন জাতি। তোমরা কি আমাদের মত হইতে চাও?

বাবু। ছি! ছি! বুঝিলাম, বাঁদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না।

হনূ। ঠিক কথা ভাই। আইস, দুই জনে কদলী ভোজন করি।

গ্রাম্য কথা

প্রথম সংখ্যা—পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়

টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটিতেছি। বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দেখিয়া, তাহার পরচালার নীচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি ছেলে বই হাতে বসিয়া পড়িতেছে। এক জন পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পড়াইতেছেন। কাণ পাতিয়া একটু পড়ানটা শুনিলাম। দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ। একটু উদাহরণ দিতেছি। পণ্ডিত মহাশয় এক জন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি হয়?"

ছাত্রটি কিছু মোটা-বুদ্ধি, নাম শুনিলাম, "ভোঁদা।" ভোঁদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আজ্ঞা, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভুক্ত হয়।"

পণ্ডিত মহাশয়, ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে "মূর্খ!" "গর্দ্দভ!" প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত বাক্যে অসংস্কৃত করিলেন। ছাত্রও কিছু গরম হইয়া উঠিল, বলিল, "কেন পণ্ডিত মহাশয়! ভুক্ত শব্দ কি নাই?"

পণ্ডিত। থাকিবে না কেন? ভুক্ত কিসে হয়, তা কি জানিস্ না?

ছাত্র। তা জানিব না কেন? ভাল করিয়া চিবিয়া গিলিয়া ফেলিলেই ভুক্ত হয়।

পণ্ডিত। বেল্লিক! বানর! তাই কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি?

তখন ভোঁদার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, রাম, তুমিই বল দেখি, ভুক্ত শব্দ কি প্রকারে হয়?"

রাম বলিল, "আজ্ঞা, ভুজ ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া ভুক্ত হয়।"

পণ্ডিত মহাশয় ভোঁদাকে বলিলেন, "শুন্‌লি রে ভোঁদা? তোর কিছু হবে না।"

ভোঁদা রাগিয়া বলিল, "না হয় না হোক্—আপনার যেমন পক্ষপাত।"

পণ্ডিত। পক্ষপাত আবার কি রে, হনূমান্!

ভোঁদা। ওর কপালে "ভুজো", আমার কপালে ভূ?

ছাত্র যে সুচর্ব্বণীয় "ভুজো" এবং অদৃষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে, পণ্ডিত মহাশয় তাহা বুঝিলেন না। রাগ করিয়া ভোঁদাকে এক ঘা প্রহার করিলেন, এবং আদেশ করিলেন, "এখন বল্, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি হয়?"

ভোঁদা। (চোখে জল) আজ্ঞে, তা জানি না।

পণ্ডিত। জানিস্ নে? ভূত কিসে হয়, জানিস্ নে?

ভোঁদা। আজ্ঞে তা জানি। মলেই ভূত হয়।

পণ্ডিত। শূওর! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক'রে ভূত হয়।

ভোঁদা এতক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলেও তা হয়। তখন সে বিনীতভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয়?"

পণ্ডিত মহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বিরাশী সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। ছাত্র পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল, রঙ্গ দেখিবার জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভোঁদার মাতার গৃহ বিদ্যালয় হইতে বড় বেশী দূর নয়। ভোঁদা গৃহপ্রবেশকালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল, এবং আছাড়িয়া পড়িল। দেখিয়া ভোঁদার মা তার কাছে এসে সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে, বাবা?"

ছেলে মাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল, "এখন কি হয়েছে, বাবা! এমন ইস্কুলে আমায় পাঠাইয়েছিলি কেন পোড়ারমুখী?"

মা। কেন, কি হয়েছে, বাবা?

ছেলে। পোড়ারমুখী এখন বলেন, কি হয়েছে, বাবা! শিগ্‌গির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক। শিগ্‌গির হোক! আমি তোর শ্রাদ্ধ করি।

মা। সে আবার কি বাপ! কাকে বলে?

ছেলে। শিগ্‌গির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক! শিগ্‌গির হোক।

মা। সে কি মরাকে বলে বাপ?

ছেলে। তা না ত কি? আমি তাই বল্‌তে পারি নাই ব'লে পণ্ডিত মশাই আমায় মেরেছে।

মা। অধঃপেতে মিন্‌সে! আক্কেল নেই! আমার এই এক রত্তি ছেলের আর কত বিদ্যা হবে! যে কথা কেউ জানে না, তাই বল্‌তে পারে নি ব'লে ছেলেকে মারে! আজ মিন্‌সেকে আমি একবার দেখ্‌বো।

এই বলিয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা পণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। আমিও পিছু পিছু চলিলাম। সেই সুপুত্রবতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না। তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যেই উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। তখন ভোঁদার মা বলিল, "হ্যাঁ গা পণ্ডিত মহাশয়, যা কেউ জানে না, আমার ছেলে তাই বল্‌তে পারে নি ব'লে কি এমনি মার মার্‌তে হয়?"

পণ্ডিত। ও গো, এমন কিছু শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভূত কেমন ক'রে হয়।

ভোঁদার মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই। তা ও সব কথা ও ছেলেমানুষ কেমন ক'রে জান্‌বে গা? ও সব কথা আমাদের জিজ্ঞাসা কর।

পণ্ডিত। ও গো, সে ভূত নয় গো।

ভোঁদার মা। তবে কি গোভূত?

পণ্ডিত। সে সব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কি বুঝ্‌বে? বলি, একটা ভূত শব্দ আছে।

ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি। তা ও ছেলেমানুষ, ওকে কি ও সব কথা ব'লে ভয় দেখাতে আছে?

আমি দেখিলাম যে, এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যা, শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, "মহাশয়, ও স্ত্রীলোক, ওর সঙ্গে বিচার ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ের কিছু বিচার করুন।"

পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, "আপনি প্রশ্ন করুন।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, ভূত ভূত করিতেছেন, বলুন দেখি ভূত কয়টি?"

পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল। পণ্ডিতে পণ্ডিতের মতই কথা কয়। শুন্‌লি মাগী?" তার পর আমার দিকে ফিরিয়া, এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা নামাইতেছেন। বলিলেন, "ভূত পাঁচটি।"

তখন ভোঁদার মা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তবে রে মিন্‌সে? তুই এই বিদ্যায় আমার ছেলে মারিস্! ভূত পাঁচটা! পাঁচ ভূত, না বারো ভূত?"

পণ্ডিত। সে কি, বাছা! ও ঠাকুরটিকে জিজ্ঞাসা কর, ভূত পঞ্চ। ক্ষিত্যপ্—

ভোঁদার মা। বারো ভূত নয় ত আমার এতটা বিষয় খেলে কে? আমি কি এমনই দুঃখী ছিলাম?

ভোঁদার মা তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন তাহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক বলিলাম, "উনি যা বলিলেন, তা হতে পারে। অনেক সময়েই শুনা যায়, অনেকের বিষয় লইয়া ভূতগণ আপনাদিগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে। কখন শোনেন নাই, অমুকের টাকাটায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে?"

কথাটা শুনিয়া, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, কি সত্য বলিতেছি। কেন না, বুদ্ধিটা কিছু স্থূল। তাঁকে একটু ভেকাপানা দেখিয়া আমি বলিলাম, "মহাশয় এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ ত সকলই অবগত আছেন। মনু বলিয়াছেন,—

"কৃপণানাং ধনঞ্চৈব পোষ্যকুষ্মাণ্ডপালিনাম্।
ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ॥"*

পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃতজ্ঞান ঐ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত পর্য্যন্ত। কিন্তু এ দিকে বড় ভয়, পাছে সেই শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষতঃ ভোঁদার মার সম্মুখে আমার কাছে পরাস্ত হয়েন—অতএব যেমন শুনিলেন, "ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ।" অমনই উত্তর করিলেন, "মহাশয়, যথার্থই আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদেই ত আছে,—

"অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ"

শুনিয়া ভোঁদার মা বড় তৃপ্ত হইল। এবং পণ্ডিত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল, "তা, বাবা! তোমার এত বিদ্যা, তবু আমার ছেলে মার কেন!"

পণ্ডিত। আরে বেটি, তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান্ করিব বলিয়াই ত মারি। না মারিলে কি বিদ্যা হয়?

ভোঁদার মা। বাবা! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ীর কর্ত্তাটির কিছু হলো না কেন? ঝাঁটায় বল, কোঁস্তায় বল, আমি ত কিছুতেই কসুর করি না।

পণ্ডিত। বাছা! ও সব কি তোমাদের হাতে হয়? ও আমাদের হাতে।

ভোঁদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই। দেখিবে?

এই বলিয়া ভোঁদার মা একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয়, এইরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন।

---

* অস্যার্থ। কৃপণদিগের ধন আর যাঁহারা পোষ্যপুত্ররূপ কুষ্মাণ্ডগুলি প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগের ধন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিত মহাশয়, আর ভোঁদাকে কিছু বলেন নাই। ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই। ভোঁদা বলে, "মা, এক বাঁকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া করিয়াছে।"

দ্বিতীয় সংখ্যা—ধৰ্ম্ম-শিক্ষা

I. THEORY.

"পড় বাবা, মাতৃবৎ পরদারেষু।"

ছেলে। সে কাকে বলে, বাবা?

বাপ। এই যত স্ত্রীলোক পরের স্ত্রী, সবাইকে আপনার মা মনে করিতে হয়।

ছেলে। তারা সবাই আমার মা?

বাপ। হাঁ বাবা, তা বৈ কি।

ছেলে। বাবা, তবে তোমার বড় জ্বালা হলো। আমার মা হ'লে তারা তোমার কে হলো, বাবা?

বাপ। ছি! ছি! ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে! পড়,

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।"

ছেলে। অর্থ কি হলো, বাবা?

বাপ। পরের সামগ্রীকে লোষ্ট্রের মত দেখ্‌বে।

ছেলে। লোষ্ট্র কি?

বাপ। মাটির ঢেলা।

ছেলে। বাবা, তবে ময়রা বেটাকে আর সন্দেশের দাম না দিলেও হয়—মাটির ঢেলার আর দাম কি?

বাপ। তা নয়। পরের সামগ্রী মাটির মত দেখ্‌বে—নিতে যেন ইচ্ছা না হয়।

ছেলে। বাবা, কুমারের ব্যবসা শিখ্‌লে হয় না?

বাপ। ছি বাবা! তোমার কিছু হবে না দেখ্‌ছি। এখন পড়,

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

ছেলে। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কি, বাবা?

বাপ। এই আপনার মত সকলকেই দেখ্‌বে।

ছেলে। তা হলেই ত হলো। যদি পরকে আপনার মত ভাবি, তা হলে পরের সামগ্রীকে আপনারই সামগ্রী ভাব্‌তে হবে, আর পরের স্ত্রীকেও আপনার স্ত্রী ভাব্‌তে হবে।

বাপ। দূর হ! পাজি বেটা, ছুঁচো বেটা। (ইতি চপেটাঘাত)

II. PRACTICE.

(১)

কাদম্বিনী নামে কোন প্রৌঢ়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। তখন অধীতশাস্ত্র সেই বালক, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ছেলে। বলি, মা!

কাদম্বিনী। কেন, বাছা? আহা, ছেলেটির কি মিষ্ট কথা গো! শুনে কাণ জুড়ায়।

ছেলে। মা, সন্দেশ খেতে একটি পয়সা দে না মা!

কাদম্বিনী। বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথা পাব, বাবা?

ছেলে। দিবিনে বেটি? মুখপুড়ি! হতভাগি! আঁটকুড়ি!

কাদ। আ মলো! কাদের এমন পোড়ারমুখো ছেলে!

ছেলে। দিবিনে বেটি! (ইতি প্রহার এবং কলসী-ধ্বংস)

(পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত)

বাপ। এ কি, রে বাঁদর?

ছেলে। কেন, বাবা! এ যে আমার মা। মার সঙ্গে যেমন করি, ওর সঙ্গেও তেমনি করেছি—"মাতৃবৎ পরদারেষু।" কই মাগি, বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দিলে নে?

(২)

ময়রা আসিয়া ছেলের বাপের কাছে নালিশ করিল যে, ছেলের জ্বালায় আর দোকান করা ভার, ছেলে দোকান লুঠ করিয়া সকল মিঠাই মণ্ডা লইয়া আসে। গোয়ালা আসিয়া ক্ষীর ছানা সম্বন্ধে সেইরূপ নালিশ করিল।

বাপ তখন ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন। ছেলে বলিল, "মার কেন বাবা?"

বাপ। মার্‌ব না? তুই পরের দ্রব্য সামগ্রী লুটে পুটে আনিস্।

ছেলে। বাবা, চোরের ভয় হয়েছে, তাই ঢিল কুড়িয়ে জমা করেছি—পরের সামগ্রী ত ঢিল।

(৩)

সরস্বতীপূজা উপস্থিত। বাপ প্রাতঃকালে ছেলেকে বলিলেন, "যা, একটা ডুব দিয়ে এসে অঞ্জলি দে—নহিলে খেতে পাবিনে।"

ছেলে। খেয়ে দেয়ে বিকেলে অঞ্জলি দিলে হয় না?

বাপ। তাও কি হয়? খেয়ে কি অঞ্জলি দেওয়া হয়, রে পাগল?

ছেলে। তবে এ বছরের অঞ্জলি আর বছরে একেবারে দিলে হয় না? এবার বড় শীত।

বাপ। তা হয় না—সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিলে কি বিদ্যা হয়?

ছেলে। একটা বছর কি ধারে বিদ্যা হয় না?

বাপ। দূর, মূর্খ! যা, ডুব দিয়ে আসগে যা। অঞ্জলি দেওয়া হ'লে দুটো ভাল সন্দেশ দেব এখন।

"আচ্ছা" বলিয়া ছেলে নাচিতে নাচিতে ডুব দিতে গেল। বড় শীত—তেমনি বাতাস—জল কন্‌কনে। তখন ছেলে ভাবিয়া চিন্তিয়া, ঘাটে একটা পাঁচ বছরের বাগ্দীর ছেলে রহিয়াছে দেখিয়া, তাহাকে ধরিয়া, গোটা দুই চুবানি দিল। তার পর তাকে জল হইতে তুলিয়া টানিয়া বাপের কাছে ধরিয়া আনিল। বলিল, "বাবা! নেয়ে এসেছি।"

বাপ। কই বাপু,—কই নেয়েছ?

ছেলে। এই যে বাগ্দী ছোঁড়াটাকে চুবিয়ে এনেছি।

বাপ। বড় কাজই করেছ—তুই নেয়ে এসেছিস্ কই?

ছেলে। বাবা, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"—ওতে আমাতে কি তফাৎ আছে? ওর নাওয়াতেই আমার নাওয়া হয়েছে। এখন সন্দেশ দাও।

পিতা বেত্রহস্তে পুত্রের পিছু পিছু ছুটিলেন। পুত্র পলাইতে পলাইতে বলিতে লাগিল, "বাবা শাস্ত্র জানে না।"

কিছু পরে সেই সুশিক্ষিত বালকের পিতা শুনিলেন যে, সে ওপাড়ায় শিরোমণি ঠাকুরের টোলে গিয়া শিরোমণি ঠাকুরকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছে। ছেলে ঘরে এলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার এ কি করেছিস?"

ছেলে। কি করি বাবা! তুমি ত ছাড়বে না—বেত মারিবেই মারিবে। তাই আপনা আপনি সেই বেত খেয়েছি।

পিতা। সে কি রে বেটা?—আপনা আপনি কি? শিরোমণি ঠাকুরকে মেরেছিস্ যে?

ছেলে। বাবা—আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু—শিরোমণি ঠাকুরে আর আমাতে কি আমি তফাৎ দেখি?

পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছেলেকে আর লেখাপড়া শিখাইবেন না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর

DRAMATIS PERSONÆ

১। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু।

২। তস্য ভার্য্যা।

উচ্চশিক্ষিত। কি হয়?

ভার্য্যা। পড়ি শুনি।

উচ্চ। কি পড়?

ভার্য্যা। যা পড়িতে জানি। আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফরাশীও জানি না, ভাগ্যে যা আছে, তাই পড়ি।

উচ্চ। ছাই ভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে।

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। ওগুলো সব immoral, obscene, filthy.

ভার্য্যা। সে সব কাকে বলে?

উচ্চ। Immoral কাকে বলে জান—এই ইয়ে হয়—অর্থাৎ যা moralityর বিরুদ্ধ।

ভার্য্যা। সেটা কি চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ?

উচ্চ। না না—এই কি জান—ওর আর বাঙ্গলা কোথা পাব? এই যা moral নয়—তাই আর কি।

ভার্য্যা। মরাল কি? রাজহংস?

উচ্চ। ছি! ছি! O woman! thy name is stupidity.

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। বাঙ্গলা কথায় ত আর অত বুঝান যায় না—তবে আসল কথাটা এই যে, বাঙ্গলা বই পড়া ভাল নয়।

ভার্য্যা। তা, এই বইখানা নিতান্ত মন্দ নয়—গল্পটা বেশ।

উচ্চ। এক রাজা আর দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গল্প? না নল-দময়ন্তীর গল্প?

ভার্য্যা। তা ছাড়া আর কি গল্প হ'তে নেই?

উচ্চ। তা ছাড়া তোমার বাঙ্গলায় আর কিছু আছে না কি?

ভার্য্যা। এটা তা নয়। এতে কাটলেট্ আছে, ব্রাণ্ডি আছে, বিধবার বিবাহ আছে—বৈষ্ণবীর গীত আছে।

উচ্চ। Exactly. তাই ত বলছিলাম, ও ছাই ভস্মগুলো পড় কেন?

ভার্য্যা। কেন, পড়িলে কি হয়?

উচ্চ। পড়িলে demoralize হয়।

ভার্য্যা। সে আবার কি? ধেমোরাজা হয়?

উচ্চ। এমন পাপও আছে! Demoralize কি না—চরিত্র মন্দ হয়।

ভার্য্যা। স্বামী মহাশয়! আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ও কাজ হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লোক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধুবর্গ ডিনরের পর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কন—শুনিতে পাইলে খানসামারাও কাণে আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগি মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে, তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই,—আর আমি গরিবের মেয়ে, একখানা বাঙ্গলা বই পড়িলেই গোল্লায় যাব?

উচ্চ। আমরা হলেম Brass pot; তোমরা হলে Earthen pot.

ভার্য্যা। অত পট পট কর কেন? কইমাছ ছাঁকা তেলে পড়েছ নাকি? তা যা হোক, একবার এই বইখানা একটু পড় না।

উচ্চ। (শিহরিয়া ও পিছাইয়া) আমি ও সব ছুঁয়ে hand contaminate করি না।

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা করি না।

ভার্য্যা। তোমার হাত ময়লা হবে না, আমি ঝাড়িয়া দিতেছি।

(ইতি পুস্তকখানি আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান। মানসিক ময়লা ভয়ে ভীত উচ্চশিক্ষিতের হস্ত হইতে পুস্তকের ভূমে পতন।)

ভার্য্যা। ও কপাল! আচ্ছা, তুমি যে বইখানাকে অত ঘৃণা করচো, কই—তোমার ইংরেজেরাও তত করে না? ইংরেজেরা নাকি এই বইখানা তরজমা করিয়া পড়িতেছে।

উচ্চ। ক্ষেপেছ?

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। বাঙ্গলা বই ইংরেজিতে তরজমা? এমন আষাঢ়ে গল্প তোমায় কে শোনায়? বইখানা seditious ত নয়? তা হলে government তরজমা করান সম্ভব। কি বই ওখানা?

ভার্য্যা। বিষবৃক্ষ।

উচ্চ। সে কাকে বলে?

ভার্য্যা। বিষ কাহাকে বলে জান না? তারই বৃক্ষ।

উচ্চ। বিষ—এক কুড়ি।

ভার্য্যা। তা নয়—আর এক রকমের বিষ আছে জান না? যা তোমার জ্বালায় আমি একদিন খাব।

উচ্চ। ওহো! Poison! Dear me! তারই গাছ—উপযুক্ত নাম বটে—ফেল! ফেল!

ভার্য্যা। এখন, গাছের ইংরেজি কি বল দেখি?

উচ্চ। Tree.

ভার্য্যা। এখন দুটা কথা এক কর দেখি?

উচ্চ। Poison Tree! ওহো! বটে বটে! Poison Tree বলিয়া একখান ইংরেজি বইয়ের কথা কাগজে পড়িতেছিলাম বটে। তা সেখানা কি বাঙ্গলা বইয়ের তরজমা?

ভার্য্যা। তোমার বোধ হয় কি?

উচ্চ। আমার Idea ছিল যে, Poison Tree একখানা ইংরেজি বই, তারই বাঙ্গলা তরজমা হয়েছে। তা যখন ইংরেজি আছে, তখন আর বাঙ্গলা পড়বো কেন?

ভার্য্যা। পড়াটা ইংরেজি রকমেই ভাল—তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাস নিয়েই হোক। তা তোমাকে ইংরেজি রকমেই পড়িতে দিতেছি। এই বইখানা দেখ দেখি। এখানা ইংরেজির তরজমা—লেখক নিজে বলিয়াছেন।

উচ্চ। ও সব বরং পড়া ভাল। কি ইংরেজি বইয়ের তরজমা—Robinson Crusoe না Watt on the Improvement of the Mind?

ভার্য্যা। ইংরেজি নাম আমি জানি না। বাঙ্গলা নাম ছায়াময়ী।

উচ্চ। ছায়াময়ী ? সে আবার কি ? দেখি (পুস্তক হস্তে লইয়া) Dante. by Jove.

ভার্য্যা। (টিপি টিপি হাসিয়া) তা ওখানা ভাল বুঝিতে পারি না—পোড়া বাঙ্গালির মেয়ে, ইংরেজির তরজমা বুঝি এত বুদ্ধি ত রাখিনে—ওটা তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে ?

উচ্চ। তার আর আশ্চর্য্য কি ? Dante lived in the fourteenth century. অর্থাৎ তিনি fourteenth centuryতে flourish করেন।

ভার্য্যা। ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন ? এত বড় কবি ?

উচ্চ। কি পাপ ! fourteen মানে চৌদ্দ।

ভার্য্যা। চৌদ্দ সুন্দরীকে পালিশ করেন ? তা চোদ্দই হোক, আর পনেরই হোক, সুন্দরীকে আবার পালিশ করা কেন ?

উচ্চ। বলি চোদ্দ সেঞ্চুরিতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভার্য্যা। তিনি চোদ্দ সুন্দরীতে বর্ত্তমান থাকুন আর চোদ্দ শ সুন্দরীতেই বর্ত্তমান থাকুন, বইখানা নিয়ে কথা।

উচ্চ। আগে অথরের লাইফটা জানতে হয়। তিনি Florence নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে বড় বড় appointment hold করিতেন।

ভার্য্যা। পোর্টম্যাণ্টো হলদে করিতেন। আমাদের এই কাল পোর্টম্যাণ্টোটা হলদে হয় না ?

উচ্চ। বলি বড় বড় চাকরি করিতেন। পরে Guelph ও Ghibillineদিগের বিবাদে—

ভার্য্যা। আর হাড় জ্বালিও না। বইখানা একটু বুঝাও না।

উচ্চ। তাই বুঝাইতেছিলাম। অথরের লাইফ না জানিলে বই বুঝিবে কি প্রকারে ?

ভার্য্যা। আমি দুঃখী বাঙ্গালির মেয়ে, আমার অত ঘটায় কাজ কি ? বইখানার মর্ম্মটা বুঝাইয়া দাও না।

উচ্চ। দেখি, বইখানা কি রকম লিখেছে দেখি।

(পরে পুস্তক গ্রহণ করিয়া প্রথম ছত্র পাঠ)

"সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা"

তোমার কাছে অভিধান আছে ?

ভার্য্যা। কেন, কোন্ কথাটা ঠেকিল ?

উচ্চ। গগন কাকে বলে ?

ভার্য্যা। গগন বলে আকাশকে।

উচ্চ। "সন্ধ্যা গগনে নিবিড় কালিমা"—নিবিড় কাকে বলে ?

ভার্য্যা। ও হরি! এই বিদ্যাতে তুমি আমাকে শিখাবে? নিবিড় বলে ঘনকে। এও জান না? তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে না?

উচ্চ। কি জান—বাঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ও সবের আমাদের মাঝখানে চলন নেই। ও সব কি আমাদের শোভা পায়?

ভার্য্যা। কেন, তোমরা কি?

উচ্চ। আমাদের হলো polished society—ও সব বাজে লোকে লেখে—বাজে লোকে পড়ে—সাহেব লোকের কাছে ও সবের দর নেই—polished societyতে কি ও সব চলে?

ভার্য্যা। তা মাতৃভাষার উপর পালিশ-ষষ্ঠীর এত রাগ কেন?

উচ্চ। আরে, মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন—তাঁর ভাষার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক কি?

ভার্য্যা। আমারও ত ঐ ভাষা—আমি ত মরে ছাই হই নাই।

উচ্চ। Yes for *thy* sake, my jewel, I shall do it—তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গলা বই পড়িব। কিন্তু mind একখানা বৈ আর নয়।

ভার্য্যা। তাই মন্দ কি?

উচ্চ। কিন্তু এই ঘরে দ্বার দিয়ে পড়্‌ব—কেহ না টের পায়।

ভার্য্যা। আচ্ছা তাই।

(বাছিয়া বাছিয়া একখানি অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দুর্নীতিপূর্ণ অথচ সরস পুস্তক স্বামীর হস্তে প্রদান। স্বামীর তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপন।)

ভার্য্যা। কেমন বই?

উচ্চ। বেড়ে। বাঙ্গালায় যে এমন বই হয়, তা আমি জানিতাম না।

ভার্য্যা। (ঘৃণার সহিত) ছি! এই বুঝি তোমার পালিশ-ষষ্ঠী? তোমার পালিশ-ষষ্ঠীর চেয়ে আমার চাপড়া-ষষ্ঠী, শীতল-ষষ্ঠী অনেক ভাল।

NEW YEAR'S DAY

DRAMATIS PERSONÆ

রামবাবু

শ্যামবাবু

রামবাবুর স্ত্রী (পাড়াগেঁয়ে মেয়ে)

রামবাবু ও শ্যামবাবুর প্রবেশ

(রামবাবুর স্ত্রী অন্তরালে)

শ্যামবাবু। গুড্ মর্ণিং রামবাবু—হা ডু ডু ?

রামবাবু। গুড্ মর্ণিং শ্যামবাবু—হা ডু ডু।

[উভয়ে প্রগাঢ় করমর্দ্দন]

শ্যামবাবু। I wish you a happy new year. and many many returns of the same.

রামবাবু। The same to you.

[শ্যামবাবুর তথাবিধ কথাবার্ত্তার জন্য অন্যত্র প্রস্থান। ও রামবাবুর অন্তঃপুর প্রবেশ]

রামবাবুর স্ত্রী : ও কে এসেছিল ?

রামবাবু। ঐ ও বাড়ীর শ্যামবাবু।

স্ত্রী। তা, তোমাদের হাতাহাতি হচ্ছিল কেন ?

রামবাবু। সে কি ? হাতাহাতি কখন হ'লো ?

স্ত্রী। ঐ যে তুমি তার হাত ধ'রে ঝেঁকুরে দিলে, সে তোমার হাত ধ'রে ঝেঁকুরে দিলে ? তোমায় লাগে নি ত ?

রাম। তাই হাতাহাতি ! কি পাপ ! ওকে বলে shaking hands. ওটা আদরের চিহ্ন।

স্ত্রী। বটে ! ভাগ্যে, আমি তোমার আদরের পরিবার নই ! তা, তোমার লাগেনি ত ?

রাম। একটু নোক্‌সা লেগেছে ; তা কি ধরতে আছে ?

স্ত্রী। আহা তাই ত ! ছ'ড়ে গেছে যে ? অধঃপেতে ড্যাকরা মিন্‌সে ! সকাল বেলা মরতে আমার বাড়ীতে হাত কাড়াকাড়ি করতে এয়েছেন ! আবার নাকি হুটোহুটি খেলা হবে ? অধঃপেতে মিন্‌সের সঙ্গে ও সব খেলা খেলিতে পাবে না।

রাম। সে কি ? খেলার কথা কখন হ'লো ?

স্ত্রী। ঐ যে সেও ব'ল্লে, "হাঁডু ডু ডু!" তুমিও ব'ল্লে, "হাঁডু ডু ডু!" তা, হাঁ ডু ডু ডু খেলবার কি আর তোমাদের বয়স আছে ?

রাম। আঃ, পাড়াগেঁয়ের হাতে প'ড়ে প্রাণটা গেল। ওগো, হাঁ ডু ডু ডু নয়; হা ডু ডু—অর্থাৎ How do ye do ? উচ্চারণ করিতে হয়, "হা ডু ডু!"

স্ত্রী। তার অর্থ কি ?

রাম। তার মানে, "তুমি কেমন আছ ?"

স্ত্রী। তা কেমন ক'রে হবে ? সে তোমায় জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন আছ," তুমি ত কৈ তার কোন উত্তর দিলে না,—তুমি সেই কথাই পালটিয়া বলিলে।

রাম। সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীতি।

স্ত্রী। পাল্‌টে বলাই সভ্য রীতি ? তুমি যদি আমার ছেলেকে বল, "লেখাপড়া করিস্‌নে কেন রে ছুঁচো ?" সেও কি তোমাকে পাল্‌টে বল্‌বে, "লেখাপড়া করিস্‌নে কেন রে ছুঁচো ?" এইটা সভ্য রীতি ?

রাম। তা নয় গো তা নয়। কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দিয়ে পাল্‌টে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছ। এইটা সভ্য রীতি।

স্ত্রী। (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে। তোমার দু বেলা অসুখ— আমায় দিনে পাঁচ বার তোমার কাছে খবর নিতে হয়, তুমি কেমন আছ; আমায় যেন তখন হা ডু ডু বলিয়া তাড়াইয়া দিও না। আমার কাছে সভ্য নাই হইলে!

রাম। না, না, তাও কি হয় ? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল।

স্ত্রী। তা ব'লে দিলেই জান্‌তে পারি। বুঝিয়ে দাও না ? আচ্ছা, শ্যামবাবু এলো আর কি কিচিরমিচির ক'রে ব'ল্লে আর চলে গেল; যদি হাঁডু ডু ডু খেলার কথা বল্‌তে আসেনি, তবে কি কর্‌তে এয়েছিল ?

রাম। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন, তাই সম্বৎসরের আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এয়েছিল।

স্ত্রী। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন ? আমার শ্বশুর শাশুড়ী ত ১লা বৈশাখ থেকে নূতন বৎসর ধরিতেন।

রাম। আজ ১লা জানুয়ারি—আমরা আজ থেকে নূতন বৎসর ধরি।

স্ত্রী। শ্বশুর ধরিতেন ১লা বৈশাখ থেকে, তুমি ধর ১লা জানুয়ারি থেকে, আমার ছেলে বোধ করি ধরিবে ১লা শ্রাবণ থেকে ?

রাম। তাও কি হয় ? এ যে ইংরেজের মুলুক—এখন ইংরেজী নূতন বৎসরে আমাদের নূতন বৎসর ধরিতে হয়।

স্ত্রী। তা, ভালই ত। তা, নূতন বৎসর ব'লে এতগুলা মদের বোতল আনিয়েছ কেন ?

রামবাবু। সুখের দিন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাল ক'রে খেতে দেতে হয়।

স্ত্রী। তবু ভাল। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাদের বৎসর কাবারে বুঝি এই রকম কলসী উৎসর্গ কর্‌তে হয়। ভাবছিলাম, বলি বারণ কর্‌ব যে, আমার শ্বশুর শাশুড়ীর উদ্দেশে ও সব দিও না।

রাম। তুমি বড় নির্ব্বোধ!

স্ত্রী। তা ত বটে। তাই আরও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভয় পাই।

রাম। আবার কি জিজ্ঞাসা করিবে ?

স্ত্রী। এত কপি, সালগম, গাজর, বেদানা, পেস্তা, আঙ্গুর, ভেটকি মাছ সব আনিয়েছ কেন ? খেতে কি এত লাগবে ?

রাম। না। ও সব সাহেবদের ডালি সাজিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রী। ছি, ছি, এমন কর্ম্ম করো না। লোকে বড় কুকথা বল্‌বে।

রাম। কি কথা বলিবে ?

স্ত্রী। বল্‌বে, এদের বৎসর কাবারে কলসী উৎসর্গও আছে, চোদ্দ পুরুষকে ভুজ্যি উৎসর্গ করাও আছে।

[ইতি প্রহারভয়ে গৃহিণীর বেগে প্রস্থান। রামবাবুর উকীলের বাড়ী গমন এবং হিন্দুর Divorce হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।]

'লোকরহস্যে'র প্রথম ও শেষ সংস্করণের পাঠভেদ

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় 'লোকরহস্যে'র দুইটিমাত্র সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম দুই বৎসরের 'বঙ্গদর্শন' হইতে আটটি [ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ), ইংরাজস্তোত্র, বাবু, গর্দ্দভ, দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন, বসন্ত এবং বিরহ, সুবর্ণগোলক, রামায়ণের সমালোচন] তথাকথিত হালকা রচনা লইয়া ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'লোকরহস্য' "কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয়। প্রথম সংস্করণের টাইটেল-পেজে "কৌতুক ও রহস্য" কথা দুইটি মুদ্রিত ছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৯১। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার "Hare Press" হইতে 'লোকরহস্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৭৪। প্রথম বারের "বিজ্ঞাপন" দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধৃত হয় নাই; "রামায়ণের সমালোচন" প্রবন্ধটি পুনর্লিখিত হইয়াছে এবং বর্ষ সমালোচন, কোন "স্পেশিয়ালের" পত্র, Bransonism, হনুমদ্বাবুসংবাদ, গ্রাম্য কথা (প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা), বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর ও New Year's Day—এই সাতটি নূতন রচনা পরবর্ত্তী কালের 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার' হইতে সংযোজিত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি এইরূপ ছিল—

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থে বঙ্গদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। এতৎ সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, রহস্য মাত্র গালি; গালি ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষকে গালি দেওয়া মাত্র। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে, তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ গ্রন্থ পাঠ না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ব্যক্তিবিশেষের যে দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের কোন অধিকার নাই—কদাচিৎ অবস্থাবিশেষে অধিকার জন্মে; যথা, ভ্রান্ত রাজপুরুষের ভ্রান্তিজনিত কার্য্যের প্রতি, অথবা মূর্খ গ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থের প্রতি, রহস্য প্রযুজ্য। এ গ্রন্থের সে সকল উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।

উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ নিম্নে দেওয়া হইল—

পৃ. ১৩, ফুটনোটের তৃতীয় লাইন, "সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা" স্থলে "সংস্কৃত ভাষা রূঢ় ভাষা" ছিল।

পৃ. ২৬, পংক্তি ১৩, "যিনি আপনাকে অভ্রান্ত" স্থলে "যিনি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত" কথা কয়টি ছিল।

পৃ. ২৮, অষ্টম প্যারার পর নিম্নলিখিত প্যারা দুইটি ছিল—

তুমিই ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলে, সন্দেহ নাই, নহিলে নবমীতে লাউ খাইতে নাই কেন? তুমিই আলঙ্কারিক, সাহিত্যদর্পণাদি তোমারই সৃষ্টি। কিঞ্চিৎ ঘাস খাও।

তুমি সুকবি—কাদম্বরী, বাসবদত্তা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট, জগন্মান্য কাব্য তোমারই প্রণীত। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকিয়া, তুমিই বিদ্যাসুন্দরাদি প্রণয়ন করিয়াছিলে, সন্দেহ নাই। নহিলে এজন্মে তাহাতে তোমার এত প্রীতি কেন?

পৃ. ২৯, পঞ্চম প্যারার পর নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

যেমন ভগবান্ কূর্ম্মরূপে, পৃষ্ঠে পৃথিবী বহন করিয়াছিলে, কৃষ্ণরূপে অঙ্গুলিতে গিরিবহন করিয়াছিলেন, নাগরূপে মস্তকে ধরণীর ভার বহন করিতেছেন, তেমনি তুমিও পশু, পশুরূপে মলিন বস্ত্রের ভার বহন কর। অতএব তোমারও পূজা করিব—এই ঘাস গ্রহণ কর।

তুমি বিধাতার অনুগ্রহে চতুর্ভুজ। এবং জাতিধর্ম্মবশতঃ সর্বদা গোপীগণে পরিবৃত। পুচ্ছ চূড়া হইতে স্থানান্তরে গিয়াছে বটে, কিন্তু আছে। ঐ যে গর্জ্জন করিলে, ও কি বংশীরব? তুমি ভক্তের নিকট প্রকাশ করিয়া বল, আবার এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কেন?

তুমি আবার কি কংস শিশুপালাদি অসুরের বধ করিতে আসিয়াছ? কংস এখন আর নাই—তিনি একটি "আকার" প্রাপ্ত হইয়া থালা ঘটি বাটি ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছেন—এবার তাহাতে উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইয়া সুখী হও। শিশুপালের উপর তোমার রাগ আছে সন্দেহ নাই; কেন না, শিশুপাল ইঁট্ মারিয়া সর্ব্বদা তোমার অস্থি ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু হে মহাবল! আমার পরামর্শ শুন, তাহাদিগের শারীরিক আঘাত করিও না। তুমি যে সম্বাদপত্রের সম্পাদক হইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে তাহাদিগকে আপন বুদ্ধি দান করিতেছ, তাহাতেই শিশুপালের সর্ব্বনাশ হইবে।

অথবা তুমি কি আবার একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধাইতে অবতীর্ণ হইয়াছ? এবারকার যুদ্ধ শস্ত্রে না শাস্ত্রে?

হে গর্দ্দভ! আমি অর্ব্বাচীন, কি বলিতে কি বলিলাম, তুমি আমার উপর রাগ করিও না। যিনি জগতের আরাধ্য, তিনি সকল ভূতেই আছেন, এজন্য আমি তোমারও পূজা করিলাম। অন্য লোকে যদি মনুষ্য পূজা করিতে পারে, তবে আমি তোমার পূজা না করি কেন? তুমি কি "Grand etre" ছাড়া?

পৃ. ৫১, প. ৬, "কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত" স্থলে "শ্রীমদ্দন্তুমদ্বংশজ শ্রীমন্মহামর্কট প্রণীত" ছিল।

পৃ. ৫১, প. ৭-৯, "অনেক সময়ে রচনা···গৌরবের বিষয় নহে।" এই কথা কয়টি ছিল না।

পৃ. ৫১, প. ১১-১২, "বানরেরা বোধ হয়,···জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষ। অনার্য্য" অংশটুকু ছিল না।

পৃ. ৫১, প. ১৩-১৪, "তখন আর্য্যেরা···সভ্য ছিল।" কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—

বানরদিগের কীর্ত্তি সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করা, সামান্য কবিত্বের কার্য্য নহে। গ্রন্থকার যে ততদূর কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এমত আমরা বলিতে পারি না; তবে তিনি যে কিয়দ্দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

পৃ. ৫১, প. ১৬-১৭, "বহুবিবাহের···উৎপন্ন হইল।" কথা কয়টি ছিল না।

প. ১৭, "অসভ্য" কথাটির স্থলে "নির্ব্বোধ" ছিল এবং "সপত্নীগর্ভজাত" কথাটি ছিল না।

পৃ. ৫১, প. ১৯, "ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্যবশতঃ "কথা কয়টির পরিবর্ত্তে "ততোধিক মূর্খ ;" ছিল।

পৃ. ৫১, প. ২০-২৭, "ইহার সহিত মহাতেজস্বী…লক্ষ্মণ আর একটি উদাহরণ।" কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—

তা, একাই যাউক, তাহা নহে ; আপনার যুবতী ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা," এটা সামান্য কথা ; ইহাও তাহার ঘটে আসিল না। তাহাতে যাহা ঘটিবার, ঘটিল। স্ত্রীস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্যবশতঃ সীতা রামকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্ব্বোধ রাম পথে২ কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। সীতা অন্তঃপুরে থাকিলে এতটা ঘটিত না। সীতা দুশ্চরিত্রা হইলেও, ঘরে থাকিত ; বনে গিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছিল, এবং অন্যের সংসর্গ সুসাধ্য হইয়াছিল, এজন্য এমত ঘটিয়াছিল। এক্ষণে যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য কলহ করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

লক্ষ্মণ আর একটি গণ্ডমূর্খ।

পৃ. ৫২, প. ৩-৪, "ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতার" কথাগুলির পরিবর্ত্তে "বুদ্ধিহীনতার" কথাটি ছিল।

পৃ. ৫২, প. ৫-৬, "অসভ্য মূর্খ" ও "অকর্ম্মা" কথাগুলির স্থলে যথাক্রমে "গণ্ডমূর্খ" ও "মূর্খ" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৫২, প. ৭, "অনার্য্য (বানর) জাতি" কথা কয়টির পরিবর্ত্তে "আমার বন্দনীয় পূর্ব্বপুরুষ" ছিল।

পৃ. ৫২, প. ৮, "বর্ব্বর জাতির নৃশংসতা" কথা কয়টির পরিবর্ত্তে "মূর্খের মূর্খতা" কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৫২, প. ১০-১১, "বর্ব্বরজাতির স্বভাবসুলভ ক্রোধবশতঃ" কথা কয়টির পরিবর্ত্তে "বুদ্ধিহীনতাবশতঃ" কথাটি ছিল।

পৃ. ৫২, প. ১৩, "অসভ্য জাতির মধ্যে" কথাগুলির পরিবর্ত্তে "বুদ্ধি না থাকিলে" কথা কয়টি ছিল।

পৃ. ৫২, প. ১৮, "ইহাতে কি…দেখা যাউক।" কথাগুলির পরিবর্ত্তে "ইহা কাহারও প্রণীত নহে।" কথা কয়টি ছিল।

পৃ. ৫২, প. ৩০ ও পৃ. ৫৩, প. ১, "অশ্লীলতাঘটিত" কথাটির পরিবর্ত্তে উভয় স্থানেই "আদিরসঘটিত" ছিল।

পৃ. ৫৩, প. ৮-৯, "প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে…বিশুদ্ধ সংস্কৃতে অধিকারী।" কথাগুলির পরিবর্ত্তে ছিল—

ইহা কি সামান্য মূর্খতা ? এই একটি দোষেই এই গ্রন্থখানি সাধারণের পরিহার্য্য হইয়াছে।

ভরসা করি, পাঠক সকলে এই কদর্য্য গ্রন্থখানি পড়া ত্যাগ করিবেন। আমি একখানি নূতন রামায়ণ রচনা করিয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে তাহাই সকলে পাঠ করিতে আরম্ভ করুন। আমার প্রণীত রামায়ণ যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য ; কেন না, আমি ত বাল্মীকির ন্যায় কবিত্ববিহীন এবং বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য নহি। সেই কথা বলাই এ সমালোচনার উদ্দেশ্য। অলমতি বিস্তরেণ।

মঃ মঃ

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

কমলাকান্ত

অর্থাৎ

১। কমলাকান্তের দপ্তর

২। কমলাকান্তের পত্র

৩। কমলাকান্তের জোবানবন্দী

[১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

কমলাকান্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১২৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা—৬

প্রকাশক

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৪৫

দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫৪

তৃতীয় সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৬২

মূল্য আড়াই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

তাপসী প্রেস, ৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

১'১—১৯৫৫

ভূমিকা

'কমলাকান্ত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্রতম সৃষ্টি; বস্তুতঃ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কমলাকান্ত চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন, কমলাকান্ত বলিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝিয়া থাকি। ইতিপূর্বে ইউরোপে এই ভাবে সৃষ্ট চরিত্রের সহিত স্রষ্টার মিলন একাধিক কবি ও ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে, কিন্তু বাংলা দেশে ও সাহিত্যে, বোধ হয় আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেই, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার অভিন্নহৃদয়তা এই প্রথম। কল্পনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এই এক নূতন পদ্ধতির আমদানি করিলেন। কমলাকান্তের পূর্বগামী 'হুতোম' অবশ্য কালীপ্রসন্ন সিংহের অভিন্নহৃদয়, কিন্তু সে মাত্র বেনামীর খাতিরে স্বতন্ত্র চরিত্রসৃষ্টি হিসাবে নয়। উহা আলোকপ্রার্থী কালীপ্রসন্নেরই অন্ধকার দিক্। হুতোমের দৃষ্টি নিম্নগামী অথবা প্রত্যক্ষ বীভৎস বাস্তবের সঙ্গেই তাহার কারবার; কমলাকান্ত আইডিয়ালিস্ট, আদর্শবাদী এবং বাস্তবের ঊর্দ্ধলোকে তাহার কল্পনাবিহার। কমলাকান্ত কবি, প্রেমিক এবং বাংলা সাহিত্যে যাহা প্রথম—স্বদেশপ্রেমিক। পাতালমুখী হুতোম আকাশমুখী কমলাকান্তের ঠিক উল্টা পিঠ।

কৈশোরে কবি এবং যৌবনে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে (৩৪ বৎসর বয়সে) সম্পাদক হইয়া বিপন্ন হইলেন। তাঁহার মাপকাঠিতে তৌল হইয়া পাসমার্কা পাইতে পারে, এমন জবরদস্ত লেখক 'বঙ্গদর্শনে'র সূচনার যুগে বাংলা দেশে বেশী ছিল না। বঙ্কিম-সূর্য্যের গ্রহ হিসাবে গণ্য করিয়া পরবর্তী কালে আমরা যে সকল লেখকের নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা অনেকটা 'বঙ্গদর্শন' এবং বঙ্কিমের খাতিরেই। বঙ্কিম-নিরপেক্ষ তাঁহাদের নিজস্ব মূল্য তত বেশী নয়। সুতরাং ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্রকে মুস্কিলে পড়িতে হইল। উপন্যাস-কথাসাহিত্যে নিজের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নিজের কবিতার প্রতিও তখন পর্য্যন্ত তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মায় নাই, তাহা ছাড়া রঙ্গলাল দীনবন্ধু হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র ছিলেন; প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র যোগেন্দ্রচন্দ্র জগদীশনাথ রামদাস রাজকৃষ্ণ অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন এবং তাঁহাদের রচনায় আর্টিস্টের হাত বুলাইয়া বাজার-চল করিবার জন্য তিনি নিজে ছিলেন, কিন্তু মাসিক-পত্রিকার বিরাট্ উদর এই সামান্য উপাদানে ভরানো যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্ব্বদাই নানা ফন্দি-ফিকির আঁটিতে হইত। নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী পাঠক ভুলাইবার জন্য তাঁহাকে প্রায়শঃই ভোল বদলাইতে হইত। কখনও তিনি সমালোচক সাজিয়া ভারতীয় সঙ্গীত ও 'উত্তররামচরিতে'র সমালোচনা করিতেন, কখনও বৈজ্ঞানিক হইয়া পরমাণু ও ধূলা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতেন, কখনও আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে আত্মসচেতন করিবার জন্য তাহার কলঙ্ক-কাহিনী শুনাইতেন, কখনও গদ্যকাব্য রচনা করিয়া পাঠকের তৃপ্তিসাধন করিতে চাহিতেন, আবার কখনও বা বঙ্গদেশের কৃষককে কেন্দ্র করিয়া সাম্যের নামে পলিটিক্স্ লিখিতেন।

তাঁহার স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় মন প্রথমটা 'লোকরহস্যে'র সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মাসের পর মাস নিছক রহস্য সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। প্রবহমান সংসার-স্রোতের উপরিভাগে আপাতমনোহর তরঙ্গভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তীক্ষ্ণধী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও গভীর রহস্য-গহনে তলাইয়া যাইতেন, এবং মরণশীল মানবের এবং বিশেষ করিয়া যে সকল হতভাগ্য জীব তাঁহার আশেপাশে চিন্তাহীন নিঃশঙ্কভায় ভাসমান, তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হালকা হাসির বুদ্বুদ-বিলাসে তাঁহার মন সায় দিত না। অর্দ্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাসুজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্স্, সমাজ-বিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া সম্পাদক এবং প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত-জন্মের ইহাই ইতিহাস। কমলাকান্তের দর্শনকে অর্থসঙ্গতি দেওয়ার জন্য নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী এবং পৃথিবীতে প্রচারের জন্য ভীষ্মদেব খোশনবীসকেও সৃষ্টি করিতে হইল।

১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের 'বঙ্গদর্শনে' কমলাকান্তের প্রথম আবির্ভাব। ভীষ্মদেব খোশনবীস ভূমিকায় লিখিলেন—

> [কমলাকান্ত] লেখাপড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরাজি কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না সে বিদ্যা কি বিদ্যা? কমলাকান্তের মত বিদ্বান্, যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

"গণ্ডমূর্খ" কমলাকান্তের দপ্তর হইতে "অত্যুৎকৃষ্ট অনিদ্রার ঔষধ" খোশনবীস মহাশয় লোকহিতার্থ প্রচার করিতে লাগিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' দপ্তর-প্রকাশের তালিকা এইরূপ—

১। একা—"কে গায় ওই?"—ভাদ্র, ১২৮০
২। মনুষ্য ফল —আশ্বিন, ১২৮০
৩। ইউটিলিটি বা দর্শন দ্বয়—কার্ত্তিক, ১২৮০
৪। পতঙ্গ —অগ্রহায়ণ, ১২৮০
৫। আমার মন —মাঘ, ১২৮০
৬। চন্দ্রালোকে —ফাল্গুন, ১২৮০
৭। বসন্তের কোকিল —চৈত্র, ১২৮০
৮। স্ত্রীলোকের রূপ —জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১
৯। বিবাহ —আষাঢ়, ১২৮১

১০।	বড়বাজার	—আশ্বিন, ১২৮১
১১।	আমার দুর্গোৎসব	—কার্ত্তিক, ১২৮১
১২।	একটি গীত	—ফাল্গুন, ১২৮১
১৩।	বিড়াল	—চৈত্র, ১২৮১
১৪।	মশক	—বৈশাখ, ১২৮২

ভীষ্মদেব খোশনবীসের মারফৎ প্রাপ্ত দপ্তরে এই ১৪টির অধিক রচনা ছিল না। ইহার মধ্যে "চন্দ্রালোকে," "স্ত্রীলোকের রূপ" ও "মশক" বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নয়। "চন্দ্রালোকে" ও "মশক" অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়া হইতে স্বরচিত ১১টি নিবন্ধ লইয়া 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশ করেন, আখ্যা-পত্রে "প্রথম খণ্ড" কথা দুইটি ছিল—অর্থাৎ তখনই কমলাকান্তকে লইয়া আরও কিছু কাল কারবার করিবার মতলব বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। কিন্তু ১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্য্যন্ত কোনও প্রকারে প্রকাশিত হইয়া* বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' বিদায় গ্রহণ করাতে কমলাকান্তও বিদায় হয়।

১২৮৪ সালের বৈশাখ হইতে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশিত হইতে থাকে। প্রারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জ্জীবিত হইল।" কিন্তু কমলাকান্তের পুনর্জ্জীবনের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সময়ে মনে হয় নাই, হইলে, বৈশাখ সংখ্যাতেই (১২৮৪) "বুড়া বয়সের কথা" কমলাকান্ত-নাম-বিবর্জ্জিতভাবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইত না। অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত কমলাকান্তের পুনরাবির্ভাব ঘটিল না। পৌষে সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠের তাগিদে "কমলাকান্তের পত্র" প্রকাশিত হইল। কিন্তু কমলাকান্ত-বঙ্কিমচন্দ্রের মন তখন বিরূপ হইয়াছে, চারি বৎসরের সম্পাদকত্ব করিয়া তিনি অনেক কিছু শিখিয়াছেন। কমলাকান্তের জবানিতে তিনি এই পত্রে লিখিলেন—

> একবার বাজ দেখি, হৃদয়! এই জগৎ সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ফাল্গুনে (১২৮৪) "পলিটিকস্" শীর্ষক আর একটি পত্র বাহির হইল, এবং ১২৮৫ সালের শ্রাবণ মাসে "বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব" নামীয় পত্র প্রকাশিত হইয়া কমলাকান্তের জীবন-নাটকে প্রকৃতপক্ষে যবনিকা পড়িল। এই পত্রের শেষে লিখিত ছিল—

* "এ বৎসর বঙ্গদর্শনের প্রতি আমি তাদৃশ যত্ন করি নাই, এবং সন ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুল্য হয় নাই।"—বঙ্কিমচন্দ্র, "বঙ্গদর্শনের বিদায়গ্রহণ" প্রবন্ধ, চৈত্র, ১২৮২।

আপাতত ঘ্যান ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধু সংগ্রহের আশাটা রহিল।

ইহার পর ১২৮৮ সালের মাঘ মাস পর্য্যন্ত কমলাকান্তের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শনে'র তখন অত্যন্ত দুরবস্থা, শ্রাবণ মাসের পত্রিকা মাঘ মাসে প্রকাশিত হইতেছে। ১২৮৮ সালের ৫ই ফাল্গুন (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬ই ফেব্রুয়ারি) তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় কাঁঠালপাড়ার পণ্ডিত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দিগম্বর বিশ্বাসের পুত্র তারকনাথ বিশ্বাস তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। কথায় কথায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেন, 'বঙ্গদর্শন' কেমন চলিতেছে? উত্তরে কমলাকান্তের অভাবের উল্লেখ করিয়া 'বঙ্গদর্শনে'র দুরবস্থার কথা বলেন।

> তিনি "বটে" বলিয়া একমনে তামাকু খাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত অবিচলিত, স্থির, গম্ভীর। তাহারই কিছুক্ষণ পরে তিনি পার্শ্বস্থ কক্ষে ঢুকিয়া কি একটা বস্ত্র পান করিয়া আসিলেন ···আমাদিগকে বিদায় দিয়া লিখিতে বসিলেন —তারকনাথ বিশ্বাস: 'বঙ্কিম বাবুর জীবনকথা'।

সেই দিন সন্ধ্যা হইতে কলিকাতায় সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হয়। সেই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" রচনা করেন। ১২৮৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' (ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত) উহা বাহির হয়। খোশনবীস জুনিয়রের জবানিতে আদালতে কমলাকান্তের বিচিত্র সাক্ষ্য-বৃত্তান্ত দিয়াই পর্ব শেষ—কমলাকান্ত তখন "নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।"

কিন্তু শেষ হইয়াও শেষ হয় না। ইহারও পরে দুইবার কমলাকান্তের সাক্ষাৎ পাই; দপ্তরের ঝড়তি-পড়তি দুইটি লেখা কোনও কমলাকান্ত-ভক্ত সংগ্রহ করিয়া 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছেন—রকমটা এই। "ঢেঁকি" বাহির হয় ১২৮৯ সালের বৈশাখে এবং "কাকাতুয়া" কার্ত্তিকে। এখানে সত্য সত্যই শেষ।

'কমলাকান্তের দপ্তর' পরিবর্ধিত হইয়া 'কমলাকান্ত' নামে সর্ব্বপ্রথম ১২৯২ সালে (সেপ্টেম্বর ১৮৮৫) প্রকাশিত হয়। ইহার তিন অংশ—"কমলাকান্তের দপ্তর," "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী"। দপ্তরাংশে ১ম সংস্করণে পরিত্যক্ত "চন্দ্রালোকে" (অক্ষয়চন্দ্র সরকার) ও "স্ত্রীলোকের রূপ" (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) পুনঃসন্নিবিষ্ট হয়; "মশক" (অক্ষয়চন্দ্র) পরিত্যক্ত হয়। "মশক" পরবর্ত্তী কালে অক্ষয়চন্দ্রের 'মোতিকুমারী'তে প্রকাশিত হয়। "কমলাকান্তের দপ্তরে'র এই সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কিছু পরিবর্জ্জন ও সংশোধন করেন। "কমলাকান্তের পত্র"-অংশে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত (পৌষ, ১২৮৪) "কমলাকান্তের পত্র" দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া "কি লিখিব?" ও "কমলাকান্তের বিদায়" শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। "পলিটিক্স্" ও "বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব" নামক পত্র দুইটিও এই অংশে স্থান

পায়। "বুড়া বয়সের কথা" নামক প্রবন্ধটিও পত্রাকারে ইহার সহিত যুক্ত হয়। অর্থাৎ, এই সংস্করণে "কমলাকান্তের পত্র"-অংশ নিম্নলিখিত ক্রমে প্রকাশিত হয়। যথা—১। কি লিখিব? ২। পলিটিক্‌স্‌, ৩। বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব, ৪। বুড়া বয়সের কথা, ৫। কমলাকান্তের বিদায়। শেষ অংশ "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" দিয়া 'কমলাকান্ত' গ্রন্থ শেষ হয়।

'কমলাকান্তে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। ইহাতে দপ্তরাংশের চতুর্দশ সংখ্যারূপে পরিত্যক্ত "ঢেঁকি" নিবন্ধটি স্থান পায়। বাকী সমস্তই প্রথম সংস্করণের অনুরূপ থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'কমলাকান্তে'র আর সংস্করণ হয় নাই। "কাকাতুয়া" নিবন্ধটি 'কমলাকান্তে' স্থান পায় নাই।

'বঙ্গদর্শন' হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় যে সামান্য সামান্য বর্জন ও সংশোধন হইয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিয়া প্রধান দুইটি পরিবর্ত্তন ও বৃহত্তম পরিবর্জ্জনের কথা বলা আবশ্যক।

"কমলাকান্তের পত্র"কে "কি লিখিব?" ও "কমলাকান্তের বিদায়"—এই দুইটি অংশে ভাগ করিবার সময় শেষাংশে কিছু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। "কি লিখিব?" অংশ ঠিকই আছে। তাহার পরেই ছিল—

তবে আর একবার লেখ দেখি লেখনি! চল দেখি, পাখীর পাখা!

এই অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে।

'বঙ্গদর্শনে' শেষে ছিল—

কি লিখিব, সম্পাদক মহাশয় আজ্ঞা করিবেন। সে রস আর নাই—কিন্তু আজিও আছি

নিতান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী

বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে—

এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত

'বঙ্গদর্শনে' "বুড়া বয়সের কথা"র গোড়ায় ছিল—

আমি বুড়া বয়সের কথা লিখি লিখি মনে করিতেছি,…

পুস্তকে এই অংশ এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—

সম্পাদক মহাশয়! আফিঙ্গ পৌঁছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিস্ফারিত লোচনে লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেন প্রসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব।

বুড়া বয়সের কথা লিখিব। লিখি লিখি মনে করিতেছি,⋯

"কাকাতুয়া" কাহার লেখা, জোর করিয়া বলা যায় না; তথাপি যখন "শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত" বলিয়া 'বঙ্গদর্শনে' উল্লেখ আছে এবং ঐ বৎসরেই প্রকাশিত "শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত" "ঢেঁকি" যখন 'কমলাকান্তে' স্থান পাইয়াছে এবং যখন "চন্দ্রালোকে" "স্ত্রীলোকের রূপ' ও "মশকে"র মত অপর কোন লেখকের উপর ইহার রচনা-দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতেছে না, তখন কমলাকান্তের সর্বশেষ রচনা বলিয়া "কাকাতুয়া"র সম্মান হওয়া উচিত। এই বিবেচনায় এই বিস্মৃত রচনাটি "পাঠভেদে"র পর "পরিশিষ্টে" সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাস লইয়াই বহু সমালোচক বহু ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' সম্পর্কেও অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্ত' লইয়া সমসাময়িক অথবা পরবর্ত্তী সমালোচকেরা বিশেষ মাথা ঘামান নাই। 'কমলাকান্ত'কে কেন্দ্র করিয়া সাময়িক-পত্রে কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু 'কমলাকান্তে'র মূল্য অনুযায়ী তাহা নগণ্য। মনে হয়, সমসাময়িক সাহিত্যিকেরা নূতনত্বের অপরাধে 'কমলাকান্তকে' ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই; বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার অপেক্ষাকৃত লঘু বিকাশ—অবসর-বিনোদনের একটা খেলামাত্র কল্পিত হইয়া 'কমলাকান্ত' উপেক্ষিত হইয়াছে।

"শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ" শিরোনামায় শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিম-জীবনী'তে (৩য় সংস্করণ, পৃ ২৫৮-৫৯) এই গল্পটি দিয়াছেন—

আমার বেশ স্মরণ আছে, সান্‌কিভাঙ্গার বাটীতে একদিন আমার ভগিনীপতি পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় (সব জজ) মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার রচনার মধ্যে আপনি কোন্ পুস্তকখানিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?"

তিনি বলিলেন, "তুমি বল দেখি?"

কৃষ্ণধনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বলিব না—লিখিয়া রাখিতেছি। আমি জানিতে চাই, আপনার সহিত আমার মতের মিল হয় কি না।"

কৃষ্ণধনবাবু লিখিয়া রাখিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র পরমুহূর্ত্তে একটুও চিন্তা না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কমলাকান্তের দপ্তর।"

কৃষ্ণধনবাবু কাগজ উল্টাইয়া দেখাইলেন; তাহাতে লেখা রহিয়াছে—কমলাকান্তের দপ্তর।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র দত্তগুপ্ত তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকের ১২৬-২৭ পৃষ্ঠায় 'কমলাকান্ত' সম্বন্ধে যে সামান্ত আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মূলকথা এই—

কি ভাষায় মাধুর্য্যে, কি ভাবের মনোহারিত্বে, কি শুভ্র সংযত সরস রসিকতায়, কি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব। কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশপ্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজশিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনাহীনতা, স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামি নাই। হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সহিত মর্ম্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সহিত বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে? কেহ কেহ এখনও জিজ্ঞাসা করে, কমলাকান্তের দপ্তরের মৌলিকতা কতখানি? হায় রে অদৃষ্ট! "মৌলিকতা মৌলিকতা" করিয়া অথবা আপনাদের দেশের সৃষ্টিমাত্রেরই মৌলিকতা সন্দেহ করিতে করিতে দেশটা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। কৈশোরে "কমলাকান্ত" প্রথম পাঠ করিবার পর যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তখন ইংরাজী সাহিত্যে জ্ঞানাভিমানী এক ব্যক্তি বড় গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, "ওটা De Quinceyর Confessions of an English Opium-Eater-এর অনুকরণ।" বড় হইয়া বুঝিয়াছি, উহা পণ্ডিতের যোগ্য উক্তি নয়। কমলাকান্তের দুই দশটা উক্তির অনুরূপ উক্তি বিশাল ইংরাজী সাহিত্যের কোথাও নাই, এমন কথা বলিব না, কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick Papers-এর Sam-এর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে, তাহাও বিশ্বাস করি, তবু বলিব, উহাতে কমলাকান্তের মৌলিকতার হানি হয় নাই।

বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র "কমলাকান্তের 'এস এস বঁধু এস!'" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ('বঙ্কিম-প্রসঙ্গ,' পৃ. ৫৪-৬৪) "এস এস বঁধু এস" এই গানটি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম কবে কি ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস দিয়াছেন।

উপন্যাসগুলির তুলনায় 'কমলাকান্তে'র বিশেষ প্রচার হয় নাই; প্রথম প্রকাশকাল (১৮৭০) হইতে বঙ্কিমের মৃত্যুকাল (১৮৯৪) পর্য্যন্ত 'কমলাকান্তে'র মাত্র দুইটি (দপ্তরাংশের তিনটি) সংস্করণ হইয়াছিল। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর কমলাকান্তের খ্যাতি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে এবং ঢঙটারও অনুকরণ হয়। বঙ্কিমপার্ষদ রাজকৃষ্ণ অক্ষয়চন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানাঙ্কুরে' যাহা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 'প্রবাসী'র প্রথম-দ্বিতীয় বৎসরে (১৩০৮-৯) তাহা কৃতিত্বের সহিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই কমলাকান্তী ঢঙের পুনঃপ্রবর্তন করেন। পরে চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ও এই ঢঙে লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ব্যঙ্গকৌতুকে' ("কি লিখিব?" প্রবন্ধের অনুকরণে) এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' ("একা" প্রবন্ধের অনুকরণে) কমলাকান্তী ঢঙ ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশে যাঁহারাই ব্যঙ্গ ও রসিকতার বেসাতি করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই কমলাকান্তের নিকট অল্পবিস্তর ঋণ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবে

রাজকৃষ্ণই হউন, অথবা অক্ষয়চন্দ্রই হউন, আসল কমলাকান্তের নাগাল বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া কেহ পান নাই।

"কমলাকান্তের জোবানবন্দী" নাট্যীকৃত হইয়া বহু বার অভিনীত হইয়াছে। 'কমলাকান্তে'র কোনও অনুবাদ কোনও ভাষায় হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

বাহিরের দিক্ হইতে 'কমলাকান্ত' কয়েকটি হাল্কা গম্ভীর ব্যঙ্গ-হাস্য-দুঃখ বেদনামূলক প্রবন্ধের সমষ্টি, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই একটা মূল তত্ত্ব ওতপ্রোত হইয়া আছে, ইহাই কমলাকান্তের দর্শন। শাখা তত্ত্ব আরও দুই-একটা আছে, কিন্তু সেগুলি প্রসঙ্গতঃ আসিয়াছে।

যৌবনের উদ্দীপনায় ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্র চাকুরি এবং সাহিত্য-জীবনে সার্থকতা অর্জন করিয়া, যশ-মান-অর্থ-প্রভাব-প্রতিপত্তিমণ্ডিত হইয়া নির্বিঘ্নেই চলিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে একটা ক্ষোভ ছিল, পরিণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বাঁচিয়া থাকার অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠিত, নিজেকে নিঃসঙ্গ একক মনে হইত। হাল্কা হাসির ঢেউ তুলিয়া চাকুরি ও সংসারের স্রোতে আর পাঁচ জনের মত ভাসিয়া চলিবার মধ্যবিত্ত মনোভাব কোনও দিনই তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাই ভাবনা জাগিত—

> এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই?…আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

যৌবনের উদ্দামতা নাই, আশার রঙিন কাচ চোখের সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে—

> যৌবনের অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়?…এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে প্রহৃত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই।

এই নীরন্ধ্র অন্ধকারে, দিশাহীন ভবার্ণবে যে তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পথ চলিতে চাহিয়াছেন, তাহা প্রীতি, আত্মপরভেদাভেদশূন্য হইয়া প্রেম, জীবে প্রেম—পরের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করা। ইহাই 'কমলাকান্তে'র দর্শন এবং সমগ্র 'কমলাকান্তে' বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই মূলকথাই শুনাইয়াছেন।

> ১। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত

মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না। —একা।

২। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।…আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।…আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই! এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক দিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। —আমার মন।

৩। আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি? —ঐ।

৪। ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। —একটি গীত।

৫। ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। —বিড়াল।

৬। যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর। —বুড়া বয়সের কথা।

সংসার-আসক্তিশূন্য গৃহহীন আশ্রয়হীন, সুতরাং সর্ববন্ধনমুক্ত কমলাকান্তের মুখ দিয়া মনুষ্যপ্রীতির এই অপূর্ব জয়গান উচ্চারণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আপনাকে ধরা দিয়াছেন। এই তত্ত্বই পরবর্তী কালে তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' সম্যক্ বিকাশলাভ করিয়াছে।

'আনন্দমঠে'র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 'মৃণালিনী'তে যাহার সূত্রপাত, 'কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ। বাঙালী জাতির পরাধীনতার সুগভীর ধিক্কার এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কখনও কাতর প্রার্থনা—

কোথা মা! কই আমার মা? কোথা কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি!…আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।…উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। —আমার দুর্গোৎসব।

কখনও হতাশা—

সুখের কথাতেই বাঙালির অধিকার নাই। —একটি গীত।

আবার কখনও ধিক্কার—

আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই। —পলিটিক্স্।

বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙ্গালির ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে? —বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব।

মাতৃপূজার মন্ত্র শিখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এই 'কমলাকান্তে'। আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে 'কমলাকান্ত' হইতেই আমাদের যাত্রা সুরু।

সুতীব্র ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তে' বাংলা সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে যে মর্মান্তিক রহস্য করিয়া গিয়াছেন, আজও পর্য্যন্ত তাহা সত্য হইয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্র-বিবৃত বাঙালী সাহিত্যিকের এই গ্লানি আজিও সম্পুর্ণরূপে খণ্ডিত হয় নাই। এই কথা কি আমরা এখনও অস্বীকার করিতে পারি যে, এখনও বাংলা দেশে

বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীর-শাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই। —ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন।

বঙ্কিম-বর্ণিত সাহিত্য-বাজার কি কিছুমাত্র উন্নত হইয়াছে? নিম্নলিখিত বর্ণনা এখনও কি আমাদের সাহিত্য-বাজার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়?—

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নীচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান?"

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে?"

"আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পদ্মাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে ?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী। —বড় বাজার।

সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি, সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক! —ঢেঁকি।

বর্তমান জগৎ, সুতরাং বাংলা দেশও অধুনা ভোগসুখলোলুপতায় উন্মাদের মত যে লেলিহান বাসনাবহ্নির ইন্ধন জোগাইবার জন্য ছুটিতেছে, এবং যে সোশ্যালিজ্‌মের প্রচণ্ড আঘাতে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান প্রায় ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেই 'কমলাকান্ত' তাহারও দুঃস্বপ্ন দেখিয়া "পতঙ্গে" ও "বিড়ালে" যে মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিল, আজও তাহা পুরাতন হইয়া যায় নাই—কমলাকান্ত-মনের এই চিরসজীবতা ও নবীনতা বিস্ময়কর। অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে কোনও সাহিত্যস্রষ্টা কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিতে পারেন না; বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তে' যে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বহিঃপৃথিবীর প্রচণ্ড সংঘাত আশঙ্কা করিয়া বাঙালীকে স্বদেশের স্বল্পপরিসর মৃত্তিকায় সচেতন ও আত্মস্থ হইয়া দাঁড়াইবার যে ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা দিয়াই আমরা তাঁহার প্রাধান্য বিচার করিব। শাশ্বত শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগে একক ছিলেন, তাঁহার সকল দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধকে ছাপাইয়া তাঁহার সেই নিঃসঙ্গ মনের আর্তনাদ আমরা আজও শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি।

আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্ত-ভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

তিনি একা সুরু করিয়াছিলেন, একাই শেষ করিয়া গিয়াছেন—সার্থক শিল্পীমনের এই বিশেষ প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে পরম বিস্ময়রূপে বিরাজ করিতেছে। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের মত কমলাকান্তও একক।

সূচী

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে "চন্দ্রালোকে," "মশক" এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে, এই জন্য ঐ তিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই। এই জন্য এই গ্রন্থের নামকরণে "প্রথম খণ্ড" লেখা হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থ কেবল "কমলাকান্তের দপ্তরের" পুনঃ সংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে।

কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে। "চন্দ্রালোকে" এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" এই দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে পরিত্যাগ করা গিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, ঐ দুইটি আমার প্রণীত নহে। "চন্দ্রালোকে" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত; এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত। উঁহারা স্ব স্ব রচনার সঙ্গে ঐ প্রবন্ধদ্বয় পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এই ইচ্ছায় আমি কমলাকান্তের দপ্তরের প্রথম সংস্করণে ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। এক্ষণে লেখকদিগের নিকট জানিয়াছি যে, তাঁহারা ঐ দুইটি প্রবন্ধ নিজে নিজে পুনর্মুদ্রিত করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ঐ দুইটি প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণ-ভুক্ত করা গেল।

কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। "বুড়া বয়সের কথা" যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও "কমলাকান্তের পত্র" মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। মোটে পাঁচখানি।

"কমলাকান্তের জোবানবন্দী" সমেত সর্ব্বশুদ্ধ আটটি নূতন পুনর্ম্মুদ্রিত করা গেল। গ্রন্থের আকার অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া এবং অন্যান্য কারণেও গ্রন্থের মূল্যও বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

"ঢেঁকি" শীর্ষক প্রবন্ধটি ভুলক্রমে পূর্ব্বসংস্করণভুক্ত হয় নাই। উহাও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।

কমলাকান্তের দপ্তর

(তৃতীয় সংস্করণ)

উৎসর্গ

পণ্ডিতাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহাশয়কে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহার স্বরূপ

অর্পিত

হইল।

কমলাকান্তের দপ্তর

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন্ কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখা পড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা ? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্, যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

কমলাকান্তের এক বার চাকরি হইয়াছিল। এক জন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া, ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত—আপিসের চিঠিপত্রের উপরে সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত ; বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। এক বার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল "যথার্থ পে-বিল।" সাহেব নূতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখন দারপরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া-বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না ; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখ্‌শিশ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস

প্রথম সংখ্যা

একা

"কে গায় ওই ?"

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন ? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর ;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন ?

কেন, কে বলিবে ? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী— নদী সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অৰ্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ-শরীরা নীল-সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন ; রাজপথে, কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই ? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র ; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন ?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকৰ্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই- অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম,

তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ, মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম ; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম ; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতি-সূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি, উভয়েই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে ; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে ; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে

মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিতলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনিসংমিলিত বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসার-সঙ্গীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্ত কাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় সংখ্যা

মনুষ্য ফল

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্যসকল ফলবিশেষ—মায়াবৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোক্‌রায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ব হইয়া আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ব হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়,—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানুষদিগকে মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি

কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়ই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া দাল্না রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই। যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কাঁটাল কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্ব্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভারগ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,—ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদ-পত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এই মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশুর-পুত্রের শ্যালীপুত্র—খাইতে পায় না, কিছু রস দাও;—সে মাছিটির টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না—পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিবিল সার্ব্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতিমধ্যে আম্রফল মনে করি। এ দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলা আম এমন কদর্য্য যে, পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি আম কাঁচামিটে আছে—পাকিলে পান্‌শে। কতকগুলো জাঁতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল।

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোসামোদ-বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তার পরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা। কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক—কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী

আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দুর্মুখ—আমি ইঁহাদিগের ভৃত্যস্বরূপ ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণ-শূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়, নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম—কেমন জ্যোতির্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে—যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়—উভয়ই চতুর্দ্দিক্ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না—বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না - তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আম্রের ন্যায়, ডাবকেও বরফ-জলে রাখিয়া শীতল করিও— বরফ না যোটে, পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও— মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

(নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোব্‌ড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে—তোমার যৌবন মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে ? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে ? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে ?

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এই জন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। করকচি বেলায় বড় থাকে না ; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল ; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য ? তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। এক দিকে কন্যা বসিয়া

আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,-- কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না-- ঝুনো দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয় ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,--ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না-- ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন-- বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।

তার পরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা— কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ অষ্টেন্ বা জর্জ্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন-- মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোব্ড়া স্ত্রীলোকের রূপ। ছোব্ড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার;—পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোব্ড়ায় একটি কাজ হয়— উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে,--তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে— তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুইয়ের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।*

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল যোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিয়া

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে; কেন না, পুরোহিতেই বিবাহ দেয়। উঃ কি পাষণ্ড!—ভীষ্মদেব।

নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয়—পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন- ছাই ডাব নারিকেলে তাঁহার কি করিবে ?

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড় রাঙ্গা, রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত ; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই —কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে ; তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে !

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতুরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিয়াছি যে, কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব—কিন্তু এই অধম ধুতুরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি সাজিয়া দেয়— যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল। তবে এক গুণ মানি—ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে। যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে চিররুগ্ন। যাঁহারা

সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গাণ্ড জ্বালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন—তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না আগা গোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল. আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই অস্ত ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উঁচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড।—তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায় না যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারি জুতাকে ইংরেজি জুতা বলে, ইহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুমড়ার যে গৌরব অধিক, ইহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তম্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, কদর্য্য, টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

তৃতীয় সংখ্যা

ইউটিলিটি* বা উদর-দর্শন

বেন্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমি এই হিতবাদমতে অমত করি না; বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে আপনারা

* "ইউটিলিটি" শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই—অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র ডেক্‌সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—"ইউ" শব্দে তুমি বা তোমরা, "টিল্" শব্দে চাষ করা, "ইট" শব্দে খাওয়া, "ই" অর্থে কি, তাহা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু বোধ করি কমলাকান্ত, "ইউ-টিল-ইট্-ই" পদে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, "তোমরা চাষ করিয়াই খাও।" কি পাষণ্ড! সকলকেই চাষা বলিল! ঈদৃশ দুর্ব্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। বোধ হয়, আমার পুত্রটি ইংরেজি লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দুরূহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

জানেন কি না, বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে, তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইয়াছে। আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয় জন বুঝিতে পারিবে ? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। সে সূত্রগ্রন্থের সারাংশ এই ;—

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য।

"বৃহৎ"—অর্থাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে।

"জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর"—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্ত্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

"গহ্বর"—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বরবিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থাবিশেষে অঞ্জলি প্রভৃতিও উদরমধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি পুরাইতে হয়।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্ত্তিই পরম পুরুষার্থ।

ভাষ্য।

সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ উদর-পূর্ত্তি।

"আধিভৌতিক"—অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্ত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্ত্তি।

"আধ্যাত্মিক"—যাঁহারা বড়লোকের বাক্যে লুব্ধ হইয়া, কালযাপন করেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উদর পূর্ত্তি হয়।

"আধিদৈবিক"—দৈবানুকম্পায় প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদের উদর পুরিয়া উঠে, তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদর-পূর্ত্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্ত্তিই বিহিত।

ভাষ্য।

"বিহিত"—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্ত্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ। অতএব এ গর্ত্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।

৪। বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম উপাসনা বল এবং প্রতারণা, এই ষড়্‌বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্ব্বপণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য।

১। "বিদ্যা"—বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

২। "বুদ্ধি"—যে আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তূলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ব্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

৩। "পরিশ্রম"—উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

৪। "উপাসনা"—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষকীর্ত্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তন করাকে নিন্দা বলে। আর তিনি যদি দোষযুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে।

গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাঁর গুণকীর্ত্তনকে স্থায়নিষ্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্ হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে উপাসনা বলে।

৫। "বল"—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ চক্ষুর আরক্তভাব—ঘোরতর ডাক হাঁক,—মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী, ইংরাজী এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি,—দূর হইতে ভঙ্গীদ্বারা কিল, চড়, ঘুষা এবং লাথি প্রদর্শন ও সার্দ্ধ তিপ্পান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে।

বল ষড়্বিধ, যথা :—

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল চড় প্রদর্শন প্রভৃতি।

পাদ—পলায়নাদি।

চাক্ষুষ—রোদনাদি। যথা, চাণক্যপণ্ডিত,—"বালানাং রোদনং বলং" ইত্যাদি।

ত্বাচ—প্রহারসহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

মানস—দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।

৬। প্রতারণা—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও।

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ—দোকানদার জিনিষ বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি ; এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইহাদিগের নাম "ভণ্ড"। ইহারা যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহারা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি।

৫। এই ষড়্বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।

ভাষ্য।

এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বিদ্যাদি ষড়্বিধ উপায়ের দ্বারা যে উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"বিদ্যা"—বিদ্যাতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অন্নাভাব কেন ?

"বুদ্ধি"—বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে গর্দ্দভ মোট বহিবে কেন ?

"পরিশ্রম"—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালি বাবুরা কেরাণী কেন?

"উপাসনা"—উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পে-বিল লিখি নাই।

"বল"—বলে যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন?

"প্রতারণা"- প্রতারণায় যদি হইত, তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল হয় কেন?

৬। উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য।

উদাহরণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লোকের কানে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থলাভ হইতেছে।

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষ্য।

এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ দর্শন, এবং উদর দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্তের সূত্র-গ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

চতুর্থ সংখ্যা

পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন,—আমি আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়াপরম্পরায় একটি ফল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাত্রে নশীরামবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহা অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ-ও-ও-ও" "বোঁ-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম- শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, "আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।" আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সে কালে ভাল ছিলে—পিত্তলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারি দিকে ঘুরে বেড়াই—প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে—আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গজাতি, পূর্ব্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ,—আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?—লইয়া কি করিব?—নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপ্ন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি—বোঁ—ও—ও

পতঙ্গ উড়িয়া গেল।

নশীরামবাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত!" আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নশীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ

যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন ;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"। ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেন্ট পল। ভোগ বহ্নির পতঙ্গ, "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা"। রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত," ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, "বোঁ" করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

পঞ্চম সংখ্যা

আমার মন

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকে পাইলাম না? তবে কে চুরি করিল?

এক জন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্‌তার সুগন্ধ, যেখানে ডেক্‌চী-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুটবুটবুট-টকবকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, স্বর্ণময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা-রূপ বজ্র নির্ম্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার

মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেষণে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্ত্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন, কোফ্‌তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই।

বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক। তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্‌কী টিপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারি বামণের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না—আর নিন্দকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না—নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত। ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু দুঃখিত। কেন না, প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা। এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধুঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার অনেক কারণ আছে—প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নির্জ্জল, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, "দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনবি?" সে বলিল, "শুনিব।" আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন্ লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব—সে আমার অনুরোধে আফিম ধরিয়াছিল।

এই সকল গুণে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানালার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত,

ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানালার নীচে নয়, তাহার গোহাল-ঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। এক জন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দানকর্ত্রী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ; আমি দুই জনকেই সমান ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থুলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী এবং ঘটোধ্নী। এক জন গব্যরস সৃজন করেন, আর এক জন, হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত।

কিন্তু আজি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহাল-ঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল?

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার মুখের উপর গভীর-কৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি, গভীর-কৃষ্ণ ভ্রূযুগ, এবং গভীর-কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগুলা ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরূপ অঙ্গ দুলিতেছিল, বোধ হইল, যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে; তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল, যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়া দেখিয়া ঈষৎ রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি ও? সঙ্গ নিয়েছ কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।"

যুবতী কটূক্তি করিয়া গালি দিল। বলিল, "চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর কষিয়া আমি ফিরিয়া দিয়াছি।"

সেই অবধি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, মনের সন্ধানে আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পাই না, কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতেই আমার আর মন নাই। শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতায় মন নাই, যে রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছেঁড়া পুথি ছিল—তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না—এখনও নাই। কিছুতে আমার মন নাই—আমার মন কোথা গেল?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই; নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি,

তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের রইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়. তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথম বারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে; প্রথমতঃ, অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়; এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্যবস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ; কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়: সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে; ধন পত্নীজারেও ভোগ করে; মান সম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদির অকার্য্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্যমাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাদির সর্ব্বসারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে—শিশু দেখে, রাত্রিদিন পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রাতিবেশী শত্রু মিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা সম্ভ্রম! করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে? যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না? নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত

হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা এক দিন ফলিবে! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে!

কথাটি প্রাচীন। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "মেটিরিয়েল্ প্রস্পেরিটির"* উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ্ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ্ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে —সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দু-ভূমি জাল-নিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়াআনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে। ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও—কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা, যে সম্বাদ-পত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেক্‌চর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ্ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে। বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর; শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক। টাকার ঝন্‌ঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক! মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ্।

* বাহ্য সম্পদ্।

হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম্ স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদ-পত্রসকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র কাঁসিদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে মিলিয়া বাহ্য সম্পদের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া, বঞ্চনা-বিল্বদলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা করি। বল, হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল—ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্ ছ্যাড়্! বাজা ভাই কাঁসিদার,—ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং! আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন্ কামার! পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি; একবার বাবা পঞ্চানন্দের* নাম করিয়া, এক কোপে পাচার কর! হর হর বম্ বম্! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটি দিও! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর!

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয় জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? কয় জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? এক জনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এই ছাই আমরা চাহি না—আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর

---

* পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে—পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্য, মাংস, গাড়িজুড়ি, পোষাক এবং বেশ্যা—এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্ম-পরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার?

ষষ্ঠ সংখ্যা

চন্দ্রালোকে

এই তৃণ-শষ্প-শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী তীরে, এই স্ফুটচন্দ্রালোকে, আজি দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবর-বৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না ট্রৈলস্ শর্ম্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিয়া, উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেন! এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিসবী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশির-পাত-সিক্ত শষ্প মৃদু পদে দলিত করিয়া পিরামসের সঙ্কেতস্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন? অভিসারিণী শব্দটিতে অভি একটি উপসর্গ আছে, সৃ একটি ধাতু আছে এবং স্ত্রীত্ববাচক একটি 'ইনী' আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্ম্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্তু সোপসর্গ ধাতুবিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না। কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না। কমলাভিসারিণী, এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতে "পসারিণী" বলিয়াছে, কখন অভিসারিণী বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত, তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র, তুমি হাস্য করিতেছ ? হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ ? তোমার সাতাইশ ইন্দ্রি শুদ্ধ আমাকে দেখিয়া, আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছ ? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম্ম— একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্ম্মা বিবাহের জন্য লালায়িত। অমল-ধবল কিরণরাশি সুধাংশো ! আর সকল তোমার থাক্, তুমি অত্যন্ত অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালবাসি। আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক উহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুই দিন গৃহবাসসুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান করিয়া, সুখে কাল কর্ত্তন করিব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে—লোকে নিজে অক্ষমতানিবন্ধন কোন কর্ম্ম করিতে না পারিয়া, স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া, লোকের কাছে আস্ফালন করিতে পারে। আমিও নসীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি, তবে আমার সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব।

চন্দ্রদেব ! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না ? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষ-বসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছ ? এখনও মন্দ সমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে ঝলক বর্ষণ করিবে ? এখন তৃণক্ষেত্রে মণি মুক্তা মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে ? উলুবনে মুক্তা, আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব !

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার নির্-দুর্-বি-অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি. এ. না হলে বিয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিল। উচ্চ শিক্ষায় ফল কি ? ছাপর খাট—রূপার কলসী, গরদের কাচা, এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, পট্ট-বসনাবৃতা, একটি বংশখণ্ডিকা ! হরি হরি বল, ভাই ! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী বি, এ, উপাধিধারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশখট্টাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল !!!* প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটীরের একমাত্র দণ্ডিকা একটি বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত হেমকূট পর্ব্বত-নিকটস্থ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল, ভাই ! তাঁহার এত দিনে

* বোধ হয়, এই রাত্রি হইতেই কমলাকান্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

সমাধি হইল !!! তিনি উচ্চশিক্ষালাভার্থ বহু যত্নে কামস্কট্‌কা দেশের নদীসকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন! এই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথপ্রদীপে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্যই শার্লিমানের ঊর্দ্ধে বায়ান্ন পুরুষ, নিম্নে সাড়ে তিপ্পান্ন পুরুষের কুলজি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ; ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল। এবং বংশ-দণ্ডিকার স্থাপন করিয়া উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীবধর্ম্মের চরিতার্থতা হইল।

এরূপ বংশ-দণ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নহি; আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয়, তাও কর্ত্তব্য, তথাপি এরূপ বংশ-দণ্ডিকা আশ্রয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্যাদি বিবাহ করিব, যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে—ঘোমটাটানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।

ভাগীরথি! যদি তুমি শান্তনুবক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবনে, অথবা আরো উচ্চতর ধূর্জ্জটির জটা-কলাপে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে কে আজ তোমায় উপাসনা করিত? তুমি নীচগা হইয়া, মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে! সমীরণ! তুমি যদি অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া চিরক্রীড়াসক্ত থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নমিত করিয়া বা এলা লতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে, তাহা হইলে কে তোমাকে "ত্বমেব জগজ্জীবনং পালনং" বলিয়া আর তোমার স্তব স্তুতি করিত? এই বাল-বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমকুলের কাকলি যদি কেবল নন্দন-কাননেই প্রতিধ্বনিত হইত, তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন? সুধাংশো! যদি তুমি ক্ষীরোদ-সাগরতলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবালপালঙ্কে মৌক্তিক-শয্যায় শায়িত থাকিতে, তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণীমুখ-মণ্ডলের তুলনা করিত? অথবা তোমার ঐ সাতাইশটি ক্রমান্বয় ভর্ত্তৃকা লইয়া খলু সার শ্বশুর-মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে, তাহা হইলে আজি কমল শর্ম্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া—এই শ্মশাননিকট বটতলায় তীরস্থ হইয়া বাস করে?

শশী—যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্ বলিতে পারিব না—আমি এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম; শশী, তুমি অনাথার কুটীরদ্বারে প্রহরীরূপে অনিমেষনয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে

নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শন লাভার্থ, ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে থাকে, তখন তুমি এক একবার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক, নববধূ যখন মন্দ বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নারিকেলকুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল কর ; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গিত-হৃদয়ে ধীর প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু-অভিগামিনী হয়, তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণ-ভূষণে ভূষিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক ; গোপাল যখন বসন্ত-রাগে এক বৃন্তে চারি দিক্ দেখিয়া হেলিতে দুলিতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কানে কানে পরামর্শ দেও। আবার সেই তুমিই অসদভিসন্ধিৎসু নব যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি ভ্রূকুটি করিতে থাক যে, সে তোমার মুখ পানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না ; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোণিত-বিন্দুতে চৌষট্টি রৌরব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী, তরুণের আশা-প্রদীপ ; যুবক যুবতীর যামিনী-যাপনের প্রধান সম্ভোগ-পদার্থ ; এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী, স্থির দীপধারী ; তুমি পথিকের পথ-প্রদর্শক ; গৃহীর নৈশ সূর্য্য ; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী ; পুণ্যাত্মার চক্ষে তাহার যশঃপতাকা। তুমি গগনের উজ্জ্বল মণি ; জগতের শোভা। আর এই শ্মশানবিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল ; তুমি ভালর ভাল, মন্দের মন্দ ; রসে রস, বিরসে বিষ। তুমি কমলাকান্তের সহধর্ম্মিণী ; শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল, ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন—সকলে একবার হরি হরি বল, ভাই!

বম্ ভোলানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল!

চন্দ্র আমাদিগের আর্য্য মতে পুরুষ বটে, কিন্তু বিলাতীয় শর্ম্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে চন্দ্র হি,* ইংরাজিমতে চন্দ্র শী। এখন উপায়? হি কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে।

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমার এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালিশাহা লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে

* হি শী কাহাকে বলে? শুনিয়াছি, দুইটি ইংরাজি সর্ব্বনাম—হি পুংলিঙ্গ—শী স্ত্রীলিঙ্গ।

—শ্রীভীষ্মদেব।

চতুর্দ্দোলারোহণে ঘুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস হংসী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ সহিত বারি-হ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, শ্রীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি হি না শী ? এবং যে মহিষী দেশ-বাৎসল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া—রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পার্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি ? তবে ত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না। তবে যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে ? যে জোয়ান ওলিয়ান্স দুর্গ আক্রমণকালে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাতে শী বলিব, না হি বলিব ? আর যে বেড্‌ফোর্ড—তাহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব, না শী বলিব ? না, যুদ্ধ-কৌশলে বুঝিতে পারিলাম না। তবে শুনা যায়, যে বলীয়ান, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দুর্ব্বল, তাহারাই স্ত্রীলোক। ভাল—কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা স্থির করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্লোতিলড দেবো স্বীয় প্রতাপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব ? রোমক পত্তনের কৈসরগণ এক এক জন পৃথিবীর রাজা, যে মৈসরী রাজ্ঞী ক্লিওপেটরা এরূপ তিন জন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব ? বাস্তবিক জগতে কে হি, কে শী, তাহা স্থির করা যায় না। সে দিন কীর্ত্তন হইতেছিল, যখন কীর্ত্তন-গায়িকা বলিল—"সিংহিনী হইয়া শিবাপদ সেবিব ?" এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্ত্তন-গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবাস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, এর কোন্‌গুলি হি, আর কোন্‌গুলিই বা শী ; তাহা হইলে আমি অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্ত্তনকারিণীই হি এবং তাঁহার জড়বৎ শ্রোতৃবর্গই শী। বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্ব্বত্র বিকল্পে ইট্‌ হন। তাহার নিত্য-বিধিও আছে। যথা—ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী, এবং বিষয়কর্ম্মে ইট্‌। তাঁহারা বক্তৃতার সময়ে হন হি, সাহেবের কাছে শী, মদ খাইলে হন ইট্‌। ফলে ইট্‌ যাহা হউক, হি, শীর বিষয়ে আমার আপনা আপনি অনেক সন্দেহ হয়। মধু চাটুয্যে আমার নাম সংযোগ করিয়া কি বিদ্রূপ করিয়াছিল বলিয়া, যে প্রসন্ন, স্বচ্ছন্দে পূর্ণদুগ্ধ-কুম্ভ তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া, চাটুয্যের বক্ষ-কবাটের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শী—আর আমি—নশীবাবু কি না এক দিন বলিয়াছিলেন যে—"চক্রবর্ত্তী ঝিমুতে ঝিমুতে আজ বিছানাটা পোড়ালে, এক দিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখ্‌ছি"—সেই ভয়ে আফিমের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই আমি হইলাম

হি ? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ বিসম্বাদ। ফল কথা, যখন আমি নিজে হি, কি শী, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি কিম্বা শী, তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে ? যদি চন্দ্র হি হয়েন, ত আমি শী—কেন না, আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত এক জন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব।

এখন নানা মতে নানা কার্য্য হইতেছে ; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার দশকর্ম্মান্বিত হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্তরূপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ, আমার সোনারচাঁদ শশীকে স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করে। প্রথম রামের স্থানে ইহারা মাতৃ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নী-সেবা, এবং শেষ রামের নিকটে বারুণী-সেবা শিক্ষা করিয়াছেন। ইহারা বৌদ্ধ-মতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া, কল্কিমতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্ত-মতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয় ; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরুশালমের প্রথম গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা করিতে হয়। মেজো গৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীর মত হরিসংকীর্ত্তন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয়।

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজি মতে, শী স্থির করিয়া, হোস্ বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস্ তবিয়তে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলাম। আমি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে অন্যের বিনা সরিকতে তোমাতে ভোগ দখল করিতে থাকিব। ইহাতে তুমি কিম্বা তোমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে। তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল।

আর অমন করিয়া, পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, ঢলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে ? আর অমন করে মুচ্‌কে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে তর্ তর্ করিয়া কত দূর চলিয়া যাইবে ? ইতি কোর্টশিপ্ সমাপ্ত :—

এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমাল্য প্রদান কর।

কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা, বরকর্ত্তা বর।
নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর॥

এক বার হরি বল, ভাই ! হরি হরি বোল।

আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মুদিত হইবে না। কমল ফুল্ল হইতে দেখিলে আর চন্দ্র ম্লান হইবে না। এই বার ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—পূর্ব্বে—

কমল মুদিত আঁখি চন্দ্রেরে হেরিলে,
এখন
চন্দ্রেরে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে।
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল,
কিন্তু
কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল।

আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড়, না কনে বড়, এই দেখ, বর বড়—

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়,
চক্রবর্ত্তী পরিপূর্ণ এক কাঁদি কলায়।
সেই কলা কভু লুপ্ত কভু বর্ত্তমান।
কমলের বাগানের সব মর্ত্তমান।

দেখ শশী, এখন নির্জ্জন হইল। তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গর্ব্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছড়ি করিও না। যখন পুত্র-শোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে? তখন কলঙ্কিনি! তোমার রূপরাশি গাঢ় মেঘান্তরালে লুকায়িত করিয়া রাখিও। যখন সংসারজ্বালাজালে লোকে দগ্ধ হইয়া তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে, তখন তোমার সৌন্দর্য্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসারদগ্ধ, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য্য তীব্র বিষক্ষেপরূপ হইবে। বরং রক্ত রাগে তাহার সহিত আলাপ করিও। যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহ্য করিতে পারে না। আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-ভোগ্যা, তুমি আর কি দেখাইয়া অপরকে সান্ত্বনা করিবে? কিন্তু কমলাকান্তের সময় অসময় নাই, ঘটন বিঘটন নাই, সুখ দুঃখ নাই। তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার নিজকথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া, আপনার অন্তরে আপনার অস্থি-মজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইয়া, রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যোৎস্না রাত্রিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও, ও কোমল কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে বুঝিতে পারিবে? অদ্য হইতে মাস গণনা করিয়া, প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে শষ্প-বাসর সমাপন করিব। সকল পূর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না; পঞ্জিকাকারগণের সহিত দিন ক্ষণের পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারিণী

হইও, নচেৎ এক দিন রাহু তোমাকে পথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিয়া ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহ-রাত্রিতে নব বধূকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্ম্ম-যাজকতার ভাণ হয়। সুতরাং অলমতিবিস্তরেণ।

এখন এক বার,

কমল শশীর বাসর ঘরে,
ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে।

এখন শশী, এক বার এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাঁদে নৃত্য কর দেখি! এক বার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া, এক বার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি! এক বার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রন্ধ্রপথে এক চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! এক বার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে, অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি! এক বার দ্রুত সঞ্চালনে শ্রান্তি বোধ করিয়া মুক্তাবিনিন্দিত স্বেদবিন্দুসিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগনগবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু সেবন কর দেখি! এক বার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোরচক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি সাধন কর দেখি; এক বার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল।

শশী, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা ত্রিভুবন-বিহারিণী হইয়াও বালিকা-স্বভাব-সুলভ অভিমানের ভজনা করিলে? কমলাকান্ত কোন্ দোষে দোষী বলিতে পারি না—কখন এক বার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জটিলতা-জাল-চ্ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম করিয়াছিলাম বলিয়া এত অভিমান আজিকার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি কলঙ্কিনী, তবু আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যাবধি Lunatic* নাম ধরিলাম। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন, তুমি পাষাণী— তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তাঁহারা বলেন, তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তবু রাগ?— তবে এই সংসার-গরল-খণ্ডন, এই গিরি-তরু-শিরসি-মণ্ডন, ঐ কর-লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যদি, ঐ অনন্তনীল বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোমটা এক বার টানিয়া, এক বার রাই মানিনী হইয়া বসো! আমি এক বার স্ত্রীলোকের পায়ে ধরিয়া এ জড়জীবন সার্থক করিয়া লই।† আজি আমি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র-ফলক। আমার বৈতরণীর নবীন বৎস।

---

* চন্দ্রগ্রস্ত, চাঁদে পাওয়া বা পাগল।

† আমি জানি, কমলাকান্ত এক দিন প্রসন্ন গোয়ালার পায়ে ধরিয়াছেন। কিন্তু সে দুধের জন্য।

—শ্রীভীষ্মদেব

অমন করিলে আমি শত সহস্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতি পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্ত্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে শিখিয়াছে। কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব, নব পল্লবিকা শাখা-স্কন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া করপত্র সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে, তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব, পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বঙ্কিম গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে, তখনই আমি স্থলকমলে, জলকমলে মিশাইয়া দিব। যখন দেখিব, নির্ঝরিণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোকালুফি করিয়া খেলা করিতেছে, তখনই তাহাকে সেই ধনুঃ স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আমার সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব, অনন্ত শয্যায় স্বর্ণদী মণিভূষায় শ্বেতাম্বরে ভূষিত হইয়া উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব, কুঞ্জলতা কানে ঝুম্‌কা দোলাইয়া শ্যাম চিকুররাশি চারি দিকে ছড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে মৃদু সৌর কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছমধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ঝুম্‌কা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী এখন বিবাহ করিতে শিখিল, ঘটকালী শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করিবে না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত বিবাহ কর —আমি বেশ ঘটকালী জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব।

সপ্তম সংখ্যা

বসন্তের কোকিল

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো ছুলালি ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নশীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চসমার হাট লাগিয়া যায়,—কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নশীবাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলি-সংকুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে

মানুষ কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘর বাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে. কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নশীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নশীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও "অসুখ," এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন?

তা ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, এক বার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই "কু" —তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, "কু—উ।" যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে আমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু—উ"—কেন না, তুমি সৌন্দর্য্যশূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ।" যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ।" যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘন-বিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ "কু—উঃ।" যখন দেখিবে, শুভ্র-মুখী, শুদ্ধশরীরা, সুন্দরী নব-মল্লিকা সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রাখর্য্যের হ্রাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে—স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে,—যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—"আদরেতে আগুসারি"—কণ্ঠভরা গুন্‌গুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার "কু—উঃ" বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িম্বশাখায় বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণে

সেই লতার দোলনি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ "কু—উঃ!" ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চম-স্বর! নহিলে তোমার ও কু—উ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন ডিস্রেলি প্রভৃতির স্থায়,—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো চলিত না ; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন ? আর জন ষ্টুয়াট মিল পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন ?

তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা-পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপ-মণ্ডিত, গিরিনদীনগরকুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভা-গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম-স্বরে— কু—উঃ বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হষ্টিংস্ পর্য্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। "কু—উঃ!" ভাল, তাই ; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈ কি ? সব কু। লতায় কণ্টক আছে ; কুসুমে কীট আছে ; গন্ধে বিষ আছে ; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে। কু—উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চম-স্বরে কু বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি "কু ক্ক কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাত নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না ; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—বে-পর্‌দা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয়। সর্ জেমস্ মাকিণ্টশ্, তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির* কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন—আর মেকলে রেটরিকেরণ† পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভ-স্বর কে শুনে ? দেখ, লোকের বৃদ্ধ পিতা মাতার বেসুরো বকাবকিতে কোন্ ফল দর্শে ? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কান টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং পিড়িং বলেন, কি না ?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে. তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট, তাহাই পঞ্চম ? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,—সুরের পঞ্চম, আর আল্‌তাপরা ছোট পায়ের গুজ্‌রী পঞ্চম। তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট ; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট।

কোন্ স্বর পঞ্চম, কোন্ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে ?

---

* দর্শন।

† অলঙ্কার।

এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর—বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি? যদি কেহ পাখোয়াজ তানপুরা দাড়ী দাঁত লইয়া আমাকে সপ্ত স্বর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জ্জন শুনিয়া, মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যঃপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে—তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জ্জল দুগ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

এখন আয়, পাখী! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস—আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা; আমারও পুঁজিপাটা এই আফিঙ্গের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চম-স্বর ভালবাসিস—আমিও তাই; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল্ দেখি, পাখী, কারে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি! এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস না, আমিও জানি না; তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর আমার ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয়, ভাই, একবার মিলে মিশে দুই জনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল এক বার ডাক্ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া, আমার মনের কথা কখন বলিতে পাইলাম না। যদি তোর ও ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম, ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে এক বার ডাক দেখি রে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল্ দেখি রে! কমলাকান্তের মনের কথা, এ জন্মে বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীমধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল আমার হয়ে এক বার ডাক্ দেখি রে?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

অষ্টম সংখ্যা

স্ত্রীলোকের রূপ

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক্ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের ধৈর্য্য-চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে; যখন পুরুষের মন-চড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাঁহাদের কর্ম্ম-জাহাজ, ধর্ম্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাসিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনীকুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে; পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনী শক্তির বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্ব্বত, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, লতা গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান—আবার অনেককেই অপমানিত করিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরত পাঠান; গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা উষার সীমন্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্য্যদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সেই অবধি কমল কুমুদে কীট পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীরসঞ্চালনে তাঁহারা এত লাবণ্যলীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিন্ধু-হিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন উঠে না। এই জন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরের মলয়-মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্ত্তির স্তাবককুলের উপমানুভবশক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু, তাঁহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মৎস্য, যথা সফরী; কখন উদ্ভিদ্, যথা পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর; কখন জড় পদার্থ, যথা আকাশের তারা। এক চন্দ্র,

কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর।* উচ্চ কৈলাস-শিখর, এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেরই উপমাস্থল; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব, কদম্ব, করিকুম্ভ এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনী-দিগের গমনসাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় নহে; যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্রগামিনীগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি, হাতী এক দিনে অনেক দূর যাইতে পারে; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনী-দিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন? যে দিকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয়?

আমিও এক কালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীষ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনী-কান্তি-গ্রথিত কুসুম-মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম; বর্ষার উচ্ছ্বসিত-সলিলা চিররঙ্গিণী তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুব্‌রে পোকা পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; দুরন্ত গোরু একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারিলে যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি। সকলই আফিমের প্রসাদে! হে মাতঃ আফিম দেবি! তোমার কৌটা অক্ষয় হউক। তুমি বৎসর বৎসর সোণার জাহাজে চড়িয়া চীনদেশে পূজা খাইতে যাও! জাপান, সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকলই তোমার অধিকারভুক্ত হউক; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলাকান্তকে পায়ে রাখিও। আমি তোমার কৃপায় সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা বলিব।

---

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের তুলনা অতি সুন্দর—কেন না, উত্তম পদবিন্যাস হইতে পারে—যথা, নখর-নিকর হিমকর-করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে।—এটি আমার নিজের রচনা।

—শ্রীভীষ্মদেব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোক কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন, ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গালিলিও* বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে। ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধাৰ্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল। ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধাৰ্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না; গালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ী মোহিনীগণ! কুটিল কটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না; কালসর্পী-বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না, ভ্রূ-ধনুতে কোপে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্ ছার! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূৰ্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিকৃত প্রতিমূৰ্ত্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে

* কোপর্নিকস P. D.

আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী ; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা ; এমন কি, বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলক জগন্নাথকে দোলায় ; যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢাকাই-কানরূপ নানা ফলফুল পশুপক্ষিবিশিষ্ট বাগানের যোড়া কানে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর ফাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতি বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে ; স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্য বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রককলাপ ময়ূরের আছে ; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল "বিদ্যাসুন্দর"-কার! তোমার মনে কি এই তত্ত্বটি উদিত হইয়াছিল? এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।

সৌন্দর্য্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু, রূপান্ধ ভামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলায় লাবণ্য-মালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পঁচিশের উর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্ত্তের জন্য না হউক, অত্যল্প কালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি ; —আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অন্ন ব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুক্‌ড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর-লবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া, তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্যনির্ণয়ে অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে। যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগনেত্রে কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতির অঞ্জনে মাখাইয়া দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পরিবৃত থাকে। বিকট মূর্ত্তিকে সে মনোহর দেখে। কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে। প্রেতিনীর অঙ্গ-ভঙ্গীকে মৃদু-মন্দ মলয়-মারুতে দোদুল্যমানা ললিতলবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এজন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। এজন্যই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোখের আদর। এজন্যই কাফ্রিদেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের আদর। এজন্যই বাঙ্গলাদেশের উল্কি-চিত্রিত মিশি-কলঙ্কিত চাঁদবদনের আদর। এজন্যই মানবসমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে, হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্ত ভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গূঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিনী?

রূপ, রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে, রূপই কামিনীকুলের

মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্ব্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনা-বর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোবিদ্‌মণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসার-সাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেক দিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটী গুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতি পুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্মের জন্য বাহ্য সুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর বুঝিয়াছেন যে, কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানস পটে, সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধা স্বামিচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ-পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি!

যখন আমি ভাবি যে, কিছু দিন হইল, আমাদিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, মহত্ত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গপৌরাঙ্গনাগণ—তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন! তোমাদের মিছা রূপের বড়াইয়ে কাজ কি?

নবম সংখ্যা

ফুলের বিবাহ

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসীবাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দ্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উঁচু, স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্ত্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা-বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! মেয়ে আছে?"

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, "আছে!" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্! গুণ্ গুণাগুণ্! মেয়ে দেখিব।"

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! গুণ দেখিতে চাই। ঘোম্টা খোল।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোম্টা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—বলিল, "দিদি, একবার ঘোম্টা খোল—নইলে, বর আসিবে না—লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার" ইত্যাদি! কলিকা কত বার ঘাড় নাড়িল, কত বার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, "ঠান্দিদি, তুই যা!" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণাগুণ! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?"

কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, "কর্ম্ম দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন, "গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ—ঘটকালীটা?"

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, "তাও হবে।"

ভ্রমর—"বলি, ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ—গুণ্, গুণ্, গুণ্।"

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল—বর কে?"

ভ্রমর—"বর অতি সুপাত্র।—তাঁর অনেক গুণ্-ন্ ন্।"

"কে তিনি ?"

"গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অনেক—গুণ্-ন্—ন্।"

এই সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিমপ্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন; কেন না, ইহারা "ফুলে" মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাগ্মামালীর সন্তান; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই ?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া, বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, "আজি কালি ফুটিবে।"

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্র চলিল; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী—শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীরের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে এক পাল পিপ্‌ড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায় ? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ্। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন; তখন হুঁ—হুম্ করিয়া অনেক মর্দ্দানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের

সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর বরযাত্র, সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোম্‌টা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধ প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত; নসীবাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সুচ সুতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যূই, কণ্ঠের সই, কণ্ঠের কাছে গিয়া শুইল; রজনীগন্ধকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুম্‌কা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন—

"কমলকাকা—ওঠ বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ও কি, ঢুলে পড়্‌বে যে?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল;—চমক হইলে দেখিলাম, কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল?—মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে, এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল,—সেই হাস্যমুখী শুভ্রস্মিতসুধাময়ী পুষ্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে—ধ্বংসপুরে! এই বিবাহের ছায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে—কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি?

কুসুম বলিল, "ওঠ না—কি কচ্চো?"

আমি বলিলাম, "দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেঁষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে, কাকা?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।"

"ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।"

"কই?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

দশম সংখ্যা

বড় বাজার

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর সর, দধি দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদ্গতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে;—জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানব-চরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে!

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক! এত দিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস-জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা। এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গল্প—আকাশ-কুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষ্যজাতির কি হইবে! হায়, অর্থলুব্ধ গোয়ালা জাতিকে কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালার কবে গোরু চুরি যাবে!

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ, ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে; গোরু গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য

দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, "আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদ্দার চলে আয়"—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোকে ধুলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভাবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিষ ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়।—দেখিলাম যে, সংসারে সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসিগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিস, চুনো পুঁটি, কই, মাগুর খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে; যত বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে।—মেছুনীরা ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়্‌বো—বোঝা বিক্রী হলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো—ধন সাগরের মিঠা মাছ—যে কেনে, তার পুনর্জন্ম হয় না—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিনিবে। সোণার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়—কে খরিদ্দার সাহস করিস্—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নাতি ঝাঁটা—গলায় বাঁধলে শাশুড়ীরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পলায়!" কেহ ডাকিতেছে, "ওরে আমার সরম পুঁটি, বিক্রি হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে,—সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার এই সরম পুঁটির বলে।" কেহ বলিতেছে, "কাদা ছেঁচে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম—কেন না, আমার নিরামিষ ঘরকন্না। দেখিলাম, মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনিলাম, দর "জীবন সর্বস্ব।" যে মাছ ইচ্ছা, সেই মাছ কেন, একই দর,

"জীবন সর্ব্বস্ব।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, এ মাছ কত দিন থাইব?" দালাল বলিল, "দু দিন চারি দিন, তার পর পচিয়া গন্ধ হইবে।" তখন "এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?" ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছনীরা গামছা কাঁধে মিন্‌সেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি কোঁটা-কাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া, নামাবলি গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—"বেচি আমরা ঘটত্ব পটত্ব মত্ব গত্ব—ঘরে চাল থাকিলেই স্ব-ত্ব, নইলে ন-ত্ব। দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ—বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ। পদার্থতত্ত্ব নামে ঝুনা নারিকেল—খাইতে বড় কঠিন—তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে, ব্রাহ্মণীই পরম পদার্থ। অভাব নামে নারিকেল চতুর্ব্বিধ*—তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা অন্যোন্যাভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাব; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অভাব। অভাব নিত্য, কি অনিত্য, যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার—দেখিবে, নিত্যই অভাব। অতএব আমাদের ঝুনা নারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি, এ নারিকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনা নারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে। দেখ বাপু, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য্য হইবে, কম দিলেই অকার্য্য। আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনা নারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,—অকারণ। অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনা নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মরিব।"

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগ্‌বিতণ্ডাজনিত অধরসুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিবে কি প্রকারে?"

"না বাপু, দা রাখি না।"

"তবে নারিকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলি না আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।"

শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।

---

* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতুর্ব্বিধ; অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব আর অত্যন্তাভাব।

শ্রীকমলাকান্ত।

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেণ্টেল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে।

MESSRS BROWN JONES AND
ROBINSON
NUT SUPPLIERS

ESTABLISHED 1757
ON THE FIELD OF PLASSEY.
MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON,
offer to the Indian Public
A Large Assortment of
NUTS.

PHYSICAL, METAPHYSICAL,
LOGICAL, ILLOGICAL,
AND
SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS
AND
DISLOCATE THE TEETH OF
ALL INDIAN YOUTHS
WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR
DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED.

দোকানদার ডাকিতেছেন—"আয় কালা বালক, Experimental Science খাবি আয়। দেখ, ১ নম্বর এক্সপেরিমেণ্ট—ঘুসি; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা এ সকল এক্সপেরিমেণ্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি--পরের মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ সাধনে পটু—রাসায়নিক বলে বা বৈদ্যুতীয় বলে বা চৌম্বক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুষ্ট্যাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায়; যথা বায়ুতে অম্লজান ও যবক্ষারজানের সামান্য যোগ, জলে জলযান ও অম্লজানের রাসায়নিক যোগ, আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, আমাদের হস্তে, মুষ্টিযোগ। অতএব এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও; এক্সপেরিমেণ্ট করিব। দেখিবে, গ্রাবিটেশ্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমাদের মস্তকে

পড়িবে ; পর্কশন্ নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে।

অগ্রিম মূল্য দিও ; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেণ্ট খাইতে পারিবে।"

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল ?" সাহেবেরা বলিলেন, "ইহাকে বলে, Asiatic Researches." আমি তখন ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন ; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নেচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান ?"

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে ?"

"আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পদ্যাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে ?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম ; দেখিলাম, যত উমেদার, মোসায়েব সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাঁকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও—যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত—আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও

প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব—আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আব্দাশ, তোমার কানে অবিরত খোসামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি, বন্ধুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন বন্ধু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তার পরে যশের ময়রাপটী। সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া, সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোসামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।

বিক্রেয়—অনন্ত যশ।

বিক্রেতা—কাল।

মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম, সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়—ছোট বড় কসাইসকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে ;—ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া এক জন কসাই বলিল, "এও গোরু, কাটিতে হইবে।" আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়েহাটা দেখিতে লাগিলাম—গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখিলাম, নসীবাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—"চক্রবর্ত্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"

একাদশ সংখ্যা

আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমীপূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি! আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি! সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—

এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কাল-স্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুল-পালিকে! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি!—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধুসেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধুমথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্ত-শক্তিপ্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? ঐ ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব, এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয়

কি ? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল ! চল ! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি ? না হয় ডুবিব ; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি ? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সৎকীর্ত্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো—" বড় পূজার ধুম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা ! মা ! মা !—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি।
জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি ॥
জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে ॥
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি ॥
দ্বেষকদলনি, সন্তানপালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ॥
জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে।
জয় জয় কমলাকান্তপালিকে ॥
জয় জয় ভক্তিশক্তিদায়িকে।
পাপতাপভয়শোকনাশিকে ॥
মৃদুল গম্ভীর ধীর ভাষিকে।
জয় মা কালি করালি অম্বিকে ॥
জয় হিমালয়নগবালিকে।
অতুলিত পূর্ণচন্দ্রভালিকে ॥
শুভে শোভনে সর্ব্বার্থসাধিকে।
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে ॥
জয় মা কমলাকান্তপালিকে ॥

নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমোঽস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে॥
ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি।
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি॥
নমোঽস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দনি নমোঽস্তু তে।
প্রিয়দান্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে॥
ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তিনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোঽস্তু বিমোচিতঃ॥*

দ্বাদশ সংখ্যা
একটি গীত

"শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।"

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, "আমার এখন গান শুনিবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা হলো।"

কমলাকান্ত। "এসো এসো বঁধু এসো।"

প্রসন্ন। "ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বঁধু?"

কমলাকান্ত। "বালাই! ষাট, তুমি কেন বঁধু হইতে যাইবে? আমার গীতে আছে"—

এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো—

সুর করিয়া আমি কীর্ত্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম।

"এসো এসো, বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

* আর্য্যাস্তোত্র দেখ।

বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

মিল ত চমৎকার, "দেখি" আর "বিধি" মিলিল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ মন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখনই এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না ; কখন ভুলিতে পারিব না।

"এসো এসো বঁধু এসো"*

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে "এসো এসো বঁধু এসো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়-কামনা। মনুষ্য-হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল শরীর রক্ষার্থ—মহতী প্রবৃত্তিসকলের উদ্দেশ্য, "এসো এসো বঁধু এসো।" তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য—কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জনসমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া ; হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব—"এসো এসো বঁধু এসো।" সর্ব্বকর্ম্মের এই মন্ত্র, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" সৌর পিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড়পিণ্ডসকল, গ্রহ উপগ্রহ

* পাঠককে গীতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

ধূমকেতু—সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি—"এসো এসো বঁধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে?

"আধ আঁচরে বসো।"

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। কুশকণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বসো। যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব,—দূরে আসনগ্রহণ করিও না—এই আমার শরীরলগ্ন অঞ্চলার্দ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্বিনীত! হে আজন্মবিবাহশূন্য! তুমি এতদর্থে শান্তিপুরে কন্যাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্দ্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজও জন্মে নাই। মনের নগ্নত্ব জ্ঞান-বস্ত্রে আবৃত; অর্দ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মূর্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে ডাক—"এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো।"

"নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"

কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্মযশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখিটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ—যেখানে বালক, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্তস্ফুটিতা মধ্যাহ্নপদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি যে, কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত; পরিতৃপ্তি-

রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। যে কারিগর এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না; কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি। মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে। হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে! নয়নে যে পলক আছে!

"অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে!"

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য-দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে, আমি অনন্ত কাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না—এত দিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্য্য হইত—জীবনযাত্রা দুর্বিবষহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দিবস-গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখী জন দিবস গণিয়া থাকে। দিবস-গণনা দুঃখবিনোদন। কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে, সে দিবস গণে না; দিবস-গণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসার-সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ—সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ—আমি কেন দিবস গণিব?

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল,

কই ? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই ? মনুষ্যত্ব মিলিল কই ? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই ? ঐক্য কই ? বিদ্যা কই ? গৌরব কই ? শ্রীহর্ষ কই ? ভট্টনারায়ণ কই ? হলায়ুধ কই ? লক্ষ্মণসেন কই ? আর কি মিলিবে না ? হায় ! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না ?

"মণি নও মাণিক নও, যে হার ক'রে গলে পরি—"

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন ? রূপ জড়পদার্থ কেন ? সকলই অশরীরী হইল না কেন ? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত ! যদি রূপের শরীরে প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন ? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না ? আমার শরীরে এত স্থান আছে—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না ? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না ? হায় ! তুমি মণি নও, মাণিক নও যে, হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি ! তুমিই বা কেন মণি মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না ! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিসরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি !

"আমায় নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ !"

প্রথমে আহ্বান, "এসো এসো বঁধু এসো," পরে আদর, "আধ আঁচরে বসো," পরে ভোগ, "নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" তখন সুখভোগকালীন পূর্ব্বদুঃখস্মৃতি—"অনেক দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি।" সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,

"মণি নও মাণিক নও যে, হার ক'রে গলে পরি।"

পরে সম্পূর্ণ সুখ,

"আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।"

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য্য। এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব ? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব ; এ সুখ এক স্থানে ধরে না ; যেখানে যেখানে

পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পূরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই! সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি।—আর কাতরোক্তি, কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণসুখে সুখীও সুখকালে পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখও দুঃখময়—

"তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।"

এই কথা সুখ দুঃখের সীমারেখা! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত—গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে, সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনই দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে—সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে,

সেই মাতা কোথায় ? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায় ? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায় ? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্য্য-শালিনী কোথায় ? তুমি যাঁহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পভরণা কোথায় ? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল কল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল ; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল ; নগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল ; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল ; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না ; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল ; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল ; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল ; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন ?

ত্রয়োদশ সংখ্যা

বিড়াল

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও !"

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জারসুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি, সে "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি, বিড়ালের মনের ভাব—"তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জ্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু

অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার, আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে,

মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, "মেও! মেও! খাইতে পাই না!—" আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী; কেন না, আফিংখোর; তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে খাইয়া তাহার যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক্! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন,

তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরামবাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব!"

মার্জ্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্দ্দশ সংখ্যা

ঢেঁকি

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? না, লাঙ্গুলকর্ণদুল্যমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম না—নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস্ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আর্য্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—ঢেঁকি আছে—ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকার-নিরত ঢেঁকিকে আর্য্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্য্যসাহিত্য, আর্য্য-দর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না—রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে

চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়,—কোথায় না ঢেঁকি আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী, নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে, কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ উনবিংশ শতাব্দী, বৈজ্ঞানিক সময়—অবশ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্য্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! এই Public spirit? নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ?—বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহুর্মুহুঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এতটা Public spirit? ভাবিলাম—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন—কিন্তু কই, তাঁহার ত কিছু মাত্র Public spirit নাই। শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছু দেখি না। আরও—মনের কথা লুকাইলে কি হইবে? আমিও—আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী স্বয়ং, এক দিন খানায় পড়িয়াছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকারবিশেষের সেবনে আমার সেই গর্ত্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন গোয়ালিনী—গোপাঙ্গনাকুল-কলঙ্কিনী,—এক দিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, ঊর্দ্ধপুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল, তা বলিতে পারি না,—স্ত্রীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়মান! পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোঘ্নী রাক্ষসী! আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে ওচট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে—বিবরলোক প্রাপ্তি! "আলু থালু কেশ পাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"—হায়! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশ মধ্যে Public spirit রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল, এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশূন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধনিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এত দূর প্রবল হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম,

"অয়ি দধিদুগ্ধক্ষীরনবনীত-পরিবেষ্টিতা গোপকন্যে! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভুসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোয়া হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে,—কাহাকেও গুঁতাইও না।" প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায় সে দিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য 'সাধারণ আত্মা" অর্থাৎ Public spirit, বিশেষতঃ কার্য্যদক্ষতা, এ সকল খানায় পড়িলে হয় কি না? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ কার্য্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্দিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখনও দেখ নাই?"

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী মাতঙ্গিনী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতী দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখানি রাঙ্গা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই! দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল—কার্য্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্য্য-কিরণে প্রভাসিত হইল। ঐ ত ঢেঁকির বল!—ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ!—ঐ রমণীপাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া—ঢক ঢক কচ কচ্! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ। পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছে! এস, মেয়েমানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায় —হায়! কি করিব?—কাসার মল পরাই!

আর ভাই, ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্ত্তে শুঁড় লুকাইয়া, লেজ উঁচু করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে "ধান্য"; পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা! আবার শুনিতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি?—ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে, অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেচর করিয়া ধান ভান? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার!

ঢেঁকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি? ৺ননীবাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারি-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ঘরখানির এমনি অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি—কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে—সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপাইর উপর পড়িয়া আফিঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখ-রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন—আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত—ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকৃৎ; তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন—অনাহার। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি—সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক!

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম—আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি—কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি; নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল—এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল—এ চাউল মনুষ্য-লোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—"অশ্বমনোরথে।" স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি কি—পুরস্কার চাই কি?"

আমি। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা।

দেবরাজ। উর্ব্বশী মেনকা পাইবে না—আর যাহা চাহিলে, তাহা ত মর্ত্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক,—আটটার হিসাবে।

আমি দুর্ম্মুখ—বলিলাম, "কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা! সে কি আজকাল নরলোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।"

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বকৃশিশ হুকুম করিলেন,—এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ব্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দুগ্ধ,—আর প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—"নেশাখোর!" "বিট্‌লে!" "পেটার্থী!" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্ব্বশীকে বলিলাম, "বাইজি! এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর।"

কমলাকান্তের পত্র

প্রথম সংখ্যা

কি লিখিব ?

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী৺ নসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোশ্‌নবীস জুয়াচোর লোক, আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম; তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি, ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এত দিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটি যোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলের ব্যবহার্য্য পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ! সার্থক তাহার নিশীথ-তৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধু জনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, "বঙ্গদর্শন।" ভিতরে লেখা আছে, "কমলাকান্তের দপ্তর।" তখন বুঝিলাম যে, আমারি এ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল!

আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। এক জন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মহাশয়, বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।" আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা

---

* "কমলাকান্তের দপ্তর" বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন এই পত্রগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, তখন সঞ্জীববাবু ইহার সম্পাদক।

অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল। অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয়, তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম ; শব্দটি "বঙ্গদর্শন," অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আমি তাঁহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "ইহার অর্থ পূর্ব্ব বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি ;" অর্থাৎ "A Guide to Eastern Bengal." এইরূপ বহু প্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্দ্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজপ্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে !

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয় ! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছু দিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন, "শ্রীশ্রী৺নসিধাম" লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসিবাবু শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন ! ভরসা করি যে, তিনি সর্ব্বাশ্রয় শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন্ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই ! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন ? আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোশনবীস মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না ; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিঙ্গ পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক ! আপনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না।

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা আছে। এ কমলাকান্তি কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়— আপনার চাই কি ? নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার ? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব ? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, না ভৌগোলিকতত্ত্ব রসে আপনি সুরসিক ? স্থূল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব ? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন ? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশ্যন ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ ? যদি কোটেশ্যন বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশ্যন সংগ্রহ করা হইয়াছে—আফ্রিকা ও

আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশ্যন, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।

যদি গুরু বিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোশনবীস মহাশয়ের পুত্র যিনি ইউটিলিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,* তাঁহাকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরু বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বহি চাই কি ? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্য্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ম্যাচরল্ হিষ্টরির একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন ; পুরাতন পেনি মেগেজিন্ হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডস্মিথ কৃত এনিমেটেড্ নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি ? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কথা কি বলিব ? তিনি চিতোরের রাজা আল্‌ফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবন-চরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচন-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও হর্বট স্পেন্‌সরের মত খণ্ডন আছে ; এবং ডারুইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি, গুরু বিষয় ছাড়িয়া লঘু বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোশনবীসপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে ; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা, কি শশিরম্ভা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরম্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি না হতোঽগ্নি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য "নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি-মারা

* ইউ—টিল—ইটি—আই।

সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন ; এবং আমি শপথপূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা "হা, সখি!" এবং তেরটা "কি হলো! কি হলো!" সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গায়িতেছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোশনবীস কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইক্‌সোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে।

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না—আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোশনবীসের ছানা, জীমূতনাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—দুই চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই?

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোশনবিসী রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকান্তি ঢঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব! ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব—এক তিল ছাড়িব না!

আপনি কি রাজি? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি।

দ্বিতীয় সংখ্যা

পলিটিক্‌স্

শ্রীচরণেষু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কি জন্য হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিক্‌স্ কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিক্‌স্ ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্‌স্ সবজেক্টরূপী আমা ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্‌স্ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ্গ

ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা, না খোসামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোসামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, পলিটিক্স্ লিখি। ধিক্ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্ আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি আজিও বুঝিতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যন নহে।

আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি! ভরিটাক্ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী—বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্ত-মিশ্রিত খলি-মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে ত পলিটিক্স্ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্স্-বিকার-শূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে— দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্ন চিত্তে লোকের এই পলিটিক্স্প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে
ইচ্ছা বটে ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স্— হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স্; কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্স্ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর প্রৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর

তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে কুকুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, এক বার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল।

তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্‌স্,—এই কুক্কুর ত পলিটিশ্যন! তখন মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক—কুক্কুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকেল এজিটেশ্যন সফল হইল;—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপন মনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুক্কুর পানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটি bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যন, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর এক বার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেল উল্‌সি বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন, কুক্কুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাগ রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যত ক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর আপন উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, তত ক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাব্না খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া. মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগারে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্স্। দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম—এক কুক্কুর-জাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন—আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দলের পলিটিশ্যন।

তৃতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব

মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি—লিখিবার অনেক অনেক শত্রু। আমি এখন যে কুঁড়ে ঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই—এই ফুলগুলি আমার সখা সখী হইবে। খোসামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না—টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে—কান্না নাই; আমোদ আছে—রাগ নাই। মনে করিলাম, যদি প্রসন্ন গোয়ালিনী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল। মনে করিলাম—মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,—লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোল্‌তা মৌমাছি—বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যন, লীগ,

সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন—আমি কোন রিজলিউশ্যনই দ্বিতীয়িত করিতে প্রস্তুত নহি; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুন্ গুনের দল, তাহাতে কোন মতে সম্মত নহে—বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—(আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে)—এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো আসল বৃন্দাবনী কালাচাঁদ, ভোঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি, মহাশয়?

ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড় সুরসিক—বড় সদ্বক্তা—তাঁহার ঘ্যান্-ঘ্যানানিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া আমারই কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল; আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগতিতে তালবৃন্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—দপ্তর-মুক্তাবলীর প্রণেতা, কিন্তু হায়, মনুষ্যবীর্য্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষ আপন অসারতা প্রমাণীকৃত কর! তুমি জামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটর্লুর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে, এবং আজি এই ভ্রমরসমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে! আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বায়ু সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম, ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বেড়িয়া চোঁ বোঁ করিতে লাগিল। কখনও সে আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ন্যায় রণ করিতে লাগিল, কখনও কুম্ভকর্ণনিপাতী রামসৈন্যের ন্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; কখনও স্যাম্পসনের ন্যায় শিরোরুহমধ্যে আমার বীর্য্য সংগুপ্ত মনে করিয়া আমার শরন্নীরদ-নিন্দিত কুঞ্চিত শ্বেতকৃষ্ণ কেশদামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া রণে ভঙ্গ দিলাম। ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাধিয়া কমলাকান্ত—"পপাত ধরণীতলে!!!" এই সংগ্রামসমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—যিনি দারিদ্র্য, চিরকৌমার এবং অহিফেন প্রভৃতির দ্বারাও কখনও পরাজিত হয়েন নাই—হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "হে দ্বিরেফসত্তম! কোন্ অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার লেখা পড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ? দেখ, আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি—পত্র লিখিলে আফিঙ্গ আসিবে—তুমি কেন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া তাহার বিঘ্ন কর?" আমি প্রাতে

একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম—তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম—"হে ভৃঙ্গ! হে অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গবিক্ষেপকারিন্! হে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডভণ্ডচিত্তলণ্ডভণ্ডকারিন্! হে উদ্যানবিহারিন্—কেন তুমি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছ? হে ভৃঙ্গ! হে দ্বিরেফ! হে ষট্পদ! হে অলে! হে ভ্রমর! হে ভোমরা! হে ভোঁ ভোঁ!—"

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন গুন্ গুন্ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল—আমি অহিফেনপ্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।

ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্র! আমার উপর এত চোট কেন? আমি কি একাই ঘ্যান্-ঘেনে! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালি হইয়া কে ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙ্গালির ঘ্যান্ ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে। তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেল্‌ভিডিয়রে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি হইবেন উমেদ রাখেন, তিনি গিয়া রাত্রিদিবা রাজদ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন। যিনি কেবল একটি চাকরির উমেদওয়ার তাঁর ঘ্যান্ ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাবু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজী বোল শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পরিণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্—ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বস্‌বার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে, প্রাতে, অপরাহ্ণে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—ঘ্যান্ ঘ্যান ঘ্যান্! যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া উকীল হইলেন, তিনি আবার সনদী ঘ্যান্ ঘেনে। সত্যমিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন, কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারি জুজু বসিয়া আছে—বড় জজ ছোট জজ, সবজজ, ডেপুটি, মুন্সেফ—সেইখানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান্‌ঘেনে, ঘ্যান্ ঘ্যানানির ফোয়ারা খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্ ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে থাকেন। কোন্ দেশে বৃষ্টি হয় নাই—এসো বাপু, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি; বড় চাকরি পাই না—এসো বাপু, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি—রামকান্তের মা মরিয়াছে—এসো বাপু, স্মরণার্থ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না—তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন; আর তুমি যে বাপু, আমার ঘ্যান্ ঘ্যানানিতে এত রাগ করিতেছ, তুমি ও কি করিতে বসিয়াছ? বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের কাছে কিছু আফিঙ্গের যোগাড় করিবে বলিয়া ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে বসিয়াছ। আমার চোঁ বোঁই কি এত কটু?

"তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যান্ ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্ ঘ্যান্ করি না—মধু সংগ্রহ করি

আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে—কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্ত্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল! সে যাক, মধু কর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ, রসনাকণ্ডূয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না—জিবে কাংকি দিয়া ঘা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান্ ঘ্যান্ ভাল লাগে না।”

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। শুনা আছে, মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু—পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইয়াছে—তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। এই ষট্‌পদের—একখানি না, দুখানি না—ছয় ছয়খানি পা! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে—ইহার অসামান্য পদবৃদ্ধি দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি প্রকারে? অতএব আপাততঃ ঘ্যান্ ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধুসংগ্রহের আশাটা রহিল। বঙ্গদর্শন পুষ্প হইতে অহিফেন মধু সংগ্রহ হইবে, এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে—

আপনার আজ্ঞাবহ

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্থ সংখ্যা

বুড়া বয়সের কথা

সম্পাদক মহাশয়! আফিঙ্গ পৌঁছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিস্ফারিত লোচনে লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেন প্রসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব।

বুড়া বয়সের কথা লিখিব। লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,—আপনার মর্ম্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে যুবা, কেবল সেই পড়ে; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না।

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও আমার পায়ের

কাড় সংগ্রহ করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আমার আর দাবি দাওয়া নাই; মিয়াদি পাট্টার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে মিয়াদ অতীত হইল, কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জন্য কিছু পীড়াপীড়ি আছে; যৌবনের আখিরি করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি এমত সাধ্য নাই। তার উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি এক বার শুনিবে না?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম—যাঁরই ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি, হয় ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয় ত আজিও দন্তসকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার মত উজ্জ্বল, হয় ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও তাহা ভাঙ্গিতে পারে না;—তথাপি, হয় ত আপনি প্রাচীন। নয় ত, আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে, ইহার অর্থ, "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যম-ভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বড়াই ভালবাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।

কিন্তু এই অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চসমাখানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে, আমি বুড়া হইয়াছি কি না! বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে মনে ভরসা আছে একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই এক গাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চিরপ্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্য মাখা, হীরা বসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও

আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ আজিও তেমনি অপর্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চস্‌মা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া, এ দেহপুর প্রবেশ করিতেছি—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছে। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি, ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই? কই—দূর হউক, যাহা নাই, তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডলসকল ভালবাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্নমন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়। সে সরল, সে ভালবাসাপরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্দ্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না আচ্ছা—রোখশোধ। পৃথিবী! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্ত্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাতে, হে মৃণ্ময়ি জড়পিণ্ডগৌরব-পীড়িতে বসুন্ধরে! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্ত কাল, শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্ত্তব্য কি? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ?" এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা। আবার বন কোথা? এ বয়সে, এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণীসমাকুলা নগরীই বন। কেন না, হে বর্ষীয়ান্ পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদ্‌কালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, "বুড়া! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—" কিন্তু,

সম্পদ্‌কালে কেহই বলিবে না, "বুড়া! আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!" বরং আমোদ আহ্লাদ কালে বলিবে, "দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে বয়ঃক্রম বয়ঃপ্রাপ্ত, কর্কশকান্তি, হয় ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে. হয় ত, তোমারই দ্বেষক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, "ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।" তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহারই স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সে তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে,– বাছিয়া বাছিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাষ,—হারাধন পোদ গামছা কাঁধে, মোটা মোটা বলদ লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পূরাইয়া, যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া ইহ-জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয় ত দেখিবে. সে গৃহের ইষ্ট সকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীর মা পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি? সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয় বন্ধু দাম্‌ মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, "দাম্‌ মিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাম্‌ মিত্র শুষ্ককণ্ঠ, পলিতকেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম্ম, শীর্ণকায়। দামুর একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দাম্‌ নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি?

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান-বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে করিতে চাল ঝাড়িতেছে —মলিনবসনা, বিকটদশনা, তীব্ররসনা —দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম্ম, পলিতকেশ, শুষ্ক-বাহু, কর্কশ-কণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী—আর অরণ্যের বাকি কি?

তবে স্থির, বনে যাওয়া হবে না। তবে কি করিব? হিন্দুশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া কালিদাসও সর্ব্বগুণবান্ রঘুগণের বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি— কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম অজবিলাপে,

> "ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
> তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
> নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
> বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্॥"*

এটি যৌবনের কান্না।

তার পর রতিবিলাপে,

> "গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
> অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্॥"†

এটি বুড়া বয়সের কান্না।—

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলেও কখনও বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, মোল্‌ট্‌কে ও ফ্রেডেরিক বুড়া; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে— জর্ম্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিস্রেলি বুড়া—তাঁহারা

* বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে—অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর-গুঞ্জন-রহিত একটি পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

† তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লিমেণ্টের রিফর্ম এবং আয়রিশ্ চর্চ্চের ডিসেষ্টাব্লিষমেণ্ট কোথা থাকিত ?

প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার সময়। আমি অন্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না।—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ব, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাসক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহা সতত হীনপ্রভ ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়। এই জন্য, আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভান করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয়চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না ; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়-চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়াম্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য ; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি ? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়-কার্য্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে ?—পরকালের কাজ করিব কবে ? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন ? শৈশবে কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন ? এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে—আবার এ

শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের অন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল, আর আমার দিকে ঘেঁযিবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফ্‌য়রবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার— সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

পঞ্চম সংখ্যা

কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আমার আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আছিস — না আমি সেই আমি আছি। তুই ঘুণে ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে ধরা—আমি ঘুণে ধরা কি কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজ দেখি, হৃদয়! এই জগৎ সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুকুর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে বরং লোকে

হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে ;— এখন হাসিকান্না। ছি !—কেবল লোক হাসান !

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি- কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসী বাবু নাই—অহিফেনের অনাটন— সে প্রসন্ন কোথায় জানি না —তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা— এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন ? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজও কাঁদি ; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি ; যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী— তাহার এত বন্ধন কেন ? এ দেহ পচিয়া উঠিল —ছাই ভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন ? ঘর পুড়িয়া গেল- আগুন নিবে না কেন ? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন ? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন ? ফুল শুকাইয়াছে —এখনও গন্ধ কেন ? সুখ গিয়াছে—আশা কেন ? স্মৃতি কেন ? জীবন কেন ? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন ? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন ? কমলাকান্ত গিয়াছে- - যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন ? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঋ, গ, ম কেন ? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন ? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন ?

তবু কাঁদি। জন্মিবা মাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কমলাকান্তের জোবানবন্দী

খোশনবীস জুনিয়র প্রণীত

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি এক দিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে এক জন কালোকোর্ত্তা কনেষ্টবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয়।

কিছু কাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন এক জন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজ্‌লাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজ্‌লাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি এক জন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পূরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল—"হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এর ভিতর পূরিলে?"

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

এক জন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া…"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরি। শুনতে পাও না—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ কি?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বল্‌তে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের কারমই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল ?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি ?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত ?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন - কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান্ সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষী মহাশয়! Theological Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না ? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে ?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি—যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, "Oh Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না—সুতরাং উকীল বাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও।" তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল।"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! সাক্ষী বড় সেরকশ্।"

উকীল বাবু হাঁকিলেন, "Very obstructive."

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি— ভিতরেও চলিবে কি?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয়, তাহা না দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও— গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরি তখন বলিল, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদ্মায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না।' ধর্ম্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়! পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীল বাবু অধিকারী— আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব।" উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, "হুজুর! এ সব Contempt of Court." হুজুর, উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, "আপনারই সাক্ষী।" সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, "বল। বলিতে হইবে।"

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জাতি?"

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর?"

কমলা। ধর্ম্মাবতার! এই উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

এজ্‌লাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—"

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

কমলা। কেন, এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে?

কমলা। ছিল, যখন নসী বাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তার পর?"

উকীল। তোমার পেশা কি?

কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পূরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে?

কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল; বলিল, "এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জ্জন কর! ও কি বল্‌বে?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, "লিখুন, পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি

মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।"

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল, "সে কি ঠাকুর! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই?"

কমলা। দূর মাগি ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আফিঙ্গ কি পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখিব, কমলাকান্ত?"

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন?"

কমলা। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, "সে কি, ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বল্‌তেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালীর দুধ; যখনই দেখ্‌তে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিকে, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি। দুধ দই চিনি নে?"

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, "আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না?"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?"

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, "বুঝা গেল; তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে?

কমলা। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরুচুরির কি জান?

কমলা। গোরুচুরি আমার বাপ দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন?—আমার দুধ দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ-- বলি গোরুচুরি দেখিয়াছ?

কমলা। এক দিন দেখিয়াছিলাম। নসীবাবুর একটা বকনা- এক বেটা মুচি---

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরি করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামন সে সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।"

উকীল মহাশয় তখন কূল পাইলেন। গর্জ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন?"

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, "আহা, চিনি বই কি---নহিলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে– বলিলেন, "ও সব রাখ।" প্রসন্ন গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটি বাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটি চেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি, ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গোরুটি কি? একটি বই ত সাম্‌নে নাই?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন, একটি—আমি দেখিতেছি, অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা?"

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ শামলাও চুরির না কি?"

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি ?

হাকিম। কেন ?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি ?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্য, ধর্ম্মাবতার ?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না ?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন ?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে ? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না ?"

হাকিম তখন এক জন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন ?"

কমলা। সিংওয়ালা গোরু—তাই বলুন।

উকীল। তুমি বল কি ?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়ালা—তা যাক্—আমি ও সিংওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু ?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার!

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল! উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিট্‌লে! গোরু তোমার!"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি—ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস্ ব'লে কি তোর বাবার গোরু হলো!"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, witness hostile! permission দিন, আমি ওকে cross করি।"

কমলা। কি? আমায় cross করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনূমান্ তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাগে গর্ গর্ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটরায় পূরিল। তখন কমলাকান্ত আলুথালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—বলিল, "কর বাবা ক্রস্ কর!—আমি অগাধ সমুদ্র পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা সে লম্ফ দাও—'অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং!'—উকীল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন।"

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল; ইহাকে আর ক্রস্ করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাত যোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উঁহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?"

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটী—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে।

কমলা। দে!

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তার পর সে হবে।

কমলা। তবে জল্‌দি জল্‌দি বল—জল্‌দি জল্‌দি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার?

কমলা। গোরু তিন জনের; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্য বয়সে স্ত্রীজাতির; শেষবয়সে উত্তরাধিকারীর; দড়ি চিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা গাই কার?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না?

কমলা। তুই বেটী কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মরলি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোরুচোরকে ছেড়ে দে—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে আদালত মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?"

কমলা। আজ্ঞা, হাঁ।

"উহার গোহালে এই গোরু থাকে?"

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

"ঐ খাওয়ায়?

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে?"

আসামীর উকীল বলিলেন, "আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্ করিব।"

কমলা। এক জন ত ক্রস্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস করিলেন, পবনাঙ্গজ মহাশয়। তার পর ক্রস্ করিলেন কুমার বাহাদুর।*

---

* অঙ্গদ

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ - কিসে চেন ?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায় !

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তোমার পাগলামি রাখ —তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে ?"

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopless !" উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন—আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেঁড় কেন, বাবা ?"

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত খেলো হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া আছে—চারি দিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে. "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোলমউনির দিব্য, তোর ফাঁদি-নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্ !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয় ! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন ?"

কমলাকান্ত বলিল, "পূর্ব্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, 'বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।'* এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা। সেকন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একটা right নয় ? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে ! তুমি আইনমতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম. মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোশনবীস জুনিয়র।

---

* শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ অধ্যায়।

বিভিন্ন সংস্করণে 'কমলাকান্তে'র পাঠভেদ

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ (১৬২ পৃষ্ঠা) ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামে "কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয়। আখ্যা-পত্রে "বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত" ও "প্রথম খণ্ড" ইহাও লিখিত ছিল। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র "বিজ্ঞাপন" দেখিলে ইহার কারণ বুঝা যাইবে।

'কমলাকান্তের দপ্তরে' শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীসের ভূমিকা সহ নিম্নলিখিত "সংখ্যা"গুলি ছিল—১ম সংখ্যা, একা। "কে গায় ওই"; ২য় সংখ্যা, মনুষ্য ফল; ৩য় সংখ্যা, ইউটিলিটি বা দর্শন দ্বয়; ৪র্থ সংখ্যা, পতঙ্গ; ৫ম সংখ্যা, আমার মন; ৬ষ্ঠ সংখ্যা ভিন্ন লেখক প্রণীত বলিয়া পরিত্যক্ত; ৭ম সংখ্যা, বসন্তের কোকিল; ৮ম সংখ্যাও অন্যের লেখা বলিয়া পরিত্যক্ত; ৯ম সংখ্যা, বিবাহ; ১০ম সংখ্যা, বড়বাজার; ১১শ সংখ্যা, আমার দুর্গোৎসব; ১২শ সংখ্যা, একটি গীত; ১৩শ সংখ্যা, বিড়াল।

'কমলাকান্ত' নামে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (২৫০ পৃষ্ঠা) ১২৯২ বঙ্গাব্দে (সেপ্টেম্বর ১৮৮৫) প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছাড়া ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" নামক দুইটি নূতন অংশ যোজিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'ও "চন্দ্রালোকে" (অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত) এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত) নামক পরিত্যক্ত দুইটি প্রবন্ধ যুক্ত হয়।

'কমলাকান্তে'র দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮১ পৃষ্ঠা) ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "ঢেঁকি" প্রবন্ধটি "কমলাকান্তের দপ্তর" অংশের ১৪শ সংখ্যা হিসাবে এই সংস্করণে যুক্ত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'কমলাকান্তে'র আর কোন সংস্করণ হয় নাই।

'কমলাকান্তে'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে পার্থক্য সামান্য; প্রথম সংস্করণে দপ্তরাংশের কিছু কিছু পরিত্যক্ত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। আমরা দপ্তরাংশের প্রথম ও শেষ সংস্করণের এবং পরবর্ত্তী অংশের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

'কমলাকান্তে'র যাবতীয় নিবন্ধই 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

কমলাকান্তের দপ্তর

পৃ. ১।৶০, ১৫ পংক্তির পর ছিল—

অলঙ্কার স্বরূপ সাহেবের একটি লাঙ্গুল আঁকিয়া দিয়াছিল—এবং হস্তে একটি বর্ত্তমান রম্ভা দেখা যাইতেছিল।

পৃ. ২, ৩ পংক্তির 'খাইয়া ফেলে।' কথাগুলির পর প্রথম সংস্করণে তারকা-চিহ্ন (*) ছিল, ও ইহার পাদটীকায় ছিল—

* পাকের রীতি সধবার একাদশীতে সবিস্তারে লিখিত আছে।

পৃ. ৪, ১৮–১৯ পংক্তি 'পাকিলে সুমিষ্ট…টক যায় না।' স্থলে ছিল—

পাকিলে বড় সুমিষ্ট। কে বলিবে যে লরেন্স, রিকেট্‌স্, ক্রিমর, গ্রাণ্ট, ডাম্পিয়র, ফলের মধ্যে সুমিষ্ট ফল নহে? তবে,

পৃ ৪, ২১ পংক্তি 'পাকিলে পান্‌শে।' স্থলে ছিল—

ভরসা করি পাকিলেও মিষ্ট থাকিবে।

পৃ. ৪, ২২ পংক্তি 'সেগুলি কুটিয়া…ভাল।' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

ব্যাপারীর বড় দরকার— অমুক বাড়ীতে পাঁচ শত ফজরির প্রয়োজন· গাছপাকা আম নাই—কাঁচা ভাঙ্গিয়া জাঁতে পাকাইয়া দিল। লোকে "ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স্" পড়িয়া—বিষ্ণু—আমের চাকলা খাইয়া ধন্য২ করিতে লাগিল।

আম্র, ব্রাহ্মণভোজনে লাগে বটে, কিন্তু সকল পাতে সমান পড়ে না। অমুক জেলায় ব্রাহ্মণেরা হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে, ওদিকে টক আম পড়িয়াছে। যে দিকে ভাল আম পড়িয়াছে—সে দিকে বড় হুস হাস্ শব্দ শুনিতেছি—কর্ম্মকর্ত্তা ক্ষীরে কুলাইতে পারেন না।

পৃ. ৫, ১০ পংক্তির 'কিন্তু দুই' কথাগুলির পর 'জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্য-জাতীয়,' অংশটি ছিল না।

পৃ. ৬, ১১ পংক্তির 'জেন্ অষ্টেন্'-এর পর 'বা জর্জ্জ এলিয়ট' কথাগুলি সংযোজিত হইয়াছে।

পৃ. ৮, ১৬ পংক্তি 'টক' শব্দটি ছিল না।

পৃ. ৮, তৃতীয় সংখ্যার নাম 'ইউটিলিটি বা দর্শন দ্বয়।' ছিল; এবং '১। হিতবাদ দর্শন' দিয়া আরম্ভ হইয়াছিল।

পৃ. ৮, ২০ পংক্তির পর নিম্নলিখিত অংশটি ছিল—

বলিতে কি, এখনকার ইউরোপের চিন্তাপ্রণালী, অর্দ্ধেক বেন্থাম অর্দ্ধেক কোম্‌তের মতানুসারিণী। চিত্তমধ্যে এই দুই মতের সমুচিত সামঞ্জস্যই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা।

বেন্থামের পর, ডুমন, মিল, অষ্টিন প্রভৃতি তাঁহার মতের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ঐ মতই এক্ষণে মান্য এবং গ্রাহ্য। যাঁহারা ইহা মানেন না, হিতবাদীরা বলেন, তাঁহারা হিতবাদ দর্শন সম্যক্ বুঝিতে পারেন না।

এই মতের সার কথা এই যে, যাহা হিতকর, তাহাই অনুষ্ঠেয় ও কর্ত্তব্য। যাহা অহিতকর তাহা বর্জ্জনীয় এবং অকর্ত্তব্য। হিতাহিত ফলোৎপাদকতা ভিন্ন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের—অর্থাৎ পুণ্য পাপের—অন্ত লক্ষণ নাই।

এই সকল দার্শনিকেরা কখন বঙ্গদেশে আইসেন নাই—আসিলে তাঁহাদের প্রণীত হিতবাদ শাস্ত্র এরূপ অসম্পূর্ণ থাকিত না। বাঙ্গালির মত হিতবাদী পৃথিবীতে আর কোন জাতি নাই। এ শাস্ত্র বাঙ্গালির নিকট কার্য্যে পরিণত। যাহাতে হিত বা উপকার নাই, এমত কার্য্য আমরা কখন করি না, বা করিতে সম্মত হই না।

ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের সঙ্গে বাঙ্গালি হিতবাদীদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে—কিন্তু কয়েকটি প্রধান বিষয়ে অনৈক্য আছে। সেই অনৈক্য স্থূল সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রথম, ইউরোপীয়েরা বাঙ্গালির ন্যায় বলিয়া থাকেন, যাহা হিতকর তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা আরও বলেন, যে এই হিত অর্থে জগতের হিত বুঝিতে হইবে। আমরা বলি হিত অর্থে আপনার হিত বুঝিতে হইবে। যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই পুণ্য, যাহাতে নিজের অহিত তাহাই পাপ।

দ্বিতীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, এই "হিত" অর্থে যাহা আশু হিতকর, তাহা বুঝায় না, যাহা চরমে হিতকর তাহাই বুঝিতে হইবে। শুভাশুভ ফলানুসন্ধানে, অনন্তকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুণ্য পাপ নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। আমরা বলি তাহা নহে; আমি যত দিন বাঁচিব, কেবল ততদিনের মধ্যে যাহা ঘটিতে পারে তাহাই আমার আলোচ্য। আমি মরিয়া গেলে হিতাহিতের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

আমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, যে আমি যতদিন বাঁচিব ততদিনের কথাই বা কেন ভাবিব? দেখিতেছি, একটী কর্ম্ম করিলে, অদ্য সুখী হইব, এক বৎসর পরে তন্নিবন্ধন অসুখী হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক বৎসর আমি বাঁচিব কি না, তাহা কে বলিতে পারে? অদ্যকার সুখ নিশ্চিত, ভাবী দুঃখ অনিশ্চিত। অতএব যাহাতে আশু সুখ তাহাই হিতকর, এবং কর্ত্তব্য।

তৃতীয়, ইউরোপীয়েরা বলেন, যে কোন কার্য্যের জগদ্ব্যাপী এবং অনন্তকাল স্থায়ী ফলাফল সচরাচর লোকে আপন বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারে না; অতএব, কার্য্যের ফলাফল বিজ্ঞেরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য। বাঙ্গালি বলেন, বিজ্ঞ, আমি এবং আমার পূর্ব্বপুরুষেরা। আমাদের তুল্য বিজ্ঞ কে? অতএব আমার নিজের মত এবং স্বর্গীয় মহাশয়দিগের মত ভিন্ন আর কোন মত গ্রাহ্য করিব না। কেবল দুইটী বিষয়ে পূর্ব্বপুরুষদিগের মত অগ্রাহ্য—আহারে, এবং পরিচ্ছদে। বুট পেণ্টলন পরিব, মদ্য মাংস খাইব। আর যদি ইংরাজি না শিখিয়া একটু ইংরাজি ছড়াইতে পারি তাহা ছড়াইব। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের মতেই চলিব।

পৃ. ৯, ৮ পংক্তির পর ছিল—

২। উদর দর্শন।

পৃ. ৯, ২৪-২৫ পংক্তি দুইটির স্থলে নিম্নলিখিত অংশ ছিল—

"আধ্যাত্মিক"—ঋষি প্রভৃতি অনাহারে বা বায়ু ভক্ষণের দ্বারা যে উদর পূর্ত্তি করেন, তাহাকে

আধ্যাত্মিক পূর্ত্তি বলা যায়। অথবা, যাঁহারা দাতার বাক্যে লুব্ধ হইয়া, আশায় বদ্ধ হইয়া, কালযাপন করেন, তাঁহাদিগেরও আধ্যাত্মিক উদরপূর্ত্তি হয়।

পৃ. ১২, ২৩ পংক্তি, 'বিধিলিপি!' কথাটির পূর্ব্বে 'নাচার!' কথাটি ছিল।

পৃ. ১৬, ৮ পংক্তির পর ছিল—

দেখিলাম, সূপকার, মাথায় গামছা বাঁধিয়া পাক করিতেছেন—তাঁহাকে যুক্তকরে বলিলাম, "হে প্রভো! এই যে আকা, উনান, বা চুলার শ্রেণী, ইহাই তোমার যমুনা, এতন্মধ্যস্থ তরঙ্গোৎক্ষেপী অগ্নি, সেই যমুনার গদ্গদনাদী বারিরাশি; তুমিই কলিকালে শ্রীনন্দনন্দন; এই হাঁড়ির শোঁ শোঁ শব্দ তোমার বংশীরব; আর তোমার যে মাথায় গামছা বাঁধা উহা চূড়ার টালনি; তোমার হাতে যে ভাতের কাটি, ঐ পাচন বাড়ি; তুমি অনেক গোরু রক্ষা কর, অতএব হে রাখালরাজ! ভক্তকে সদয় হইয়া বল, আমার মন কোথা? তুমি কি চুরি করিয়াছ?" রাখালরাজ বলিলেন, "আমি তোমার মনোহরণ করি নাই, দেখ আমার খিচুড়ির হাঁড়ি আঁকিয়া গিয়াছে।"

পৃ. ১৬, ৯-১০ পংক্তির 'প্রসন্নের সঙ্গে…গব্যরসাত্মক।' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—

প্রসন্ন সম্বন্ধে আমার একটু নিন্দা ছিল বটে, কিন্তু সত্য বলিতেছি যে তাহার সঙ্গে আমার কোন দূষ্য প্রণয় ছিল না।

পৃ. ২১, 'ষষ্ঠ সংখ্যা'টি ছিল না; 'সপ্তম সংখ্যা' * তারকা-চিহ্নিত ছিল ও পাদটীকায় ছিল—

* ষষ্ঠ সংখ্যা ভিন্ন লেখক প্রণীত—এজন্য পরিত্যক্ত হইল।

পৃ. ২৯, ২২ পংক্তির 'দুলালি' স্থলে 'নন্দদুলালি' কথাটি ছিল।

পৃ. ২৯, ২৭ পংক্তির 'ছেঁড়া' কথাটির পর 'ইংরেজি, যশুরে' কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৩০, ১৫ পংক্তির 'উচ্চ ডালে' কথা দুইটির পূর্ব্বে 'সম্বাদপত্রের ন্যায়' ছিল।

পৃ. ৩১, ৭ পংক্তির 'বাজে নবেল' স্থলে "Juventus Mundi" ছিল।

পৃ. ৩১, ২০-২১ পংক্তির 'ঋষভ-স্বর' স্থলে 'ষড়্জধ্বনি' ছিল।

পৃ. ৩১, ২৬ পংক্তির পর ছিল—

তবে যদি কেহ কস্মে বউয়ের লাতি খাইয়া থাকেন, তিনি বলিলে বলিতে পারেন, পায়ের পঞ্চম ভর্ত্তার মাথা পর্য্যন্ত উঠিলেও মিষ্ট।

পৃ. ৩৮, নবম সংখ্যার নাম 'ফুলের বিবাহ' স্থলে 'বিবাহ' ছিল।

পৃ. ৪৩, ১৭ পংক্তির 'বাড়িতেছে, তত' কথা কয়টির পর ছিল—
কলগা ফুলাইয়া, হাঁ করিয়া,

পৃ. ৪৬, ১৩ পংক্তির 'আর কতকগুলি মনুষ্য' কথা কয়টির স্থলে ছিল—
দেবর্ষি তুল্য জ্যোতির্ম্ময় মনুষ্যগণ

পৃ. ৪৬, ১৫, পংক্তির 'এবং অবলাগণ' কথা দুইটি ছিল না।

পৃ. ৪৭, ৭ পংক্তির 'তার পরে যশের' কথা কয়টির পর ছিল—
বাজারে গেলাম—দেখিলাম সে

পৃ. ৪৮, ২১ পংক্তির 'উঠিতেছে।' কথাটির পর ছিল—
দিগন্ত আলো করিতেছে—আবার নিবিতেছে।

পৃ. ৫২, ১২ পংক্তির * তারকা চিহ্ন, ও পাদটীকা ছিল না।

পৃ. ৫৪, ১-৩ পংক্তি, 'যে কারিগর···তোমায় দেখি।' এই অংশের পরিবর্ত্তে ছিল—
কোন কারিগর অভিসন্ধি করিয়া এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন স্বজন করিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না; কিন্তু যদি কারিগরের কারিগরি থাকে, তবে কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

পৃ. ৫৬, ২৭ পংক্তির 'বাঙ্গালা জয়' কথা দুইটির স্থলে 'বঙ্গাধিকার' কথাটি ছিল।

পৃ. ৫৬, ৩০ পংক্তির 'রাজলক্ষ্মী' স্থলে 'বঙ্গলক্ষ্মী' ছিল।

পৃ. ৫৭, ২২ পংক্তির 'দেশলক্ষ্মী' স্থলে 'বঙ্গলক্ষ্মী' ছিল।

পৃ. ৫৭, ২২ পংক্তির পর ছিল—

যখন রন্ধনশালাতে যাই,
তুয়া বঁধু গুণ গাই,
কাযোর ছলনা করি কাঁদি।

পৃ. ৬০, ৩ পংক্তির 'ভার্য্যার সহোদর' কথা দুইটির পর ছিল—
বংশজের নিকট কুলীন জামাতা,

পৃ. ৬১, ১৮ পংক্তির 'কমলাকান্তের' স্থলে 'কমলাকান্ত পাজির' কথা দুইটি ছিল।

পৃ. ৬৭, পাদটীকায় নিম্নোক্ত অংশ ছিল না—
যখন এই পত্রগুলি···সঞ্জীববাবু ইহার সম্পাদক।

পৃ. ৬৯, ১৮ পংক্তির 'ডারুইন যে বলেন,' কথা কয়টির পর ছিল—
(বলেন কি না, তাহা ঈশ্বর জানেন)

পৃ. ৮০ ৭ পংক্তির 'হিন্দুশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া' এই কথা তিনটির স্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ছিল—

"শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং।
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥"

পৃ. ৮০, ২৩ পংক্তির 'ফ্রেডেরিক' কথাটির পর 'উইলিয়ম' কথাটি ছিল।

পৃ. ৮৩, ৪-৫ পংক্তির 'কোথায় জানি না…কোথায় জানি না' এই কথা কয়টির পরিবর্ত্তে ছিল—
গোয়ালিনী নাই—তাহার সে মঙ্গলা গাভী নাই।

পৃ. ৯৭, ২০ পংক্তি, 'রণজিৎ সিংহ' স্থলে 'নাপোলেওঁ' ছিল।

২০-২১ পংক্তি, 'Right of Conquest…right নয়?' কথা কয়টি ছিল না।

২২-২৩ পংক্তি, 'ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও।' কথা কয়টি ছিল না।

পরিশিষ্ট

কাকাতুয়া।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

মাস পাঁচ ছয় হইল, একদিন প্রাতে স্নানাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ গুড় ছোলা খাইয়া বসিয়া তামাকু টানিতেছি, এমন সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী আসিয়া উপস্থিত। স্ব-বামহস্ত কোমরস্থিত সুধাভাণ্ড জড়াইয়া রহিয়াছে, পোড়া ডান হাতে একটা পাখীর খাঁচা। খাঁচাটা অতি সাবধানে মাটিতে রাখিয়া প্রসন্ন বসিল। রকম দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কত রঙ্গই জান ?

প্রসন্ন উত্তর করিল—কেন, রঙ্গ আবার কি দেখিলে ?

আমি। তোমার সব দুধ দই আমাকে না দিয়া পাঁচজনকে বেচিয়া বেড়াও, এই ত এক রঙ্গ। আবার এতদিনের পর একটা নূতন পাখী কেন ?

প্র। নূতন পুরাতন আবার কি ? আমি ত আর কখন পাখী পুষি নাই।

আ। সে কি প্রসন্ন ? আর কখন পাখী পোষ নাই কি ? আমিই যে তোমার খাঁচার পাখী—তোমার ঐ পরম ভাণ্ডের মধ্যে আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ক্ষীরোদশয্যাশায়ী অনন্ত পুরুষের ন্যায় সদাই যোগমুক্ত। ঐ ক্ষীরাধার ভাণ্ড আমার অনন্তশয্যারূপী খাঁচা। আমি ঐ খাঁচার ক্ষীরশায়ী পক্ষী। তাই বলি, আবার একটা পাখী কেন ?

প্র। দেখিলাম, পাখীটা আর একটা পাখীর বাসায় ঢুকিতে গিয়া ঠোকর খাইয়া মাটিতে পড়িয়া খড়ফড় করিতেছে। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল ; তাই পাখীটাকে খাঁচায় পুরিয়া আনিলাম।

আ। যে পরের বস্তু লইবার জন্য অনধিকার-প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহার জন্য আবার দুঃখ কি ? সে ত ঘোর অত্যাচারী ? পিনালকোডের ৫১১ ধারানুসারে সে ষোল আনা চুরি এবং অনধিকার-প্রবেশের দায়ে দায়ী, তা জানিস্ ?

প্র। অমন কথা বল না ! ওর কিছু নাই বলিয়াই অমন অসাহসের কাজ করিতে গিয়াছিল। আহা ! যার নাই, তাকে যদি লোকে না দেবে ত সে কোথায় যাবে—আমরা মেয়েমানুষ এই ত বুঝি।

প্রসন্নের মুখে দান দাতব্যের কথা বড়ই ভয়াবহ। আমার এককালে ভয় এবং রাগের সঞ্চার হইল। গরম হইয়া বলিলাম—

তবে বুঝি ওই পাখীটাকে তোর যথাসর্ব্বস্ব দিবি ? আমি বুঝি আমার এই দুগ্ধপুষ্ট তনুখানি গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিব ?

প্র। ও কি রকম কথা ? আমি কি তোমাকে তাই করতে বলছি ?

আ। নয়ই বা কেন ? ঐ পাখীটাই যদি তোর সব দুধ দই খেলে, তবে আমি কি বাতাস খেয়ে থাকব, না **Huxley** সাহেবের **protoplasm** খেয়ে থাকব ?

প্র। কেন, তুমিও খাবে, ও-ও খাবে।

আ। না, প্রসন্ন, কমলাকান্ত সরিকিতে নাই।

প্র। সে আবার কি?

আ। ভাগাভাগিতে আমি নাই। দায়ভাগের ভাগাভাগির ভয়ে আমি সংসারধর্ম্মই করিলাম না। আবার তোর ভাঁড়েও ভাগাভাগি?

প্র। কেন, তুমিই ত সে দিন কত দান ধর্ম্মের কথা, কত হোমানুটি মটরশুঁটির কথা বল্‌ছিলে?

আ। সে পরকে শেখাবার জন্য।

প্র। ও মা, সে কি গো! আপনার বেলা লীলাখেলা, পাপপুণ্য পরের বেলা!

আ। প্রসন্ন, কমলাকান্তের জাতিকে তুই এখনও চিনিস্ নাই। তা সে সব কথা যাক্। পাখীটাকে ছেড়ে দে।

প্র। তা হবে না। যাকে একবার ঠাঁই দিয়েছি, তাকে তাড়াতে পার্‌ব না।

আ। সেটা ত তোদের জাতিরই ধর্ম্ম নয়?

এবার প্রসন্ন রাগিল। বলিল—

কি, বামণ, তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর? তোমার মতন চুমুখো ত ভূ-ভারতে নাই। তোমার কাছে আবার মানুষ আসে?

এই বলিয়া প্রসন্ন উঠিল। প্রত্যহ প্রাতে আমাকে যে দুধটুকু দেয়, তাহা না দিয়াই চলিল। দুধ চলিয়া যায় দেখিয়া আমি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম—আচ্ছা, আমিও একটা পাখী পুষিব, আমার যা কিছু আছে, সব তাকে দিব। প্রসন্ন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া খাঁচাটা মাটিতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া আমাকে বলিল—আচ্ছা, আমিও এই বলে যাচ্ছি, যে দিন তুমি পাখীকে পোষ মানাতে পার্‌বে, সেই দিন আমি আমার এই দুধের কেঁড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ব।

এই বলিয়া প্রসন্ন খাঁচাটা তুলিয়া লইয়া ঠিকুরে বেরিয়ে গেল। কেঁড়ের দুধ চল্‌কে কাপড় বাহিয়া পড়িতে লাগিল। **O what a fall was there!**

আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পাখীর সন্ধানে বাহির হইলাম। অনেক ঘুরিলাম, অনেক পাখীর দোকানে গেলাম। কোথাও মনের মতন পাখী পাইলাম না। শেষে এক দোকানে একটি পাখী মনোনীত হইল, কিন্তু তখনই দামের কথা মনে পড়িল। আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, আমার ত একটি পয়সাও নাই; তবে কি বলিয়া পাখী কিনিতে আসিলাম? কিছু অবসন্ন হইলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল যে, কমলাকান্তের দেশে কয়জন সম্বলবিশিষ্ট লোক আছে? আর সম্বলহীন হইয়াও কে না বড় বড় সওদার চেষ্টায় ফিরিতেছে? কে না বড় বড় পদ, লম্বা লম্বা খেতাবের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? কিন্তু তাহারা কেহই ত লজ্জা, অপমান, ঘৃণা, কিছুই অনুভব করে না? তবে আমিই কেন লজ্জিত হই? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি, এমন সময় একটা কর্কশ শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটা এইরূপ—**Plateetud, Plateetud, Plateetud,** বারম্বার এই অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া শব্দের কারণ জানিবার ইচ্ছা হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়ীতে আসিলাম। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উঠানে এক কচ্ছহীন বীরপুরুষ কতকগুলো মুর্গী জবাই করিতেছে—রক্তের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। একখানা ঘরের দাবায় একটা স্ত্রীলোক পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, এবং বিষম যন্ত্রণাসূচক চীৎকার

করিতেছে। ঘরের চালে ডাঁড়ে বসিয়া একটা পাখী একবার সেই রক্তের স্রোত দেখিতেছে, একবার সেই স্ত্রীলোকটাকে দেখিতেছে এবং আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। এক একবার স্ত্রীলোটাকে ঠোক্‌রাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া Plateetud, Plateetud করিতেছে। আমি গৃহস্বামীকে ডাকিলাম। গৃহস্বামী বাহিরে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাড়ীতে কাহার কোন পীড়া হইয়াছে ?

গৃ-স্বা। হাঁ আমার স্ত্রীর হাঁটুতে বড় একটা বেদনা হইয়াছে। আমি সেই জন্য বড় বিপাকে পড়িয়াছি। আমার বাড়ীতে আজ দশজন লোক খাবে, আর এই বিপদ্‌ !

আ। আমি একটা ঔষধ দিতেছি ; জলে গুলিয়া হাঁটুতে মালিশ করিয়া দেও, শীঘ্র আরাম হইবে। কিন্তু আমাকে কি দিবে ?

গৃ-স্বা। আপনি কি চান ?

আ। ঐ পাখীটা।

গৃ-স্বা। এখনি লইয়া যান। ওটাকে আমি খুব যত্ন করিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু মহাশয়, এখন ওটা আমার ছেলেপিলেকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে মারিয়া ফেলিতেছে। আপনি এখনই লইয়া যান।

তখন আমি বিষম গোলে পড়িলাম। আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া ? যে আফিঙ্গ দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়া, সৃষ্টির সারভূত পদার্থ স্বরূপ লাভ করিয়া আমি লোভ-পরিশূন্য সংসারবিরাগী বলিয়া আমার জিম্মায় রাখিয়াছেন, সে আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া ? কিন্তু না দিলেও নয়। প্রসন্নের কাছে আগে মুখ রাখা চাই, সে দুধ দেয়। দেবাসুরে আমাকে এক ছিলিম তামাকুও দেয় না। সুতরাং ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে চক্ষু বুজিয়া ছোট্ট একটি গুলি গৃহস্বামীর হাতে দিয়া পাখীটা লইয়া চলিয়া আসিলাম। কাজটা মন্দ করিলাম কি ? উপকার করিয়া তাহার মূল্য স্বরূপ পাখীটা লইলাম। কে না লয় ? ডাক্তার মহাশয়েরা দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে fee লয়েন না ? উকিল মহাশয়েরা নিঃস্ব মোয়াক্কেলের নিকট হইতে fee লয়েন না ? রাজপুরুষেরা দরিদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে টেক্স লয়েন না ? কুলকামিনীরা দরিদ্র স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ লয়েন না ? তবে আমিই কি এমন ভয়ানক কাজ করিলাম ?

সেই দিন সন্ধ্যার পর আফিঙ্গ খাইয়া পাখীর ডাঁড়টা সাম্‌নে ঝুলাইয়া তামাকু খাইতে বসিলাম। ক্রমে আফিঙ্গ চড়িয়া উঠিল। তখন শুনিলাম, পাখীটা বলিতেছে—আমাকে কেন তেমন জায়গা হইতে এখানে আনিলে ? Plateetud, Plateetud।

আ। তুমি এই যে বেশ কথা কহিতে পার ! তোমার নাম কি, বাড়ী কোথা ?

পা। আমার নাম কাকাতুয়া, অর্থাৎ তুয়া কাকা। তোমাদিগকে uncleship শিখাইবার নিমিত্ত আমার এ প্রদেশে আগমন। Plateetud, Plateetud।

আ। তুমি তবে এ দেশীয় নও ? তোমার বাড়ী কোথা ?

পা। আপাততঃ এখান হইতে অনেক পশ্চিমে।

আ। আগে কোথায় থাকতে ?

পা। সে অনেক কথা। শুনিবে কি ?

আ। শুনিব। আজকালঅনেকে পুরাতত্ত্ব চর্চ্চা করিয়া খুব সস্তাদরে নাম কিন্‌চে, দেখি যদি আমিও কিছু করিতে পারি।

পা। শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে বল ?

আ। সে পরের কথা। আগে শুনি।

পা। আমি পাখী নই। আমি পশু। বহুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরের নিকট আমার বাস ছিল। তখন আমি শূকর ছিলাম। পাঁক ঘাঁটিতাম, পাঁক মাখিতাম, পাঁক খাইতাম। ক্রমে সেখানে মনুষ্যনামা এক প্রকার দ্বিপদবিশিষ্ট হিংস্রক জন্তু দেখা দিল। এবং পাঁকাল মাছ মনে করিয়া আমাদিগকে ধরিয়া খাইতে লাগিল।

আ। শূকরকে পাঁকাল মাছ মনে করিল কেমন করে ?

পা। শূকরও পাঁক ঘাটে, পাঁকাল মাছও পাঁক ঘাটে। অতএব শূকর এবং পাঁকাল মাছ এক।

আমার Whately's Logic জানা ছিল, ফস্ করে বলিলাম—

ওটা যে fallacy of undistributed middle হল।

প। Tut, fal-la-cy of un-dis-tri-bu-ted mid-dle! ও ত logicএর কথা? Antiquitiesএর সহিত Logicএর সম্পর্ক কি? দিন কতক Antiquities চর্চ্চা কর, Weber সাহেবের গ্রন্থ পড়, তাহা হইলে আর কিছু আট্‌কাবে না, ও রকম খট্‌কা হবে না। দ্বিপদগণের তাড়নায় আমরা পলাইতে লাগিলাম। যত পলাই ততই শীত, আর ততই আমাদের গায়ে বড় বড় লোম দেখা দিতে লাগিল। Plateetud ; Plateetud.

আ। সেটা কি রকম করিয়া হইল ?

পা। দেখ, কথায় কথায় ছল ধরিলে পুরাতত্ত্ব শেখা যায় না। শিবের কপালে চোক হইল কেমন করিয়া? গণেশের ঘাড়ে হাতীর মুণ্ড হইল কেমন করিয়া? হিমালয় পর্ব্বতটা দুর্গার বাপ হইল কেমন করিয়া? কুমারী মেরীর গর্ভে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হইল কেমন করিয়া? এ সব পুরাণের কথা, কে না বিশ্বাস করে? তবে পুরাতত্ত্বের বেলা এত খট্‌কা কেন? দেখ, পুরাণ আর পুরাতত্ত্ব একই জিনিস। উভয়েই পুরা কবিত্বময়। একত্বের কি চমৎকার প্রমাণ দেখ দেখি! তবে দুইটি শব্দের শেষ ভাগে যে একটা প্রভেদ দেখিতে পাও, সে কেবল প্রত্যয়ভেদে ঘটিয়াছে।

আ। তুমি যে সংস্কৃত ব্যাকরণও জান দেখিতেছি!

পা। আমি জানিব না ত কি তুমি জানিবে? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে, তা জান? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না, বই কাছে নাই, কিন্তু আমার বোধ হয়, Weber সাহেবের গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

আ। কোবিদবর! বলিয়া যান্!

পা। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমুদ্রমধ্যস্থিত একটা গিরিগুহায় ঢুকিয়া রক্ষা পাইলাম। সেখানে খুব শীত। সেই শীতে আমাদের ভুড়ো পেট কুঁকড়ে গেল—আমরা সিংহ হইয়া গেলাম। এই দেখ, সেই সিংহের কেশর আমার ঘাড়ে উচ্চ ঝোটন আকারে বিরাজমান।

আ। আবার সেই রকম fallacy হল না?

পা। দেখ, এই মাত্র তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, এ সকল পুরাতত্ত্ব, ইহাতে fallacy কোন ক্রমেই হইতে পারে না, তুমি সে সব কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাকে আর শুনাইয়া কি করিব, আমি ক্ষান্ত হইলাম।

আ। দেখ, তুমি রাগ করিও না, আমি একটু একটু আফিঙ্গ খাই বলিয়া সকল সময় আমার সব কথা মনে থাকে না।

পা। ওঃ! তুমি আফিঙ্গ খাও। তবে ত আমি তোমার একজন পরম সুহৃৎ, প্রধান শুভানুধ্যায়ী। আমি নিজে আফিঙ্গ খাই না বটে, আফিঙ্গ খেলে আমার পেট ফাঁপে, কিন্তু আফিঙ্গখোর মাত্রই আমার স্নেহের বস্তু, আমার পোষ্যপুত্র বলিলেই হয়। তবে শুন।

যখন সিংহ ছিলাম, তখন মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিকটস্থ একটা দেশে আহার সংগ্রহ করিতে যাইতাম। কিন্তু শীঘ্রই সে দিকে কাঁটা পড়িল। একটা ভূতের মেয়ে এক দিন এমনি আমাদের লেজ মুচড়াইয়া দিয়াছিল যে, লেজগুলা একেবারে চেপ্‌টা হইয়া গেল, আর সে দিকে যাইতে সাহস হইল না। কাজেই পেটের জ্বালায় আপনাপনি খাইতে আরম্ভ করিলাম। বোধ হয় এই রকম করিয়া সমস্ত সিংহকুল নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়"; ভাগ্যবলে আমাদের গায় পালক দেখা দিল। আমরা সাদা সাদা ডানা বিস্তার করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এ দেশে ও দেশে যাইতে লাগিলাম। যেখানে উত্তম আহারের সম্ভাবনা দেখিলাম, সেইখানে বাসা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে প্রতিবাদী হইল, তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম, অথবা তাড়াইয়া দিলাম। Plateetud, Plateetud।

আ। এদেশেও কি বাসা নির্মাণ করিয়াছ?

পা। করিয়াছি, কিন্তু পাকা পোক্ত রকম নয়।

আ। নয় কেন?

পা। এখানে এত বেশী খাই যে, শীঘ্র উদরাময় জন্মিয়া যায়, বাড়ীতে না গেলে সারে না। আর গুহার ভিতর সঞ্চিত আহার লুকাইবার সুবিধাও খুব।

আ। আচ্ছা, তোমার দুইটি বই পা দেখিতেছি না। আর দুইটি পা কি হইল?

পা। সে বড় দুঃখের কথা, কাহাকেও বলিও না। সংক্ষেপে বলি—ইচ্ছানন্দপুর নামক স্থানে একটা দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুর বাসায় আহারের লোভে প্রবেশ করিয়াছিলাম। জন্তুটা আমাকে ধরিয়া আমার একটা পা কাটিয়া দিল। এবং মহানন্দপুর নামক আর এক স্থানে ঐরূপ কারণে আর একটা পা কাটা গিয়াছে! অতএব আমি পক্ষিরূপে একটি পশু। Plateetud, Plateetud।

এই সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী সেখানে না থাকায় আমার বড়ই আপ্‌শস্ হইল। থাকিলে শুনাইয়া দিতাম, পরের ঘরে লুকোচুরি খেলা কি রকম লাভের কাজ। পরে পাখীটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি ও Plateetud, Plateetud কর?

পা। এদেশে আসা অবধি আমি Plateetud বলিতে বড় ভালবাসি।

আ। কথাটার কোন অর্থ আছে কি?

পা। আছে বৈ কি। কথাটা Plantain শব্দ হইতে উৎপন্ন।

আ। বুঝিয়াছি, তুমি Plantain খাইতে ভাল বাস বলিয়া সর্ব্বদা plateetud, plateetud কর।

পা। তা নয়; আমি এদেশের যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া খাইতেছি। কাজেই দেশের দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুগুলার ভাগ্যে plantain বই আর কিছুই থাকে না। তাই তাহাদিগের edificationএর জন্য plateetud বলি। বুঝ্‌লে?

আ। আহা, তুমি কি পরোপকারী!

পা। তার প্রমাণ ঐ নীচে দেখ।

দেখিলাম, ডাঁড়ের নীচে, মেজের উপর পিপীলিকার ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কিল্ কিল্ করিয়া বেড়াইতেছে। পাখীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ও সব ত পিপীলিকা দেখিতেছি। ওখানে তোমার পরোপকারিত্বের প্রমাণ কই?

পা। উহারা পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র বটে, দেখিতেও প্রায় পিপীলিকা, কিন্তু উহারা পিপীলিকা নয়। উহাদিগকে বঙ্গজ বলে। ঐ দেখ, আমার ডাঁড় থেকে এক ফোঁটা দুধ পড়িল আর বঙ্গজগুলা কিল্ কিল্ করিয়া মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া ঐ দু-টুকু খাইতে আসিল। আমার ডাঁড় হইতে যে দুই এক ফোঁটা দুধ পড়ে, তাই খাইয়া উহারা জীবনধারণ করে। আমি উহাদের উপকারক নই?

আ। শুধু উপকারক? যখন তুমি উহাদের উদর চালাইতেছ, তখন তুমি উহাদের প্রাণপুরুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রেতাত্মা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, সবই; কেন না, উহারা উদরময় উদরসর্ব্বস্ব। আচ্ছা, উহাদের মধ্যে ঐ যে কতকগুলার বড় বড় মাথা দেখিতেছি, উহারা কে? উহাদের মাথা অত বড় কেন?

পা। মাথা বড় নয়। আমার কাছে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া উহারা মাথা ফুলাইয়া ফেলিয়াছে। উহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান্। দেখিতেছ না উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত শিষ্ট স্বজাতীয়দিগকে মারিয়া ধরিয়া, তাড়াইয়া দিয়া আমার ডাঁড়ের নীচে দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া আমাকে কত সেলাম করিতেছে এবং আমার প্রসাদের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দূরস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্গজের দলে প্রবেশ করিয়া মোটা মাথা উন্নত করিয়া বেড়াইতেছে?

আ। এ তোমার বড় অন্যায়। তুমি ছোট ছোট কৃশাঙ্গগুলিকে যত্ন না করিয়া মোটা মোটা গুলাকে অনুগ্রহ কর?

পা। দেখ, আমি প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও যত্ন কি অনুগ্রহ করি না। আমার সমস্ত যত্ন এবং অনুগ্রহ আমাতেই অর্পিত। তবে, মোটা মাথাগুলো আমাকে খুব সেলাম করে এবং বিভীষণের ন্যায় আপনাদের ঘরের সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া দেয়, তাই উহাদিগকে দুধের উপর দুই একটা ছোলার খোসা দিয়া থাকি। Plateetud।

আ। ওরা কি দানা খেতে কিছু ভাল বাসে?

পা। দানা নয়, খোসা, খোসা, খোসা, তার বেশী হজম করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই। তবে এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমার ইতিহাস শুনিলে ত?

আ। কেন, তুমি কোথায় যাবে?

পা। আমি সেই মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া থাকিব।

আ। কেন, এখানে তোমার কিসের কষ্ট?

পা। এখানে ত মুর্গী জবাই দেখিতে পাইব না, ছোট ছেলের নেড়া মাথা ঠোক্‌রাইতে পাইব না। এখানে কি সুখে থাকিব? আমাকে ছাড়িয়া দেও—আমি তোমাকে সর্ব্বদা আফিঙ্গ সরবরাহ করিব—plateotud।

আ। সে ভাল কথা, কিন্তু দুই চারি দিন আমি তোমাকে ছাড়িব না—আমার একটু জীদ্‌ আছে।

প্রসন্ন বলিয়া উঠিল—কি ঠাকুর, ছাড়িবে না, পোষ মানাবে? ঐ দেখ. তোমার পাখী কট্‌ করে শিক্‌লি কেটে উড়ে গেল।

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম কে ও, প্রসন্নময়ি, কি মনে করে?

প্র। আর আদরে কাজ নাই। চল, দুধ নেবে চল।

আ। এস। কিন্তু আগে একটা কাজ কর ত। ঐ ঝাঁটা গাছটা দিয়া ঐ বঙ্গজগুলাকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেও ত।

গোয়ালিনী মাগী তাহাই করিল।

গদ্য পদ্য

বা

কবিতাপুস্তক

[১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

গদ্য পদ্য

বা

কবিতাপুস্তক

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ললিতা ও মানস ও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিতাপুস্তক' প্রথম মুদ্রিত]

সম্পাদক ঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ— ভাদ্র, ১৩৪৬

দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫৩

মূল্য এক টাকা

মুদ্রাকর— শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস

প্রবাসী প্রেস,

১২০।২ আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

৭.২—২৮।২।৪৭

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের গদ্য-বিভাগের সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র কবিতামার্গে সাধনার নিম্ন স্তর ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই; তাঁহার গদ্য যতখানি পূর্ণবিকশিত, তাঁহার পদ্য ঠিক ততখানিই অপরিস্ফুট। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই, তাঁহার সাহিত্যজীবনের আদিপর্ব্বে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আদর্শে 'সংবাদ প্রভাকরে' যে সাধনার সূত্রপাত হইয়াছিল, সতীর্থ দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতির সহিত "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" সত্ত্বেও তাহা খুব অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কারণ, শুধু মিল বজায় রাখিয়া আদিরসাশ্রিত ছড়া কাটিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে নাই; সমগ্র বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে যিনি অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে কাব্যরসাশ্রিত ও সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন, সূত্রপাতেই যে তাঁহার পয়ার-ত্রিপদীর তরী বানচাল হইয়াছিল, ইহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষম কবিতার জন্য ইহার অধিক ভূমিকার আবশ্যক নাই। উত্তরকালে 'বঙ্গদর্শনে', 'ভ্রমরে' ও 'প্রচারে' তিনি বাল্যলীলারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—হঠাৎ কিছু অঘটন ঘটাইতে পারেন নাই।

ইতিহাসের দিক্ দিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়, তাঁহার বয়স তখন ১৪ বৎসর পূর্ণ হয় নাই; ইহার পর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'ই "রচনা-প্রতিযোগিতা" ও "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে"র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কাব্য পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচিত হয় এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' নামে কলিকাতার "শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত" হইয়া প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪১। ইহাই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র তথাকথিত কাব্যচর্চ্চা একরকম ছাড়িয়াই দেন। উপন্যাসের মাঝে মাঝে তিনি দুই একটি ছড়া অথবা সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অথবা 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতির পৃষ্ঠা পূরণের জন্য ক্বচিৎ কখনও দুই একটি গাথা অথবা ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা লিখিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালে ছন্দোবদ্ধ কাব্যসরস্বতীর সহিত তাঁহার ইহার অধিক সম্পর্ক ছিল না। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের কাব্যসাধনা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে চান, তাঁহাদিগকে সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত আমাদের সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের "বিবিধ" খণ্ড পড়িয়া দেখিতে বলি।

"বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা" অধ্যায়ে ও শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের সে যুগের কাব্যসাধনার যতটুকু নিদর্শন পাওয়া যায়, সমুদয়ই উদ্ধৃত হইয়াছে।

কাব্যরচনায় স্বীয় অক্ষমতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। প্রথম সংস্করণের ('কবিতাপুস্তক'—১৮৭৮) "বিজ্ঞাপনে" কবিতাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রণের যে কৈফিয়ৎ তিনি দিয়াছেন, তাহা পাঠে বুঝা যায় যে, নিজের এই রচনাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার কোনও মোহ ছিল না।

'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানসে'র (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) "বিজ্ঞাপন"টির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কিশোর বয়সের গদ্য রচনার নমুনাস্বরূপ এটিকে দাখিল করা চলে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

বিজ্ঞাপন।

সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতা দ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্য দ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞত. ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।

পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার সময় 'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর' ও 'প্রচারে' প্রকাশিত রচনাগুলির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। পাঠকদের সুবিধার জন্য পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন রচনার প্রকাশকাল পৃষ্ঠাসংখ্যা সহ দেওয়া হইল।—

বঙ্গদর্শন

সংযুক্তা	—চৈত্র	১২৮৪, পৃ. ৫২৯-৫৩৩
আকাঙ্ক্ষা	—জ্যৈষ্ঠ	১২৭৯, পৃ. ৭৯-৮০
অধঃপতন সঙ্গীত	—অগ্রহায়ণ	১২৮১, পৃ. ৩৮২-৩৮৪
সাবিত্রী	—অগ্রহায়ণ	১২৭৯, পৃ. ৩৭১-৩৭৩
আদর	—বৈশাখ	১২৮০, পৃ ৪৬
বায়ু	—কার্ত্তিক	১২৭৯, পৃ. ৩২৮-৩৩০
আকবর শাহের খোষ রোজ	—বৈশাখ	১২৮৫, পৃ. ১১-১৬
মন এবং সুখ	—কার্ত্তিক	১২৮০, পৃ. ৩২৯-৩৩০
ভাই ভাই	—চৈত্র	১২৮১, পৃ. ৫৬১-৫৬৩
দুর্গোৎসব	—ভাদ্র	১২৮৫, পৃ. ২০১-২০৯
মেঘ	—ভাদ্র	১২৮০, পৃ. ২৩৩-২৩৫
খদ্যোত	—জ্যৈষ্ঠ	১২৮৪, পৃ. ৯১-৯৪

প্রচার

পুষ্পনাটক	—শ্রাবণ	১২৯১, পৃ. ৩৫-৪০
রাজার উপর রাজা	—বৈশাখ	১২৯২, পৃ. ২৫৯-২৬০

ভ্রমর

জলে ফুল	—বৈশাখ	১২৮১, পৃ. ১৮-১৯
বৃষ্টি	—আষাঢ়	১২৮১, পৃ. ৬১-৬৩

'গদ্য পদ্যে'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি ছাড়া 'বঙ্গদর্শনে' (ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ. ৫১১) তাঁহার অন্ততঃ আর একটি কবিতা "বিরহিণীর দশ দশা" প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা যে কারণেই হউক, পুস্তকে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কবিতাটি "বিবিধ" খণ্ডে (২য় সংস্করণ) মুদ্রিত হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'কবিতাপুস্তকে'র মাত্র দুইটি সংস্করণ হইয়াছিল, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ "কাঁটালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত" হয়; দ্বিতীয় সংস্করণ 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' নামে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে "Hare Press : Calcutta" হইতে প্রকাশিত হয়।

সূচী

বিজ্ঞাপন

যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা, এই কবিতাপুস্তকে সন্নিবেশিত হইল, প্রায় সকলগুলিই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি—"জলে ফুল" ভ্রমরে প্রকাশিত হয়। বাল্যরচনা দুটি কবিতা, বাল্যকালেই পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে কিছু অভাব থাকুক, গীতিকাব্যের অভাব নাই। বিদ্যাপতির সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী কবিরা গীতিকাব্যের বৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। এমন সময়ে এই কয়খানি সামান্য গীতিকাব্য পুনর্মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় জনসাধারণের কেবল বিরক্তিই জন্মাইতেছি। এ মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুনিষেকের প্রয়োজন ছিল না। আমারও ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই এত দিন এ সকল পুনর্মুদ্রিত করি নাই।

তবে কেন এখন এ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম? একদা বঙ্গদর্শন আপিসে এক পত্র আসিল—তাহাতে কোন মহাত্মা লিখিতেছেন যে, বঙ্গদর্শনে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তিনি সেই সকল পুনর্মুদ্রিত করিতে চাহেন। অন্যে মনে করিবেন যে, রহস্য মন্দ নহে। আমি ভাবিলাম, এই বেলা আপনার পথ দেখা ভাল, নহিলে কোন দিন কাহার হাতে মারা পড়িব। সেই জন্য পাঠককে এ যন্ত্রণা দিলাম। বিশেষ, যাহা প্রচারিত হইয়াছে, ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহার পুনঃপ্রচারে নূতন পাপ কিছুই নাই। অনেক প্রকার রচনা সাধারণসমীপস্থ করিয়া আমি অনেক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি; শত অপরাধের যদি মার্জ্জনা হইয়া থাকে, তবে আর একটি অপরাধেরও মার্জ্জনা হইতে পারে।

কবিতাপুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ স্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত

করিলাম। অনেকে বলিবেন, এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে, এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।

অন্য কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহাই হউক, যে দুইটি বাল্যরচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, তাহার কোন মার্জ্জনা নাই। ঐ কবিতাদ্বয়ের কোন গুণ নাই। ইহা নীরস, দুরূহ, এবং বালকসুলভ অসার কথায় পরিপূর্ণ। যখন আমি কালেজের ছাত্র, তখন উহা প্রথম প্রচারিত হয়। পড়িয়া উহার দুরূহতা দেখিয়া, আমার একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, "ওগুলি হিয়ালি।" অধ্যাপক মহাশয় অন্যায় কথা বলেন নাই। ঐ প্রথম সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না—অনেক কাপি আমি স্বয়ং নষ্ট করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার অনেকগুলি বন্ধু, আমার প্রতি স্নেহবশতঃ ঐ বাল্যরচনা দেখিতে কৌতূহলী। তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থ ই এই দুইটি কবিতা পুনর্মুদ্রিত হইল।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালা কবিতা পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাহিতে হয়। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক অপরাধ করিতেছেন, সে সকল পাঠক যদি ক্ষমা করেন, আমার এ অপরাধও ক্ষমা করিবেন।

ক্ষমার একটু কারণ এই আছে যে, এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। "পুষ্পনাটক" প্রথম "প্রচারে" প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।

"দুর্গোৎসব" "বঙ্গদর্শন" হইতে, এবং "রাজার উপর রাজা" "প্রচার" হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

"কবিতাপুস্তক" অপেক্ষা "গদ্য পদ্য" নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এই জন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্তন করা গেল।

পুষ্পনাটক

যুথিকা। এসো, এসো, প্রাণনাথ এসো : আমার হৃদয়ের ভিতর এসো ; আমার হৃদয় ভরিয়া যাউক। কত কাল ধরিয়া তোমার আশায় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া বসিয়া আছি, তা কি তুমি জান না ? আমি যখন কলিকা, তখন ঐ বৃহৎ আগুনের চাকা—ঐ ত্রিভুবনশুষ্ককর মহাপাপ, কোথায় আকাশের পূর্ব্বদিকে পড়িয়াছিল। তখন এমন বিশ্বপোড়ান মূর্ত্তিও ছিল না। তখন এর তেজের এত জ্বালাও ছিল না—হায়। সে কত কাল হইল ! এখন দেখ, সেই মহাপাপ ক্রমে আকাশের মাঝখানে উঠিয়া, ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাইয়া, ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া হেলিয়া, এখন বুঝি অনন্তে ডুবিয়া যায় ! যাক্ ! দূর হৌক—তা তুমি এত কাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ ? তোমায় পেয়ে দেহ শীতল হইল, হৃদয় ভরিয়া গেল—ছি, মাটিতে পড়িও না ! আমার বুকে তুমি আছ, তাতে সেই পোড়া তপন আর আমাকে না জ্বালাইয়া তোমাকে কেমন সাজাইতেছে ! সেই রৌদ্রবিম্বে তুমি কেমন রত্নভূষিত হইয়াছ। তোমার রূপে আমিও রূপসী হইয়াছি—থাক, থাক, হৃদয়-স্নিগ্ধকর !—আমার হৃদয়ে থাক, মাটিতে পড়িও না।

টগর। (জনান্তিকে কৃষ্ণকলির প্রতি) দেখ্ ভাই কৃষ্ণকলি,—মেয়েটার রকম দেখ্।

কৃষ্ণকলি। কোন্ মেয়েটার ?

টগর। ঐ যুঁইটা। এত কাল মুখ বুজে, ঘাড় হেঁট ক'রে, যেন দোকানের মুড়ির মত পড়িয়া ছিল—তার পর আকাশ থেকে বৃষ্টির কোঁটা, নবাবের বেটা নবাব, বাতাসের ঘোড়ায় চ'ড়ে একেবারে মেয়েটার ঘাড়ের উপর এসে পড়িল। অমনি মেয়েটা হেসে, ফুটে, একেবারে আটখানা ! আঃ, তোর ছেলে বয়স ! ছেলেমানুষের রকমই এক স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণকলি। আ ছি ! ছি !

টগর। তা দিদি ! আমরা কি আর ফুট্‌তে জানিনে ? তা, সংসারধর্ম্ম করিতে গেলে দিনেও ফুট্‌তে হয়, দুপুরেও ফুট্‌তে হয়, গরমেও ফুটতে হয়, ঠাণ্ডাতেও ফুট্‌তে হয়, না ফুটলে চলবে কেন বহিন ? আমাদেরই কি বয়স নেই ? তা, ও সব অহঙ্কার ঠেকার আমরা ভালবাসি না।

কৃষ্ণকলি। সেই কথাই ত বলি।

যুঁই। তা এত কাল কোথা ছিলে প্রাণনাথ ! জা'না কি যে, তুমি বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না ?

বৃষ্টিবিন্দু। দুঃখ করিও না, প্রাণাধিকে। আসিব আসিব অনেক কাল ধরিয়া মনে করিতেছি, কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। কি জান, আকাশ হইতে পৃথিবীতে আসা, ইহাতে অনেক বিঘ্ন। একা আসা যায় না, দলবল যুটিয়া আসিতে হয়, সকলের সব সময় মেজাজ মরজি সমান থাকে না। কেহ বাষ্পরূপ ভাল বাসেন, আপনাকে বড় লোক মনে করিয়া আকাশের উচ্চ স্তরে অদৃশ্য হইয়া থাকিতে ভাল বাসেন; কেহ বলেন, একটু ঠাণ্ডা পড়ুক, বায়ুর নিম্ন স্তর বড় গরম, এখন গেলে শুকাইয়া উঠিব; কেহ বলেন, পৃথিবীতে নামা, ও অধঃপতন, অধঃপাতে কেন যাইব? কেহ বলেন, আর মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আকাশে কালামুখো মেঘ হ'য়ে চিরকাল থাকি, সেও ভাল; কেহ বলেন, মাটিতে গিয়া কাজ নাই, আবার সেই চিরকেলে নদী নালা বিল খাল বেয়ে সেই লোণা সমুদ্রটায় পড়িতে হইবে, তার চেয়ে এসো, এই উজ্জ্বল রৌদ্রে গিয়া খেলা করি, সবাই মিলে রামধনু হইয়া সাজি, বাহার দেখিয়া ভূচর খেচর মোহিত হইবে। তা সব যদি মিলিয়া মিশিয়া আকাশে যোটপাট হওয়া গেল, তবু জাতিবর্গের গোলযোগ মিটে না। কেহ বলেন, এখন থাক্; এখন এসো, কালিমাময়ী কালী করালী কাদম্বিনী সাজিয়া, বিদ্যুতের মালা গলায় দিয়া, আমরা এইখানে বসিয়া বাহার দিই। কেহ বলে, অত তাড়াতাড়ি কেন? আমরা জলবংশ, ভূলোক উদ্ধার করিতে যাইব, অমনি কি চুপি চুপি যাওয়া হয়?—এসো, খানিক ডাক হাঁক করি। কেহ ডাক হাঁক করে, কেহ বিদ্যুতের খেলা দেখে—মাগী নানা রঙ্গে রঙ্গিণী—কখন এ মেঘের কোলে, কখন ও মেঘের কোলে, কখন আকাশপ্রান্তে, কখন আকাশমধ্যে, কখনও মিটি মিটি, কখনও চিকি চাকি—

যূঁই। তা তোমার যদি সেই বিদ্যুতেই এত মন মজেছে, ত এলে কেন? সে হ'লো বড়, আমরা হলেম ক্ষুদ্র।

বৃষ্টিবিন্দু। আ ছি! ছি! রাগ কেন? আমি কি সেই রকম? দেখ, ছেলে ছোকরা হাল্‌কা যারা, তারা কেহই আসিল না, আমরা জন কত ভারি লোক, থাকিতে পারিলাম না, নামিয়া আসিলাম। বিশেষ তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন দেখা শুনা হয় নাই।

পদ্ম। (পুকুর হইতে) উঃ, বেটা কি ভারি রে। আয় না, তোদের মত দু লাখ্, দশ লাখ্, আয় না—আমার একটা পাতায় বসাইয়া রাখি।

বৃষ্টিবিন্দু। বাছা, আসল কথাটা ভুলে গেলে? পুকুর পুরায় কে? হে পঙ্কজে, বৃষ্টি নহিলে জগতে পাঁকও থাকিত না, জলও থাকিত না, তুমি ভাসিতেও পাইতে না, হাসিতেও পাইতে না। হে জলজে, তুমি আমাদের ঘরের মেয়ে, তাই আমরা তোমাকে বুকে করিয়া পালন করি,—নহিলে তোমার এ রূপও থাকিত না, এ সুবাসও থাকিত না, এ

গর্ব্বও থাকিত না। পাপীয়সি! জানিস্ না—তুই তোর পিতৃকুলবৈরি সেই অগ্নিপিণ্ডটার অনুরাগিণী।

যুঁই। ছি! প্রাণাধিক! ও মাগীটার সঙ্গে কি অত কথা কহিতে আছে! ওটা সকাল থেকে মুখ খুলিয়া সেই অগ্নিময় নায়কের মুখপানে চাহিয়া থাকে, সেটা যে দিকে যায়, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে, এর মধ্যে কত বোলতা, ভোমরা, মৌমাছি আসে, তাতেও লজ্জা নাই। অমন বেহায়া জলেভাসা, ভোমরা মৌমাছির আশা, কাঁটার বাসার সঙ্গে কথা কহিতে আছে কি?

কৃষ্ণকলি। বলি, ও যুঁই, ভোমরা মৌমাছির কথাটা ঘরে ঘরে নয় কি?

যুঁই। আপনাদের ঘরের কথা কও দিদি, আমি ত এই ফুটিলাম। ভোমরা মৌমাছির জ্বালা ত এখনও কিছু জানি না।

বৃষ্টিবিন্দু। তুমিই বা কেন বাজে লোকের সঙ্গে কথা কও। যারা আপনারা কলঙ্কিনী, তারা কি তোমার মত অমল ধবল শোভা, এমন সৌরভ দেখিয়া সহ্য করিতে পারে?

পদ্ম। ভাল রে ক্ষুদে! ভাল! খুব বক্তৃতা কর্‌চিস্! ঐ দেখ, বাতাস আসচে!

যুঁই। সর্ব্বনাশ! কি বলে যে!

বৃষ্টিবিন্দু। তাই ত! আমার আর থাকা হইল না।

যুঁই। থাক না!

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে পারিব না। বাতাস আমাকে ঝরাইয়া দিবে।—আমি উহার বলে পারি না।

যুঁই। আর একটু থাক না।

[বাতাসের প্রবেশ]

বাতাস। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। কেন মহাশয়!

বাতাস। আমি এই অমল কমল সুশীতল সুবাসিত ফুল্লকলিকা লইয়া ক্রীড়া করিব। তুই বেটা অধঃপতিত, নীচগামী, নীচবংশ—তুই এই সুখের আসনে বসিয়া থাকিবি! নাম্!

বৃষ্টিবিন্দু। আমি আকাশ থেকে এয়েছি।

বাতাস। তুই বেটা পার্থিবযোনি—নীচগামী—খালে বিলে খানায় ডোবায় থাকিস—তুই এ আসনে? নাম্।

বৃষ্টিবিন্দু। যূথিকে! আমি তবে যাই?

যুঁই। থাক না।

বৃষ্টিবিন্দু। থাকিতে দেয় না যে।

যুঁই। থাক না—থাক না—থাক না।

বাতাস। তুই অত ঘাড় নাড়িস কেন?

যুঁই। তুমি সর।

বাতাস। আমি তোমাকে ধরি, সুন্দরি।

[যূথিকার সরিয়া সরিয়া পলায়নের চেষ্টা]

বৃষ্টিবিন্দু। এত গোলযোগে আর থাকিতে পারি না।

যুঁই। তবে আমার যা কিছু আছে, তোমাকে দিই, ধুইয়া লইয়া যাও।

বৃষ্টিবিন্দু। কি আছে?

যুঁই। একটু সঞ্চিত মধু—আর একটু পরিমল।

বাতাস। পরিমল আমি নিব—সেই লোভেই আমি এসেছি। দে—

[বায়ুকৃত পুষ্প প্রতি বল প্রয়োগ]

যুঁই। (বৃষ্টিবিন্দুর প্রতি) তুমি যাও—দেখিতেছ না ডাকাত!

বৃষ্টিবিন্দু। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কি প্রকারে! যে তাড়া দিতেছে, থাকিতেও পারি না—যাই—যাই—

[বৃষ্টিবিন্দুর ভূপতন]

টগর ও কৃষ্ণকলি। এখন, কেমন স্বর্গবাসী! আকাশ থেকে নেমে এয়েচ না? এখন মাটিতে শোব, নরদমায় পশ, খালে বিলে ভাস—

যুঁই। (বাতাসের প্রতি) ছাড়! ছাড়!

বাতাস। কেন ছাড়িব? দে পরিমল দে!

যুঁই। হায়! কোথা গেলে তুমি অমল, কোমল, স্বচ্ছ, সুন্দর, সূর্য্যপ্রতিভাত, রসময়, জলকণা! এ হৃদয় স্নেহে ভরিয়া আবার শূন্য করিলে কেন জলকণা! একবার রূপ দেখাইয়া, স্নিগ্ধ করিয়া, কোথায় মিশিলে, কোথায় শুষিলে প্রাণাধিক! হায়, আমি কেন তোমার সঙ্গে গেলেম না, কেন তোমার সঙ্গে মরিলাম না! কেন অনাথ, অস্নিগ্ধ পুষ্পদেহ লইয়া এ শূন্য প্রদেশে রহিলাম—

বাতাস। নে, কান্না রাখ—পরিমল দে—

যুঁই। ছাড়; নহিলে যে পথে আমার প্রিয় গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।

বাতাস। যাস্ যাবি, পরিমল দে।—হুঁ হুম্!

যুঁই। আমি মরিব।—মরি—তবে চলিলাম।

বাতাস। হুঁ হুম্!

[ইতি যূথিকার বৃন্তচ্যুতি ও ভূপতন।

বাতাস। হুঃ! হায়! হায়!

যবনিকা পতন

EPILOGUE

প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়! এ কি ছাই হইল?

দ্বিতীয় ঐ। তাই ত, একটা যুঁই ফুল নায়িকা, আর এক ফোঁটা জল নায়ক। বড় ত Drama!

তৃতীয় ঐ। হতে পারে, কোন Moral আছে। নীতিকথা মাত্র।

চতুর্থ ঐ। না হে—এক রকম Tragedy.

পঞ্চম ঐ। Tragedy, না একটা Farce?

ষষ্ঠ ঐ। Farce না—Satire—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

সপ্তম ঐ। তাহা নহে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থবিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। "বাসনা" বা "তৃষ্ণা" নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয়, গ্রন্থকার ততটা ফুটিতে চান না।

অষ্টম ঐ। এ একটা রূপক বটে। আমি অর্থ করিব?

প্রথম ঐ। আচ্ছা, গ্রন্থকারই বলুন না কি এটা।

গ্রন্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরাজী Title দিব—

"A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower-plot on the evening of the 19th July 1885, Sunday, and of which the writer was an eye-witness!"

সংযুক্তা*

১। স্বপ্ন

১

নিশীথে শুইয়া,		রজত পালঙ্কে
পুষ্পগন্ধি শির,		রাখি রামা অঙ্কে,
দেখিয়া স্বপন,		শিহরে সশঙ্কে
		মহিষীর কোলে, শিহরে রায়।
চমকি সুন্দরী		নৃপে জাগাইল
বলে প্রাণনাথ,		এ বা কি হইল,
লক্ষ যোধ রণে,		যে না চমকিল
		মহিষীর কোলে সে ভয় পায়!

২

উঠিয়ে নৃপতি		কহে মৃদু বাণী
যে দেখিনু স্বপ্ন,		শিহরে পরাণি,
স্বর্গীয়া জননী		চৌহানের রাণী
		বন্য হস্তী তাঁরে মারিতে ধায়।
ভয়ে ভীত প্রাণ		রাজেন্দ্রঘরণী
আমার নিকটে		আসিল অমনি
বলে পুত্র রাখ,		মরিল জননী
		বন্যহস্তি-শুণ্ডে প্রাণ বা যায়॥

৩

ধরি ভীম গদা		মারি হস্তিতুণ্ডে,
না মানিল গদা,		বাড়াইয়া শুণ্ডে,
জননীকে ধরি,		উঠাইল মুণ্ডে;
		পাড়িয়া ভুমেতে বধিল প্রাণ।

---

* পৃথ্বীরাজের মহিষী—কান্যকুব্জরাজার কন্যা। টডকৃত রাজস্থানের সংযুক্তার বৃত্তান্ত দেখ

কুস্বপন আজি দেখিলাম রাণি,
কি আছে বিপদ কপালে না জানি
মত্ত হস্তী আসি বধে রাজেন্দ্রাণী
আমি পুত্র নারি করিতে ত্রাণ ॥

৪

শুনিয়াছি নাকি তুরঙ্কের দল
আসিতেছে হেথা, লঙ্ঘি হিমাচল
কি হইবে রণে, ভাবি অমঙ্গল,
বুঝি এ সামান্য স্বপন নয়।
জননীরূপেতে বুঝি বা স্বদেশ,
বুঝি বা তুরঙ্ক মত্ত হস্তী বেশ,
বার বার বুঝি এইবার শেষ!
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয় ॥

৫

শুনি পতিবাণী যুড়ি দুই পাণি
জয় জয় জয়! বলে রাজরাণী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়—
জয় জয় জয়! বলিল বামা।
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব!
কোথাকার ছার তুরঙ্ক পহ্লব
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিতনামা ॥

৬

আসে আসুক না পাঠান পামর,
আসে আসুক না আরবি বানর,

আসে আসুক না নর বা অমর।
কার সাধ্য তব শকতি সয় ?
পৃথ্বীরাজ সেনা অনন্ত মণ্ডল
পৃথ্বীরাজভুজে অবিজিত বল
অক্ষয় ও শিরে কিরীট কুণ্ডল
জয় জয় পৃথ্বীরাজের জয় ॥

৭

এত বলি বামা দিল করতালি
দিল করতালি গৌরবে উছলি,
ভূষণে শিঞ্জিনী, নয়নে বিজলি
দেখিয়া হাসিল ভারতপতি।
সহসা কঙ্কণে লাগিল কঙ্কণ,
আঘাতে ভাঙ্গিয়া খসিল ভূষণ,
নাচিয়া উঠিল দক্ষিণ নয়ন,
কবি বলে তালি না দিও সতি ॥

২। রণসজ্জা

১

রণসাজে সাজে চৌহানের বল,
অশ্ব গজ রথ পদাতির দল,
পতাকার রবে পবন চঞ্চল,
বাজিল বাজনা—ভীষণ নাদ।
ধূলিতে পূরিল গগনমণ্ডল,
ধূলিতে পূরিল যমুনার জল,
ধূলিতে পূরিল অলক কুন্তল,
যথা কুলনারী গণে প্রমাদ ॥

৫

দেশ দেশ হতে　　এলো রাজগণ
স্থানেশ্বর পদে　　বধিতে যবন
সঙ্গে চতুরঙ্গ　　সেনা অগণন—
　　হর হর বলে যতেক বীর।
মদবার* হতে　　আইল সমর[1]
আবু হতে　　এলো দুরন্ত প্রমর
আর্য্য বীরদল　　ডাকে হর! হর!
　　উছলে কাঁপিয়া কালিন্দী-নীর ॥

৬

গ্রীবা বাঁকাইয়া　　চলিল তুরঙ্গ
শুণ্ড আছাড়িয়া　　চলিল মাতঙ্গ
ধনু আস্ফালিয়া—　　শুনিতে আতঙ্ক—
　　দলে দলে দলে পদাতি চলে।
বসি বাতায়নে　　কনৌজনন্দিনী
দেখিলা অদূরে　　চলিছে বাহিনী
ভারত ভরসা,　　ধরম রক্ষিণী—
　　ভাসিলা সুন্দরী নয়নজলে ॥

৭

সহসা পশ্চাতে　　দেখিল স্বামীরে,
মুছিলা অঞ্চলে　　নয়নের নীরে,
যুড়ি দুই কর　　বলে "হেন বীরে
　　রণসাজে আমি সাজাব আজ।"
পরাইল ধনী　　কবচকুণ্ডল
মুকুতার দাম　　বক্ষে ঝলমল
ঝলসিল রত্ন　　কিরীট মণ্ডল
　　ধনু হস্তে হাসে রাজেন্দ্ররাজ ॥

* মেবার।

[1] সমর সিংহ।

৫

সাজাইয়া নাথে যোড় করি পাণি
ভারতের রাণী কহে মৃদু বাণী
"সুখী প্রাণেশ্বর তোমায় বাখানি
এ বাহিনীপতি চলিলা রণে।
লক্ষ যোধ প্রভু তব আজ্ঞাকারী,
এ রণসাগরে তুমি হে কাণ্ডারী
মথিবে সে সিন্ধু নিয়ত প্রহারি
সেনার তরঙ্গ তরঙ্গসনে॥

৬

আমি অভাগিনী জনমি কামিনী
অবরোধে আজি রহিনু বন্দিনী
না হতে পেলাম তোমার সঙ্গিনী.
অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া রহিনু পাছে।
যবে পশি তুমি সমর-সাগরে
খেদাইবে দূরে ঘোরির বানরে
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পরে,
তব বীরপনা। না রব কাছে॥

৭

সাধ প্রাণনাথ সাধ নিজ কাজ
তুমি পৃথ্বীপতি মহা মহারাজ
হানি শত্রুশিরে বাসবের বাজ
ভারতের বীর আইস ফিরে।
নহে যদি শম্ভু হয়েন নির্দ্দয়
যদি হয় রণে পাঠানের জয়
না আসিও ফিরে,—দেহ যেন বয়
রণক্ষেত্রে ভাসি শত্রুরুধিরে॥

৮

কত সুখ প্রভু, ভুঞ্জিলে জীবনে !
কি সাধ বা বাকি এ তিন ভুবনে ?
নয় গেল প্রাণ, ধর্ম্মের কারণে ?
চিরদিন রহে জীবন কার ?
যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে যশ
গৌরবে পূরিত হবে দিক্ দশ
এ কান্ত শরীর এ নব বয়স
স্বর্গে গিয়ে প্রভু পাবে আবার ॥

৯

করিলাম পণ শুন হে রাজন
নাশিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ
নাহি যতক্ষণ কর আগমন,
না খাব কিছু, না করিব পান ।
জয় জয় বীর জয় পৃথ্বীরাজ,
লভ পূর্ণ জয় সমবেতে আজ
যুগে যুগে প্রভু ঘোষিবে এ কাজ
হর হর শম্ভো কর কল্যাণ ॥

১০

হর হর হর ! বম্ বম্ কালী !
বম্ বম্ বলি রাজার তুলালি,
করতালি দিল— দিল করতালি
রাজপুতপতি ফুল্ল হৃদয় ।
ডাকে বামা জয় জয় পৃথ্বীরাজ
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ—
জয় জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ
কর, দুর্গে, পৃথ্বীরাজের জয় ॥

১১

প্রসারিয়া রাজ মহা ভুজদ্বয়ে,
কমনীয় বপু, ধরিল হৃদয়ে,
পড়ে অশ্রুধারা চারি গণ্ড বয়ে,
চুম্বিল সুবাহু চন্দ্রবদনে।
স্মরি ইষ্টদেবে বাহিরিল বীর,
মহাগজপৃষ্ঠে শোভিল শরীর
মহিষীর চক্ষে বহে ঘন নীর !
কে জানে এতই জল নয়নে !

১২

লুটাইয়া পড়ি ধরণীর তলে
তবু চন্দ্রাননী জয় জয় বলে
জয় জয় বলে -- নয়নের জলে
জয় জয় কথা না পায় ঠাঁই !
কবি বলে মাতঃ মিছে গাও জয়
কাঁদ যতক্ষণ দেহে প্রাণ রয়,
এ কান্না রহিবে এ ভারতময়
আজিও আমরা কাঁদি সবাই ॥

৩। চিতারোহণ

১

কত দিন রাত পড়ে রহে রাণী
না খাইল অন্ন না খাইল পানি
কি হইল রণে কিছুই না জানি,
মুখে বলে পৃথ্বীরাজের জয়।
হেন কালে দূত আসিল দিল্লীতে
রোদন উঠিল পল্লীতে পল্লীতে—
কেহ নারে কারে ফুটিয়া বলিতে,
হায় হায় শব্দ ! ফাটে হৃদয় ॥

২

মহারবে যেন সাগর উছলে
উঠিল রোদন ভারতমণ্ডলে
ভারতের রবি গেল অস্তাচলে
প্রাণ ত গেলই, গেল যে মান।
আসিছে যবন সামাল সামাল!
আর যোদ্ধা নাই কে ধরিবে ঢাল?
পৃথ্বীরাজ বীরে হরিয়াছে কাল,
এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ॥

৩

ভূমিশয্যা ত্যজি উঠে চন্দ্রাননী,
সখীজনে ডাকি বলিল তখনি.
সম্মুখ সমরে বীরশিরোমণি
গিয়াছে চলিয়া অনন্ত স্বর্গে।
আমিও যাইব সেই স্বর্গপুরে,
বৈকুণ্ঠেতে গিয়া পূজিব প্রভুরে,
পুরাও রে সাধ; দুঃখ যাক দূরে
সাজা মোর চিতা সজনীবর্গে॥

৪

যে বীর পড়িল সম্মুখ সমরে
অনন্ত মহিমা তার চরাচরে
সে নহে বিজিত; অপ্সরে কিন্নরে,
গায়িছে তাহার অনন্ত জয়।
বল সখি সবে জয় জয় বল,
জয় জয় বলি চড়ি গিয়া চল
জলন্ত চিতার প্রচণ্ড অনল,
বল জয় পৃথ্বীরাজের জয়॥

৫

চন্দনের কাষ্ঠ এলো রাশি রাশি
কুসুমের হার যোগাইল দাসী
রতন ভূষণ কত পরে হাসি
বলে যাব আজি প্রভুর পাশে।
আয় আয় সখি, চড়ি চিতানলে
কি হবে রহিয়ে ভারতমণ্ডলে?
আয় আয় সখি যাইব সকলে
যথা প্রভু মোর বৈকুণ্ঠবাসে॥

৬

আরোহিলা চিতা কামিনীর দল
চন্দনের কাষ্ঠে জ্বলিল অনল
সুগন্ধে পূরিল গগনমণ্ডল—
মধুর মধুর সংযুক্তা হাসে।
বলে সবে বল পৃথ্বীরাজ জয়
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজ জয়
করি জয়ধ্বনি সঙ্গে সখীচয়
চলি গেলা সতী বৈকুণ্ঠবাসে॥

৭

কবি বলে মাতা কি ক.জ করিলে
সন্তানে ফেলিয়া নিজে পলাইলে,
এ চিতা অনল কেন বা জ্বালিলে,
ভারতের চিতা, পাঠান ডরে।
সেই চিতানল, দেখিল সকলে
আর না নিবিল ভারতমণ্ডলে
দহিল ভারত তেমনি অনলে
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে॥

আকাঙ্ক্ষা

(সুন্দরী

১

কেন না হইলি তুই, যমুনার জল,
রে প্রাণবল্লভ !
কিবা দিবা কিবা রাতি, কূলেতে আঁচল পাতি,
শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদুরব ॥
রে প্রাণবল্লভ !

২

কেন না হইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ,
মোর শ্যামধন !
দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি,
করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ॥
ওহে শ্যামধন !

৩

কেন না হইলি তুই, মলয় পবন,
ওহে ব্রজরাজ !
আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি,
নিশ্বাসে যাইতে মোর, হৃদয়ের মাঝ ॥
ওহে ব্রজরাজ !

৪

কেন না হইলি তুই. কাননকুসুম,
রাধাপ্রেমাধার !
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার ॥
মোর প্রাণাধার !

৫

কেন না হইলে তুমি, চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ !
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়নপথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥
আমার প্রাণেশ !

৬

কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন,
পীতাম্বর হরি !
নীলবাস তেয়াগিয়ে, তোমারে পরি কালিয়ে,
রাখিতাম যত্ন করে৷ হৃদয় উপরি ॥
পীতাম্বর হরি !

৭

কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর ।
ফিরাতেম আঁখি যথা, দেখিতে পেতেম তথা,
মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর ।
শ্যামল সুন্দর !

(সুন্দর)

১

কেন না হইনু আমি, কপালের দোষে,
যমুনার জল ।
লইয়া কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হাসিয়া ফুটিত আসি, রাধিকা-কমল—
যৌবনেতে ঢল ঢল ॥

২

কেন না হইনু আমি, তোমার তরঙ্গ,
তপননন্দিনি !
রাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়া হিল্লোল ছলে,
দোলাতাম দেহ তার, নবীন নলিনী—
যমুনাজলহংসিনী ॥

৩

কেন না হইনু আমি, তোর অনুরূপী,
মলয় পবন !
ভ্রমিতাম কুতূহলে, রাধার কুন্তল দলে,
কহিতাম কানে কানে, প্রণয় বচন—
সে আমার প্রাণধন ॥

৪

কেন না হইনু হায় ! কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ ।
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন যাতন—
মেখে শ্রীঅঙ্গচন্দন ॥

৫

কেন না হইনু আমি, চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরণ ।
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,
ভুলাতাম রাধারূপে, অন্যজনমন—
সব ভুলান কেমন ?

৬

কেন না হইনু আমি চিকণ বসন,
দেহ আবরণ ।
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঞ্চল হইয়ে দুলে, ছুঁতেম চরণ,—
চুম্বি ও চাঁদবদন ॥

৭

কেন না হইনু আমি, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর।
কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহা ভালবাসে,
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অন্তর—
প্রেম-সুখরত্নাকর ?

অধঃপতন সঙ্গীত

১

বাগানে যাবি রে ভাই ? চল সবে মিলে যাই,
যথা হর্ম্ম্য সুশোভন, সরোবরতীরে।
যথা ফুটে পাঁতি পাঁতি, গোলাব মল্লিকা জাঁতি,
বিগ্নোনিয়া লতা দোলে মৃদুল সমীরে॥
নারিকেল বৃক্ষরাজি, চাঁদের কিরণে সাজি,
নাচিছে দোলায়ে মাথা ঠমকে ঠমকে।
চন্দ্রকরলেখা তাহে, বিজলি চমকে॥

২

চল যথা কুঞ্জবনে, নাচিবে নাগরীগণে,
রাঙ্গা সাজ পেসোয়াজ, পরশিবে অঙ্গে।
তম্বুরা তবলা চাটি, আবেশে কাঁপিবে মাটি,
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, সুর দিবে সঙ্গে॥
খিনি খিনি খিনি খিনি, ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি
তাধিম্ তাধিম্ তেরে গাও না বাজনা।
চমকে চাহনি চারু, ঝলকে গহনা॥

৩

ঘরে আছে পদ্মমুখী কভু না করিল সুখী,
শুধু ভাল বাসা নিয়ে, কি হবে সংসারে।
নাহি জানে নৃত্যগীত, ইয়ারকিতে নাহি চিত,
একা বসি ভাল বাসা ভাল লাগে কারে ?

গৃহধর্ম্মে রাখে মন, স্থিত ভাবে অনুক্ষণ,
সে বিনা দুঃখের দিনে অন্য গতি নাই !
এ হেন সুখের দিনে, তারে নাহি চাই ॥

৪

আছে ধন গৃহপূর্ণ, যৌবন যাইবে তূর্ণ,
যদি না ভুঞ্জিনু সুখ, কি কাজ জীবনে ?
ঠুসে মদ্য লও সাতে, যেন না ফুরায় রাতে,
সুখের নিশান গাড় প্রমোদভবনে।
খাদ্য লও বাছা বাছা, দাড়ি দেখে লও চাচা,
চপ্ সুপ কারি কোর্ম্মা, করিবে বিচিত্র।
বাঙ্গালির দেহ রত্ন, ইহাতে করিও যত্ন,
সহস্র পাদুকা স্পর্শে, হয়েছে পবিত্র।
পেটে খায় পিঠে সয়, আমার চরিত্র ॥

৫

বন্দে মাতা সুরধুনি, কাগজে মহিমা শুনি
বোতলবাহিনি পুণ্যে একশ নন্দিনি !
করি ঢক ঢক নাদ, পুরাও ভকতসাধ,
লোহিতবরণি বামা, তারেতে বন্দিনি !
প্রণমামি মহানীরে, ছিপির কিরীটি শিরে,
উঠ শিরে ধীরে ধীরে যকৃৎজননি !
তোমার কৃপার জন্য, যেই পড়ে সেই ধন্য
শয্যায় পতিত রাখ, পতিতপাবনি !
বাক্‌স বাহনে চল, ভজন ভজনি ॥

৬

কি ছার সংসারে আছি, বিষয় অরণ্যে মাছি,
মিছা করি ভন্‌ভন্ চাকরি কাঁটালে।
মারে জুতা সই সুখে, লম্বা কথা বলি মুখে,
উচ্চ করি ঘুষ তুলি দেখিলে কাঙ্গালে ॥
শিখিয়াছি লেখা পড়া, ঠাণ্ডা দেখে হই কড়া,
কথা কই চড়া চড়া, ভিখারি ফকিরে।
দেখ ভাই রোখ কত, বাঙ্গালি শরীরে !

৭

পূর পাত্র মদ্য ঢালি, দাও সবে করতালি,
কেন তুমি দাও গালি, কি দোষ আমার ?
দেশের মঙ্গল চাও ? কিসে তার ত্রুটি পাও ?
লেক্‌চরে কাগজে বলি, কর দেশোদ্ধার ॥
ইংরেজের নিন্দা করি, আইনের দোষ ধরি,
সংবাদ পত্রিকা পড়ি, লিখি কভু তায়।
আর কি করিব বল স্বদেশের দায় ?

৮

করেছি ডিউটির কাজ, বাজা ভাই পাখোয়াজ
কামিনি, গোলাপি সাজ, ভাসি আজ রঙ্গে।
গেলাস পূরে দে মদে, দে দে দে আরো আরো দে,
দে দে এরে দে ওরে দে, ছড়ি দে সারঙ্গে।
কোথায় ফুলের মালা, আইস্ দে না ? ভাল জ্বালা,
"বংশী বাজায় চিকণ কালা ?" সুর দাও সঙ্গে।
ইন্দ্র স্বর্গে খায় সুধা, স্বর্গ ছাড়া কি বসুধা ?
কত স্বর্গ বাঙ্গালায় মদের তরঙ্গে।
টলমল বসুন্ধরা ভবানী ভ্রূভঙ্গে ॥

৯

যে ভাবে দেহের হিত, না বুঝি তাহার চিত,
আত্মহিত ছেড়ে কেবা, পরহিতে চলে ?
না জানি দেশ বা কার ? দেশে কার উপকার ?
আমার কি লাভ বল, দেশ ভাল হলে ?
আপনার হিত করি, এত শক্তি নাহি ধরি,
দেশহিত করিব কি, একা ক্ষুদ্র প্রাণী।
ঢাল মদ ! তামাক দে ! লাও ব্রাণ্ডি পানি ॥

১০

মনুষ্যত্ব ? কাকে বলে ? স্পিচ দিই টৌনহলে,
লোকে আসে দলে দলে, শুনে পায় প্রীত।

নাটক নবেল কত, লিখিয়াছে শত শত,
এ কি নয় মনুষ্যত্ব ? নয় দেশহিত ?
ইংরেজি বাঙ্গালা ফেঁদে, পলিটিক্স লিখি কেঁদে,
পদ্য লিখি নানা ছাঁদে, বেচি সস্তা দরে ।
অশিষ্টে অথবা শিষ্টে, গালি দিই অষ্টে পৃষ্ঠে,
তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে ?
নিপাত যাউক দেশ ! দেখি বসে ঘরে ॥

১১

হাঁ ! চামেলি ফুলিচম্পা ! মধুর অধর কম্পা !
হাম্বীর কেদার ছায়ানট সুমধুর !
হুক্কা না দুরন্ত বোলে ! শের মে ফুল না ডোলে !
পিয়ালা ভর দে মুঝে ! রঙ্ ভরপুর !
সুপ্, চপ্, কটলেট, আন বাবা প্লেট প্লেট,
কুক্ বেটা কাপ্তেন, যত পার খাও !
মাথামুণ্ড পেটে দিয়ে, পড় বাপু জমি নিয়ে,
জননি বাঙ্গালিকুলে, সুখ করো যাও ।
পতিতপাবনি সুরে, পতিতে তরাও ॥

১২

যাব ভাই অধঃপাতে, কে যাইবি আয় সাতে,
কি কাজ বাঙ্গালি নাম, রেখে ভূমণ্ডলে ?
লেখাপড়া ভস্ম ছাই, কে কবে শিখেছে ভাই
লইয়া বাঙ্গালি দেহ, এই বঙ্গস্থলে ?
হংসপুচ্ছ লয়ে করে, কেরাণির কাজ করে,
মুন্সেফ চাপরাশি আর ডিপুটী পিয়াদা ।
অথবা স্বাধীন হয়ে, ওকালতি পাশ লয়ে,
খোবামুদি জুয়াচুরি, শিখিছে জিয়াদা !
সার কথা বলি ভাই, বাঙ্গালিতে কাজ নাই,
কি কাজ সাধিব মোরা, এ সংসারে থাকি,

মনোবৃত্তি আছে যাহা, ইন্দ্রিয় সাগরে তাহা
বিসর্জ্জন করিয়াছি, কিবা আছে বাকি ?
কেন দেহভার বয়ে, যমে দাও ফাঁকি ?

১৩

ধর তবে গ্লাস আঁটি, জ্বলন্ত বিষের বাটি
শুন তবলার চাঁটি, বাজে থন্ থন্ ।
নাচে বিবি নানা ছন্দ, সুন্দর খামিরা গন্ধ,
গম্ভীর জীমূতমন্দ্র হুঁকার গর্জ্জন ॥
সেজে এসো সবে ভাই, চল অধঃপাতে যাই,
অধম বাঙ্গালি হতে, হবে কোন কাজ ?
ধরিতে মনুষ্যদেহ, নাহি করে লাজ ?

১৪

মর্কটের অবতার, রূপগুণ সব তার
বাঙ্গালির অধিকার, বাঙ্গালি ভূষণ !
হা ধরণি, কোন পাপে, কোন বিধাতার শাপে
হেন পুত্রগণ গর্ভ্রে, করিলে ধারণ ?
বঙ্গদেশ ডুবাবারে, মেঘে কিম্বা পারাবারে,
ছিল না কি জলরাশি ? কে শোষিল নীরে ?
আপনা ধ্বংসিতে রাগে কতই শকতি লাগে ?
নাহি কি শকতি তত বাঙ্গালি শরীরে ?
কেন আর জ্বলে আলো বঙ্গের মন্দিরে ?

১৫

মরিবে না ? এসো তবে, উন্নতি সাধিয়া সবে,
লভি নাম পৃথিবীতে, পিতৃ সমতুল !
ছাড়ি দেহ খেলা ধূলা, ভাঙ বাদ্যভাণ্ডগুলা
মারি খেদাইয়া দাও, নর্ত্তকীর কুল !
মারিয়া লাঠির বাড়ি, বোতল ভাঙ্গহ পাড়ি,
বাগান ভাঙ্গিয়া ফেল পুকুরের তলে ।

সুখ নামে দিয়ে ছাই, দুঃখ সার কর ভাই,
কভু না মুছিবে কেহ, নয়নের জলে,
যত দিন বাঙ্গালিকে লোকে ছি ছি বলে ॥

সাবিত্রী

১

তমিস্রা রজনী ব্যাপিল ধরণী,
দেখি মনে মনে পরমাদ গণি,
বনে একাকিনী বসিলা রমণী
কোলেতে করিয়া স্বামীর দেহ।
আঁধার গগন ভুবন আঁধার,
অন্ধকার গিরি বিকট আকার,
দুর্গম কান্তার ঘোর অন্ধকার,
চলে না ফেরে না নড়ে না কেহ ॥

২

কে শুনেছে সেথা মানবের রব?
কেবল গরজে হিংস্র পশু সব,
কখন খসিছে বৃক্ষের পল্লব,
কখন বসিছে পাখী শাখায়।
ভয়েতে সুন্দরী বনে একেশ্বরী,
কোলে আরও টানে পতিদেহ ধরি,
পরশে অধর অনুভব করি,
নীরবে কাঁদিয়া চুম্বিছে তায় ॥

৩

হেরে আচম্বিতে এ ঘোর সঙ্কটে,
ভয়ঙ্কর ছায়া আকাশের পটে,
ছিল যত তারা তাহার নিকটে
ক্রমে ম্লান হয়ে গেল নিবিয়া।

সে ছায়া পশিল কাননে,— অমনি,
পলায় শ্বাপদ উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষশাখা কত ভাঙ্গিল আপনি,
সতী ধরে শবে বুকে আঁটিয়া ॥

৪

সহসা উজলি ঘোর বনস্থলী,
মহাগদাপ্রভা, যেন বা বিজলি,
দেখিলা সাবিত্রী যেন রত্নাবলী,
ভাসিল নিঝরে আলোক তার।
মহাগদা দেখি প্রণমিলা সতী,
জানিল কৃতান্ত পরলোকপতি,
এ ভীষণ ছায়া তাঁহারই মুরতি,
ভাগ্যে যাহা থাকে হবে এবার ॥

৫

গভীর নিস্বনে কহিলা শমন,
থর থর করি কাঁপিল গহন,
পর্ব্বতগহ্বরে ধ্বনিল বচন,
চমকিল পশু বিবর মাঝে।
"কেন একাকিনী মানবনন্দিনী,
শব লয়ে কোলে যাপিছ যামিনী,
ছাড়ি দেহ শবে ; তুমি ত অধীনী,
মম সঙ্গে তব বাদ কি সাজে ॥

৬

"এ সংসারে কাল বিরামবিহীন,
নিয়মের রথে ফিরে রাত্রি দিন,
যাহারে পরশে সে মম অধীন,
স্থাবর জঙ্গম জীব সবাই।

সত্যবানে আসি কাল পরশিল,
লতে তারে মম কিঙ্কর আসিল,
সাধ্বী অঙ্গ ছুঁয়ে লইতে নারিল,
আপনি লইতে এসেছি তাই ॥"

৭

সব হলো বৃথা না শুনিল কথা,
না ছাড়ে সাবিত্রী শবের মমতা,
নারে পরশিতে সাধ্বী পতিব্রতা,
অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মের পতি ।
তখন কৃতান্ত কহে আর বার,
"অনিত্য জানিও এ ছার সংসার,
স্বামী পুত্র বন্ধু নহে কেহ কার,
আমার আলয়ে সবার গতি ॥

৮

"রত্নছত্র শিরে রত্নভূষা অঙ্গে,
রত্নাসনে বসি মহিষীর সঙ্গে,
ভাসে মহারাজা সুখের তরঙ্গে,
আঁধারিয়া রাজ্য লই তাহারে ।
বীরদর্প ভাঙ্গি লই মহাবীরে,
রূপ নষ্ট করি লই রূপসীরে,
জ্ঞান লোপ করি গরাসি জ্ঞানীরে,
সুখ আছে শুধু মম আগারে ॥

৯

"অনিত্য সংসার পুণ্য কর সার,
কর নিজ কর্ম্ম নিয়ত যে যার,
দেহান্তে সবার হইবে বিচার,
দিই আমি সবে করমফল ।

যত দিন সতী তব আয়ু আছে,
করি পুণ্য কর্ম্ম এসো স্বামী পাছে—
অনন্ত যুগান্ত রবে কাছে কাছে,
ভুঞ্জিবে অনন্ত মহা মঙ্গল ॥

১০

"অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন,
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত মিলন,
অনন্ত সৌন্দর্য্যে হয় অনন্ত দর্শন,
অনন্ত বাসনা, তৃপ্তি অনন্ত।
দম্পতি আছয়ে, নাহি বৈধব্য ঘটনা,
মিলন আছয়ে, নাহি বিচ্ছেদযন্ত্রণা,
প্রণয় আছয়ে, নাহি কলঙ্ক গঞ্জনা,
রূপ আছে নাহি রিপু দুরন্ত ॥

১১

"রবি তথা আলো করে, না করে দাহন,
নিশি স্নিগ্ধকরী, নহে তিমির কারণ,
মৃদু গন্ধবহ ভিন্ন নাহিক পবন,
কলা নাহি চাঁদে, নাহি কলঙ্ক।
নাহিক কণ্টক তথা কুসুম রতনে,
নাহিক তরঙ্গ স্বচ্ছ কল্লোলিনীগণে,
নাহিক অশনি তথা সুবর্ণের ঘনে,
পঙ্কজ সরসে নাহিক পঙ্ক ॥

১২

"নাহি তথা মায়াবশে বৃথায় রোদন,
নাহি তথা ভ্রান্তিবশে বৃথায় মনন,
নাহি তথা রিপুবশে বৃথায় যতন,
নাহি শ্রমলেশ, নাহি অলস।

ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা নিদ্রা শরীরে না রয়,
নারী তথা প্রণয়িনী বিলাসিনী নয়,
দেবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয়,
দিব্য নেত্রে নিরখে দিক্ দশ ॥

১৩

"জগতে জগতে দেখে পরমাণুরাশি,
মিলিছে ভাঙ্গিছে পুনঃ ঘুরিতেছে আসি,
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব গড়ি ফেলিছে বিনাশি,
অচিন্ত্য অনন্ত কালতরঙ্গে।
দেখে লক্ষ কোটী ভানু অনন্ত গগনে,
বেড়ি তাহে কোটী কোটী ফিরে গ্রহগণে,
অনন্ত বর্ত্তন রব শুনিছে শ্রবণে,
মাতিছে চিত্ত সে গীতের সঙ্গে ॥

১৪

"দেখে কর্ম্মক্ষেত্রে নর কত দলে দলে
নিয়মের জালে বাঁধা ঘুরিছে সকলে,
ভ্রমে পিপীলিকা যেন নেমীর মণ্ডলে,
নির্দ্দিষ্ট দূরতা লঙ্ঘিতে নারে।
ক্ষণকাল তরে সবে ভবে দেখা দিয়া,
জলে যেন জলবিম্ব যেতেছে মিশিয়া,
পুণ্যবলে পুণ্যধামে মিলেছে আসিয়া,
পুণ্যই সত্য অসত্য সংসারে ॥

"তাই বলি কন্যে, ছাড়ি দেহ মায়া,
ত্যজ বৃথা ক্ষোভ ; ত্যজ পতিকায়া,
ধর্ম্ম আচরণে হও তার জায়া,
গিয়া পুণ্যধাম।

গৃহে যাও ত্যজি কানন বিশাল,
থাক যত দিন না পরশে কাল,
কালের পরশে মিটিবে জঞ্জাল,
সিদ্ধ হবে কাম ॥"

১৬

শুনি যমবাণী জোড় করি পাণি,
ছাড়ি দিয়া শবে, তুলি মুখখানি,
ডাকিছে সাবিত্রী ;—"কোথায় না জানি,
কোথা ওহে কাল !
দেখা দিয়া রাখ এ দাসীর প্রাণ
কোথা গেলে পাব কালের সন্ধান,
পরশিয়ে কর এ সঙ্কটে ত্রাণ,
মিটাও জঞ্জাল ॥

১৭

"স্বামিপদ যদি সেবে থাকি আমি,
কায় মনে যদি পূজে থাকি স্বামী,
যদি থাকে বিশ্বে কেহ অন্তর্য্যামী,
রাখ মোর কথা।
সতীত্বে যত্তপি থাকে পুণ্যফল,
সতীত্বে যত্তপি থাকে কোন বল,
পরশি আমারে, দিয়ে পদে স্থল,
জুড়াও এ ব্যথা ॥"

১৮

নিয়মের রথ ঘোষিল ভীষণ,
আসি প্রবেশিল সে ভীম কানন,
পরশিল কাল সতীত্ব রতন,
সাবিত্রী সুন্দরী।

মহাগদা তবে চমকে তিমিরে,
শবপদরেণু তুলি লয়ে শিরে,
ত্যজে প্রাণ সতী অতি ধীরে ধীরে
পতি কোলে করি ॥

১৯

বরষিল পুষ্প অমরের দলে,
সুগন্ধি পবন বহিল ভূতলে,
তুলিল কৃতান্ত শরীরিযুগলে,
বিচিত্র বিমানে।
জনমিল তথা দিব্য তরুবর,
সুগন্ধি কুসুমে শোভে নিরন্তর,
বেড়িল তাহাতে লতা মনোহর,
সে বিজন স্থানে ॥

আদর

১

মরুভূমি মাঝে যেন, একই কুসুম,
পূর্ণিত সুবাসে।
বরষার রাতে যেন, একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে ॥
নিদাঘ সন্তাপে যেন, একই সরসী,
বিশাল প্রান্তরে।
রতন শোভিত যেন, একই তরণী,
অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমার তুমি, প্রিয়ে, সংসার-ভিতরে ॥

২

চিরদরিদ্রের যেন, একটি রতন,
অমূল্য, অতুল।
চিরবিরহীর যেন, দিনেক মিলন,
বিধি অনুকূল॥
চিরবিদেশীর যেন, একই বান্ধব,
স্বদেশ হইতে।
চিরবিধবার যেন, একই স্বপন,
পতির পীরিতে।
তেমনি আমার তুমি, প্রাণাধিকে, এ মহীতে॥

৩

সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সন্তাপে,
রম্য বৃক্ষতলে।
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র,
বরষার জলে॥
বসন্তের ফুল তুমি, তিরপিত আঁখি,
রূপের প্রকাশে।
শরতের চাঁদ তুমি, চাঁদবদনি লো,
আমার আকাশে।
কৌমুদীমধুর হাসি, দুখের তিমির নাশে॥

৪

অঙ্গের চন্দন তুমি, পাখার ব্যজন,
কুসুমের বাস।
নয়নের তারা তুমি, শ্রবণেতে শ্রুতি,
দেহের নিশ্বাস॥
মনের আনন্দ তুমি, নিদ্রার স্বপন,
জাগ্রতে বাসনা।
সংসারে সহায় তুমি, সংসার-বন্ধন
বিপদে সান্ত্বনা।
তোমারি লাগিয়ে সই, ঘোর সংসার যাতনা॥

বায়ু

১

জন্ম মম সূর্য্য-তেজে, আকাশ মণ্ডলে।
যথা ডাকে মেঘরাশি,
হাসিয়া বিকট হাসি,
বিজলি উজ্জ্বলে॥
কেবা মম সম বলে,
হুহুঙ্কার করি যবে, নামি রণস্থলে।
কানন ফেলি উপাড়ি,
গুঁড়াইয়া ফেলি বাড়ী,
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পাড়ি,
অটল অচলে।
হাহাকার শব্দ তুলি এ সুখ অবনীতলে॥

২

পর্ব্বতশিখরে নাচি, বিষম তরসে,
মাতিয়া মেঘের সনে,
পিঠে করি বহি ঘনে,
সে ঘন বরষে।
হাসে দামিনী সে রসে।
মহাশব্দে ক্রীড়া করি, সাগর উরসে॥
মথিয়া অনন্ত জলে,
সফেন তরঙ্গদলে,
ভাঙ্গি তুলে নভস্তলে,
ব্যাপি দিগ্‌দশে।
শীকরে আঁধারি জগৎ, ভাসাই দেশ অলসে॥

৩

বসন্তে নবীন লতা, ফুল দোলে তায়।
যেন বায়ু সে বা নহি,
আঁতে মৃদু মৃদু বহি,
প্রবেশি তথায়॥

হেসে মরি যে লজ্জায়—
পুষ্পগন্ধ চুরি করি, মাখি নিজ গায় ॥
সরোবরে স্নান করি,
যাই যথায় সুন্দরী,
বসে বাতায়নোপরি,
গ্রীষ্মের জ্বালায় ॥
তাহার অলকা ধরি,
মুখ চুম্বি ঘর্ম্ম হরি.
অঞ্চল চঞ্চল করি,
স্নিগ্ধ করি কায় ॥
আমার সমান কেবা যুবতীমন ভুলায় ?

৪

বেণুখণ্ড মধ্যে থাকি, বাজাই বাঁশরী ।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাই আসি,
আমিই মোহন বাঁশী,
সুরের লহরী ॥
আর কার গুণে হরি,
ভুলাইত বৃন্দাবনে, বৃন্দাবনেশ্বরী ?
চল চল চল চল,
চঞ্চল যমুনা জল,
নিশীথ ফুলে উজল,
কানন বল্লরী.
তার মাঝে বাজিতাম বংশীনাদ রূপ ধরি ॥

৫

জীবকণ্ঠে যাই আসি, আমি কণ্ঠস্বর !
আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী,
মহীর ভিতর ॥

সিংহের কণ্ঠেতে আমিই হুঙ্কার
ঋষির কণ্ঠেতে আমিই ওঙ্কার,
গায়ককণ্ঠেতে আমিই ঝঙ্কার,
বিশ্ব-মনোহর ॥
আমিই রাগিণী আমি ছয় রাগ,
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ,
মম রূপান্তর ॥
গুণ গুণ রবে ভ্রময়ে ভ্রমর,
কোকিল কুহরে বৃক্ষের উপর,
কলহংস নাদে সরসী ভিতর,
আমারি কিঙ্কর ॥
আমি হাসি আমি কান্না, স্বররূপে শাসি নর ॥

৬

কে বাঁচিত এ সংসারে, আমার বিহনে ?
আমি না থাকিলে ভুবনে ?
আমিই জীবের প্রাণ,
দেহে করি অধিষ্ঠান,
নিশ্বাস বহনে ।
উড়াই খগে গগনে ।*
দেশে দেশে লয়ে যাই, বহ্নি যত ঘনে ।
আনিয়া সাগরনীরে,
ঢালে তারা গিরিশিরে,
সিক্ত করি পৃথিবীরে,
বেড়ায় গগনে ।
মম সম দোষে গুণে, দেখেছ কি কোন জনে ?

* Vide Reign of Law, by Duke of Argyll, Chap. VII. Flight of Birds.

৭

মহাবীর দেব অগ্নি জ্বালি সে অনলে।
আমিই জ্বালাই যারে,
আমিই নিবাই তাঁরে,
আপনার বলে।
মহাবলে বলী আমি, মন্থন করি সাগর।
রসে সুরসিক আমি, কুসুমকুলনাগর॥
শিহরে পরশে মম কুলের কামিনী।
মজাইনু বাঁশী হয়ে, গোপের গোপিনী॥
বাক্যরূপে জ্ঞান আমি স্বররূপে গীত।
আমারি কৃপায় রাক্ত ভক্তি দম্ভ প্রীত॥
প্রাণবায়ুরূপে আমি রক্ষা করি জীবগণ।
হুহু হুহু! মম সম গুণবান্ আছে কোন জন?

আকবর শাহের খোষ রোজ

১

রাজপুরী মাঝে কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার, রসের হাট।
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণীরূপের হাট॥
বিশালা সে পুরী নবমীর চাঁদ,
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
খরিদ্দার ডাকে, হাসিয়া ছলে॥
ফুলের তোরণ, ফুল আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান, ফুলের নিশান,
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥

লহরে লহরে ছুটিছে গোলাব,
উঠিছে ফুয়ারা জ্বলিছে জল।
তাধিনি তাধিনি নাচিতেছে নটী,
গায়িছে মধুর গায়িকা দল॥

রাজপুরী মাঝে লেগেছে বাজার,
বড় গুলজার সরস ঠাট।
রমণীতে বেচে রমণীতে কিনে
লেগেছে রমণীরূপের হাট॥

কত বা সুন্দরী, রাজার দুলালী,
ওমরাহজায়া, আমীরজাদী।
নয়নেতে জ্বালা, অধরেতে হাসি,
অঙ্গেতে ভূষণ মধুর-নাদী॥

হীরা মতি চুণি বসন ভূষণ
কেহ বা বেচিছে কেনে বা কেউ।
কেহ বেচে কথা নয়ন ঠারিয়ে
কেহ কিনে হাসি রসের ঢেউ॥

কেহ বলে সখি এ রতন বেচি
হেন মহাজন এখানে কই?
সুপুরুষ পেলে আপনা বেচিয়ে
বিনামূলে কেনা হইয়া রই॥

কেহ বলে সখি পুরুষ দরিদ্র
কি দিয়ে কিনিবে রমণীমণি।
চারি কড়া দিয়ে পুরুষ কিনিয়ে
গৃহেতে বাঁধিয়ে রেখ লো ধনি॥

পিঞ্জরেতে পুরি, খেতে দিও ছোলা,
সোহাগ শিকলি বাঁধিও পায়।
অবোধ বিহঙ্গ পড়িবে আদিক
তালি দিয়ে ধনি, নাচায়ো তায়॥

১

এক চন্দ্রাননী, মরাল-গামিনী,
সে রসের হাটে ভ্রমিছে একা।
কিছু নাহি বেচে কিছু নাহি কিনে,
কাহার(ও) সহিত না করে দেখা॥
প্রভাত-নক্ষত্র জিনিয়া রূপসী,
দিশাহারা যেন বাজারে ফিরে।
কাণ্ডারী বিহনে তরণী যেন বা
ভাসিয়া বেড়ায় সাগরনীরে॥
রাজার দুলালী রাজপুতবালা
চিতোরসম্ভবা কমলকলি।
পতির আদেশে আসিয়াছে হেথা,
সুখের বাজার দেখিবে বলি॥
দেখে শুনে বামা সুখী না হইল—
বলে ছি ছি এ কি লেগেছে ঠাট।
কুলনারীগণে, বিকাইতে লাজ
বসিয়াছে কেঁদে রসের হাট!
ফিরে যাই ঘরে কি করিব একা
এ রঙ্গসাগরে সাঁতার দিয়ে?
এত বলি সতী ধীরি ধীরি ধীরি
নির্গমের দ্বারে গেল চলিয়ে॥
নির্গমের পথ অতি সে কুটিল,
পেঁচে পেঁচে ফিরে, না পায় দিশে।
হায় কি করিনু বলিয়ে কাঁদিল,
এখন বাহির হইব কিসে?
না জানি বাদশা কি কল করিল
ধরিতে পিঞ্জরে, কুলের নারী।
না পায় ফিরিতে নারে বাহিরিতে
নয়নকমলে বহিল বারি॥

৬

সহসা দেখিল সমুখে সুন্দরী
বিশাল উরস পুরুষ যার।
রতনের মালা দুলিতেছে গলে
মাথায় রতন জ্বলিছে স্থির॥
যোড় করি কর, তারে বিনোদিনী
বলে মহাশয় কর গো ত্রাণ।
না পাই যে পথ পড়েছি বিপদে
দেখাইয়ে পথ, রাখ হে প্রাণ॥
বলে সে পুরুষ অমিয় বচনে
আহা মরি, হেন না দেখি রূপ।
এসো এসো ধনি আমার সঙ্গেতে
আমি আকব্বর—ভারত-ভূপ॥
সহস্র রমণী রাজার দুলালী
মম আজ্ঞাকারী, চরণ সেবে।
তোমা সমা রূপে নহে কোন জন,
তব আজ্ঞাকারী আমি হে এবে॥
চল চল ধনি আমার মন্দিরে
আজি খোষ রোজ সুখের দিন।
এ ভারত ভূমে কি আছে কামনা
বলিও আমারে, শোধিব ঋণ॥

এত বলি তবে রাজরাজপতি
বলে মোহিনীরে ধরিল করে।
যূথপতি বল সে ভুজবিটপে
টুটিল কঙ্কণ তাহার ভরে॥
শুকাল বামার বদন-নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও জননি।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে॥

ডাকে কালি কালি ভৈরবি করালি
কৌষিকি কপালি কর মা ত্রাণ।
অপর্ণে অম্বিকে চামুণ্ডে চণ্ডিকে
বিপদে বালিকে হারায় প্রাণ॥
মানুষের সাধ্য নহে গো জননি
এ ঘোর বিপদে রক্ষিতে লাজ।
সমর-রঙ্গিণি অসুর-ঘাতিনি
এ অসুরে নাশি, বাঁচাও আজ॥

৪

বহুল পুণ্যেতে অনন্ত শূন্যেতে
দেখিল রমণী, জ্বলিছে আলো।
হাসিছে রূপসী নবীনা ষোড়শী
মৃগেন্দ্র বাহনে, মুরতি কালো॥
নরমুণ্ডমালা দুলিছে উরসে
বিজলি ঝলসে লোচন তিনে।
দেখা দিয়া মাতা দিতেছে অভয়
দেবতা সহায় সহায়হীনে॥
আকাশের পটে নগেন্দ্র-নন্দিনী
দেখিয়া যুবতী প্রফুল্ল মুখ।
হৃদি সরোবর পুলকে উছলে
সাহসে ভরিল, নারীর বুক॥
তুলিয়া মস্তক গ্রীবা হেলাইল
দাঁড়াইল ধনী ভীষণ রাগে।
নয়নে অনল অধরেতে ঘৃণা
বলিতে লাগিল নৃপের আগে॥
ছিছি ছিছি ছিছি তুমি হে সম্রাট্,
এই কি তোমার রাজধরম।
কুলবধূ ছলে গৃহেতে আনিয়া
বলে ধর তারে নাহি শরম॥

বহু রাজ্য তুমি বলেতে লুটিলে,
বহু বীর নাশি বলাও বীর।
বীরপণা আজি দেখাতে এসেছ
রমণীর চক্ষে বহায়ে নীর ?
পরবাহুবলে পররাজ্য হর,
পরনারী হর করিয়ে চুরি।
আজি নারী হাতে হারাবে জীবন
ঘুচাইব যশ মারিয়ে ছুরি॥
জয়মল্ল বীরে ছলেতে বধিলে
ছলেতে লুটিলে চারু চিতোর।
নারীপদাঘাতে আজি ঘুচাইব
তব বীরপণা, ধরম চোর!
এত বলি বামা হাত ছাড়াইল
বলেতে ধরিল রাজার অসি।
কাড়িয়া লইয়া, অসি ঘুরাইয়া,
মারিতে তুলিল, নবরূপসী॥
ধন্য ধন্য বলি রাজা বাখানিল
এমন কখন দেখিনে নারী।
মানিতেছি ঘাট ধন্য সতী তুমি
রাখ তরবারি : মানিনু হারি॥

৫

হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি,
বলে মহারাজ, এ বড় রস।
রমণীর রণে হারি মান তুমি
পৃথিবীপতির বাড়িল যশ॥
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল,
হাসে খল খল, ঈষৎ হেসে।
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে ?

পৃথিবীতে যারে, তুমি দাও প্রাণ,
সেই প্রাণে বাঁচে, বলে হে সবে।
আজি পৃথ্বীনাথ আমার চরণে
প্রাণ ভিক্ষা লও, বাঁচিবে তবে ॥
যোড়ো হাত দুটো, দাঁতে কর কুটো
করহ শপথ ভারতপ্রভু।
শপথ করহ হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু ॥
তুমি না করিবে, রাজ্যেতে না দিবে
হইতে কখন এ হেন দোষ।
হিন্দুললনারে যে দিবে লাঞ্ছনা
তাহার উপরে করিবে রোষ ॥
শপথ করিল, পরশিয়ে অসি,
নারী আজ্ঞামত ভারতপ্রভু।
আমার রাজ্যেতে হিন্দুললনার
হেন অপমান না হবে কভু ॥
বলে শুন ধনি হইয়াছি প্রীত
দেখিয়া তোমার সাহস বল।
যাহা ইচ্ছা তব মাগি লও সতি,
পুরাব বাসনা, ছাড়িয়া ছল ॥
এই তরবারি দিনু হে তোমারে
হীরক-খচিত ইহার কোষ।
বীরবালা তুমি তোমার সে যোগ্য
না রাখিও মনে আমার দোষ ॥
আজি হতে তোমা ভগিনী বলিনু,
ভাই তব আমি ভাবিও মনে।
যা থাকে বাসনা মাগি লও বর
যা চাহিবে তাই দিব এখনে ॥

তুষ্ট হয়ে সতী বলে ভাই তুমি
সম্প্রীত হইনু তোমার ভাষে।
ভিক্ষা যদি দিবা দেখাইয়া দাও
নির্গমের পথ, যাইব বাসে॥
দেখাইল পথ, আপনি রাজন্
বাহিরিল সতী, সে পুরী হতে।
সবে বল জয়, হিন্দুকন্যা জয়,
হিন্দুমতি থাক্ ধর্ম্মের পথে॥

৬

রাজপুরী মাঝে, কি সুন্দর আজি
বসেছে বাজার রসের হাট।
রমণীতে কেনে রমণীতে বেচে
লেগেছে রমণীরূপের হাট॥
ফুলের তোরণ ফুল আবরণ
ফুলের স্তম্ভেতে ফুলের মালা।
ফুলের দোকান ফুলের নিশান
ফুলের বিছানা ফুলের ডালা॥
নবমীর চাঁদ বরষে চন্দ্রিকা
লাখে লাখে দীপ উজলি জ্বলে।
দোকানে দোকানে কুলবালাগণে
ঝলসে কটাক্ষ হাসিয়া ছলে॥
এ হতে সুন্দর, রমণী-ধরম,
আর্য্যনারীধর্ম্ম, সতীত্ব ব্রত।
জয় আর্য্য নামে আজ(ও) আর্য্যধামে
আর্য্যধর্ম্ম রাখে রমণী যত॥
জয় আর্য্যকন্যা এ ভুবনে ধন্যা,
ভারতের আলো, ঘোর আঁধারে।
হায় কি কারণে, আর্য্যপুত্রগণে
আর্য্যের ধরম রাখিতে নারে॥

মন এবং সুখ

১

এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে,
শোন লো মধুর বাঁশী।
এই মধু বনে, শ্রীমধুসূদনে,
দেখ লো সকলে আসি॥
মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর ভাবে।
মধুর আদরে, মধুর অধরে,
মধুর মধুর হাসে॥
মধুর শ্যামল, বদন কমল,
মধুর চাহনি তায়।
কনক নূপুর, মধুকর যেন,
মধুর বাজিছে পায়॥
মধুর ইঙ্গিতে, আমার সঙ্গেতে,
কহিল মধুর বাণী।
সে অবধি চিতে, মাধুরি হেরিতে,
ধৈরয নাহিক মানি॥
এ সুখ রঙ্গেতে পর লো অঙ্গেতে
মধুর চিক্কণ বাস।
তুলি মধুফুল, পর কানে দুল,
পুরাও মনের আশ॥
গাঁথি মধুমালা, পর গোপবালা
হাস লো মধুর হাসি।
চল যথা বাজে, যমুনার কূলে,
শ্যামের মোহন বাঁশী॥

২

চল যথা বাজে, যমুনার কূলে
ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশী।
ধীরে ধীরে যথা, উঠিছে চাঁদনি,
স্থল জল পরকাশি॥
ধীরে ধীরে রাই, চল ধীরে যাই,
ধীরে ধীরে ফেল পদ।
ধীরে ধীরে শুন, নাদিছে যমুনা,
কল কল গদ গদ॥
ধীরে ধীরে জলে, রাজহংস চলে,
ধীরে ধীরে ভাসে ফুল।
ধীরে ধীরে বায়ু, বহিছে কাননে,
দোলায়ে আমার দুল॥
ধীরে যাবি তথা, ধীরে কবি কথা,
রাখিবি দোহার মান।
ধীরে ধীরে তার বাঁশীটি কাড়িবি,
ধীরেতে পুরিবি তান॥
ধীরে শ্যাম নাম, বাঁশীতে বলিবি,
শুনিব কেমন বাজে।
ধীরে ধীরে চূড়া কাড়িয়ে পরিবি,
দেখিব কেমন সাজে॥
ধীরে বনমালা, গলাতে দোলাবি,
দেখিব কেমন দোলে।
ধীরে ধীরে তার, মন করি চুরি,
লইয়া আসিবি চলে॥

৩

শুন মোর মন মধুরে মধুরে,
জীবন করহ সায়।
ধীরে ধীরে ধীরে, সরল সুপথে,
নিজ গতি রেখ তায়॥

এ সংসার ব্রজ, কৃষ্ণ তাহে সুখ,
মন তুমি ব্রজনারী।
নিতি নিতি তার, বংশীরব শুনি,
হতে চাও অভিসারী॥
যাও যাবে মন, কিন্তু দেখ যেন,
একাকী যেও না রঙ্গে।
মাধুর্য্য ধৈরয, সহচরী দুই,
রেখ আপনার সঙ্গে॥
ধীরে ধীরে ধীরে, কাল নদীতীরে,
ধরম কদম্ব তলে।
মধুর সুন্দর, সুখ নটবর,
ভজ মন কুতূহলে॥

জলে ফুল

১

কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি!
বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিলে কোন্ বনে
নাচিতে পবন সনে, কোন্ বৃক্ষোপরি?
কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী?

২

কে আনিল তোরে ফুল, তরঙ্গিণী-তীরে?
কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডালা,
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে?
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে!

৩

ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে তারা।
কিম্বা কাদম্বিনী-গায়, যেন বিহঙ্গিনী প্রায়,
কিম্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা;
কোথায় চলেছ ধরি, তরঙ্গিণীধারা?

৪

একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে !
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি,
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতূহলে ?
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল নদীজলে !

৫

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে !
কাল স্রোতে তোর(ই) মত, ভাসি আমি অবিরত,
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে !

৬

শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল ।
বোঁটা ছিঁড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি স্রোতে পড়ে,
আশার আবর্ত্ত বেড়ে, নাহি পাই কূল ।
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল ।

৭

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে ।
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,
অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে ।
চল যাই দুই জনে অনন্ত উদ্দেশে ।

ভাই ভাই

(সমবেত বাঙ্গালিদিগের সভা দেখিয়া)

১

এক বঙ্গভূমে জনম সবার,
এক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের সঞ্চার,
এক দুঃখে সবে করি হাহাকার,
ভাই ভাই সবে, কাঁদ রে ভাই।
এক শোকে শীর্ণ সবার শরীর,
এক শোকে বয় নয়নের নীর,
এক অপমানে সবে নতশির,
অধম বাঙ্গালি মোরা সবাই॥

২

নাহি ইতিবৃত্ত নাহিক গৌরব,
নাহি আশা কিছু নাহিক বৈভব,
বাঙ্গালির নামে করে ছিছি রব,
কোমল স্বভাব, কোমল দেহ।
কোমল করেতে ধর কমলিনী,
কোমল শয্যাতে, কোমল শিঞ্জিনী,
কোমল শরীর, কোমল যামিনী,
কোমল পিরীতি, কোমল স্নেহ॥

৩

শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকার!
"ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!" সার
দেহি দেহি দেহ বল বার বার
না পেলে গালি দাও মিছামিছি।
দানের অযোগ্য চাও তবু দান,
মানের অযোগ্য চাও তবু মান,
বাঁচিতে অযোগ্য রাখ তবু প্রাণ,
ছিছি ছিছি ছিছি! ছি ছি ছি ছি ছি!

৪

কার উপকার করেছ সংসারে ?
কোন্ ইতিহাসে তব নাম করে ?
কোন্ বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালির ঘরে ?
কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয় ?
কোন্ রাজ্য তুমি শাসিয়াছ ভাল ?
কোন্ মারাথনে ধরিয়াছ ঢাল ?
এই বঙ্গভূমি এ কাল সে কাল
অরণ্য, অরণ্য অরণ্যময় ॥

৫

কে মিলাল আজি এ চাঁদের হাট ?
কে খুলিল আজি মনের কপাট ?
পড়াইব আজি এ দুঃখের পাঠ,
শুন ছি ছি রব, বাঙ্গালি নামে,
য়ুরোপে মার্কিনে ছিছি ছিছি বলে,
শুন ছিছি রব, হিমালয়তলে,
শুন ছিছি রব, সমুদ্রের জলে,
স্বদেশে, বিদেশে, নগরে গ্রামে ॥

৬

কি কাজ বহিয়া এ ছার জীবনে,
কি কাজ রাখিয়া এ নাম ভুবনে,
কলঙ্ক থাকিতে কি ভয় মরণে ?
চল সবে মরি পশিয়া জলে ।
গলে গলে ধরি, চল সবে মরি,
সারি সারি সারি, চল সবে মরি,
শীতল সলিলে এ জ্বালা পাসরি,
লুকাই এ নাম, সাগরতলে ॥

দুর্গোৎসব*

১

বর্ষে বর্ষে এসো যাও এ বাঙ্গালা ধামে
কে তুমি ষোড়শী কন্যা, মৃগেন্দ্রবাহিনি ?
চিনিয়াছি তোরে দুর্গে, তুমি নাকি ভব দুর্গে,
দুর্গতির একমাত্র সংহারকারিণী॥
মাটি দিয়ে গড়িয়াছি, কত গেল খড় কাছি,
সৃজিবারে জগতের সৃজনকারিণী।
গড়ে পিটে হলো খাড়া, বাজা ভাই ঢোল কাড়া,
কুমারের হাতে গড়া ঐ দীনতারিণী !
বাজা—ঠমকি ঠমকি ঠিকি, খিনিকি ঝিনিকি ঠিনি॥

২

কি সাজ সেজেছ মাতা রাঙ্গতার সাজে !
এ দেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে ?
সন্তানে রাঙ্গতা দিলে আপনি তাই পরিলে,
কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে ?
ভারত রতন খনি, রতন কাঞ্চন মণি,
সে কালে এদেশে মাতা, কত না ছড়ালে ?
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তুমি রাঙ্গতা পরা,
ছেঁড়া ধুতি রিপু করা, ছেলের কপালে ?
তবে—বাজা ভাই ঢোল কাঁশি মধুর খেমটা তালে॥

৩

কারে মা এনেছ সঙ্গে, অনন্তরঙ্গিণি !
কি শোভা হয়েছে আজি, দেখ রে সবার !
আমি বেটা লক্ষ্মীছাড়া, আমার ঘরে লক্ষ্মী খাড়া,
ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘরখরচ নাই॥

---

* এই কাব্যে ছন্দের নিয়ম পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘিত হইয়াছে—ব্যাকরণের ত কথাই নাই।—লেখক।

হয়েছিল হাতে খড়ি, ছাপার কাগজ পড়ি,
সরস্বতী তাড়াতাড়ি, এলে বুঝি তাই?
করো না মা বাড়াবাড়ি, তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি,
চড়ে না ভাতের হাঁড়ি, বিদ্যায় কাজ নাই।
তাক্ তাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ বাজনা বাজা রে ভাই॥

৪

দশ ভুজে দশায়ুধ কেন মাতা ধর?
কেন মাতা চাপিয়াছ সিংহটার ঘাড়ে?
ছুরি দেখে ভয় পাই, ঢাল খাঁড়া কাজ নাই,
ও সব রাখুক গিয়ে রামদীন পাঁড়ে।
সিংহ চড়া ভাল নয়, দাঁত দেখে পাই ভয়,
প্রাণ যেন খাবি খায়, পাছে লাফ ছাড়ে,
আছে ঘরে বাঁধা গাই, চড়তে হয় চড় তাই,
তাও কিছু ভয় পাই পাছে সিঙ্গ নাড়ে।
সিংহপৃষ্ঠে মেয়ের পা! দেখে কাঁপি হাড়ে হাড়ে॥

৫

তোমার বাপের কাঁধে—নগেন্দ্রের ঘাড়ে
তুঙ্গ শৃঙ্গোপরে সিংহ—দেখ গিরিবালে!
শিমলা পাহাড়ে ধ্বজা, উড়ায় করিয়া মজা,
পিতৃ সহ বন্দী আছ, হর্য্যক্ষের জালে।
তুমি যারে কৃপা কর, সেই হয় ভাগ্যধর—
সিংহেরে চরণ দিয়ে কতই বাড়ালে!
জনমি ব্রাহ্মণ কুলে, শতদল পদ্ম তুলে
আমি পূজে পাদপদ্ম পড়িনু আড়ালে!
রুটি মাখন খাব মা গো! আলোচাল ছাড়ালে!

৬

এই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন,
সিংহের গভীর কণ্ঠ, ইংরেজ কামান!
দুড়ুম দুড়ুম দুম, প্রভাতে ভাঙ্গায় ঘুম,
দুপুরে প্রদোষে ডাকে, শিহরয় প্রাণ!

ছেড়ে ফেলে ছেঁড়া ধুতি, জলে ফেলে খুজী পুঁথি,
সাহেব সাজিব আজ ব্রাহ্মণ সন্তান।
লুচি মণ্ডার মুখে ছাই, মেজে বসে মটন খাই,
দেখি মা পাই না পাই তোমার সন্ধান।
সোলা-টুপি মাথায় দিয়ে পাব জগতে সম্মান॥

৭

এনেছ মা বিঘ্ন-হরে কিসের কারণে?
বিঘ্নময় এ বাঙ্গালা, তা কি আছে মনে?
এনেছ মা শক্তিধরে, দেখি কত শক্তি ধরে?
মেরেছ মা বারে বারে দুষ্টাসুরগণে,
মেরেছ তারকাসুর, আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর,
মার দেখি ক্ষুধাসুর, সমাজের রণে?
অসুরে করিয়া ফের, মায়ে পোয়ে মার্‌লে ঢের,
মার দেখি এ অসুরে, ধরি ও চরণে॥
তখন—"কত নাচ গো রণে!" বাজাব প্রফুল্ল মনে॥

৮

তোমার মহিমা মাতা বুঝিতে নারিনু,
কিসের লাগিয়া আন কাল বিষধরে?
ঘরে পরে বিষধর, বিষে বঙ্গ জর জর,
আবার এ অজগর দেখাও কিস্করে?
দুই মা পরের দাস, বাঁধি আঁটি কেটে ঘাস,
নাস্তিক ছাড়ি নিশ্বাস কালসাপ ডরে।
নিতি নিতি অপমান, বিষে জর জর প্রাণ,
কত বিষ কণ্ঠ মাঝে, নীলকণ্ঠ ধরে;
বিষের জ্বালায় সদা প্রাণ ছটফট করে!

৯

দুর্গা দুর্গা বল ভাই দুর্গাপূজা এলো,
পুঁতিয়া কলার তেড় সাজাও তোরণ।
বেছে বেছে ভাল ফুল, সাজাব ও পদমূল,
এবার হৃদয় খুলে পূজিব চরণ॥

বাজা ভাই ঢাক ঢোল, কাড়া নাগড়া গণ্ডগোল,
দেখ ভাই পাঁটার খোল, সোনার বরণ ॥
ন্যায়রত্ন এসো সাজি, প্রতিপদ হল আজি,
জাগাও দেখি চণ্ডীরে বসায়ে বোধন ?

১০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু—ছায়া রূপ ধরে !
কি পুঁথি পড়িলে বিপ্র ! কাঁদিল হৃদয় !
সর্ব্বভূতে সেই ছায়া ! হইল পবিত্র কায়া,
ঘুচিবে সংসার মায়া, যদি তাই হয় ॥
আবার কি শুনি কথা ! শক্তি নাকি যথা তথা ?
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু, শক্তিরূপে রয় ?
বাঙ্গালি ভূতের দেহ— শক্তি ত না দেখে কেহ ;
ছিলে যদি শক্তিরূপে, কেন হলে লয় ?
আদ্যাশক্তি শক্তি দেহ ! জয় মা চণ্ডীর জয় !

১১

পরিল এ বঙ্গবাসী, নূতন বসন,
জীবন্ত কুসুমসজ্জা, যেন বা ধরায় ।
কেহ বা আপনি পরে, কেহ বা পরায় পরে,
যে যাহারে ভালবাসে, সে তারে সাজায় ।
বাজারেতে হুড়াহুড়ি, আপিসেতে তাড়াতাড়ি,
লুচি মণ্ডা ছড়াছড়ি ভাত কেবা খায় ?
সুখের বড় বাড়াবাড়ি, টাকার বেলা ভাঁড়াভাঁড়ি,
এই দশা ত সকল বাড়ী, দোষিব বা কায় ?
বর্ষে বর্ষে ভুগি মা গো, বড়ই টাকার দায় !

১২

হাহাকার বঙ্গদেশে, টাকার জ্বালায় ।
তুমি এলে শুভঙ্করি ! বাড়ে আরো দায় ।
কেন এসো কেন যাও, কেন চাল কলা খাও,
তোমার প্রসাদে যদি টাকা না কুলায় ।

তুমি ধর্ম্ম তুমি অর্থ, তার বুঝি এই অর্থ,
তুমি মা টাকারূপিণী ধরম টাকায়।
টাকা কাম, টাকা মোক্ষ, রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ,
টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, নৈলে প্রাণ যায়।
টাকা ভক্তি, টাকা মতি, টাকা মুক্তি, টাকা গতি,
না জানি ভকতিস্তুতি, নমামি টাকায় ?
হা টাকা যো টাকা দেবি, মরি যেন টাকা সেবি,
অন্তিম কালে পাই মা যেন রূপায় চাকায় ?

১৩

তুমিই বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন চক্র,
হে টাকে! ইহ জগতে তুমিই সুদর্শন।
শুন প্রভু রূপচাঁদ, তুমি ভানু তুমি চাঁদ,
ঘরে এসো সোনার চাঁদ, দাও দরশন ॥
আ মরি কি হেরি শোভা, ছেলে বুড়ার মনোলোভা,
হৃদে ধর বিবির মুণ্ড, লতায় বেষ্টন।
তব ঝন্ ঝন্ নাদে, হারিয়া বেহালা কাঁদে,
তম্বুরা মৃদঙ্গ বীণা কি ছার বাদন!
পশিয়া মরম-মাঝে, নারীকণ্ঠ মৃদু বাজে,
তাও ছার তুমি যদি কর ঝন্ ঝন্!
টাকা টাকা টাকা টাকা! বাক্সতে এসো রে ধন।

১৪

তোর লাগি সর্ব্বত্যাগী, ওরে টাকা ধন!
জনমি বাঙ্গালী-কুলে, ভুলিনু ও রূপে!
তেয়াগিনু পিতা মাতা, শত্রু যে ভগিনী ভ্রাতা,
দেখি মারি জ্ঞাতি গোষ্ঠী, তোরে প্রাণ সুঁপে!
বুঝিয়া টাকার মর্ম্ম, ত্যজেছি যে ধর্ম্ম কর্ম্ম,
করেছি নরকে ঠাঁই, ঘোর কৃমিকূপে ॥
দুর্গে দুর্গে ডাকি আজ, এ লোভে পড়ুক বাজ,
অসুরনাশিনি চণ্ডি আয় চণ্ডিরূপে!
এ অসুরে নাশ মাত! শুম্ভে নাশিলে যেরূপে!

১৫

এসো এসো জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী উমে !
হিসাব নিকাশ আমি, করি তব সঙ্গে ।
আজি পূর্ণ বার মাস, পূর্ণ হলো কোন আশ ?
আবার পূজিব তোমা, কিসের প্রসঙ্গে ?
সেই ত কঠিন মাটি, দিবা রাত্রি দুখে হাঁটি,
সেই রৌদ্র সেই বৃষ্টি, পীড়িতেছে অঙ্গে ।
কি জন্য গেল বা বর্ষ ? বাড়িয়াছে কোন হর্ষ ?
মিছামিছি আয়ুঃক্ষয়, কালের ভ্রূভঙ্গে ।
বর্ষ কেন গণি তবে, কেন তুমি এস ভবে,
পিঞ্জর যন্ত্রণা সবে বনের বিহঙ্গে ?
ভাঙ্গ মা দেহ-পিঞ্জর ! উড়িব মনের রঙ্গে ।

১৬

ওই শুন বাজিতেছে গুম্ গাম্ গুম্
ঢাক ঢোল কাড়া কাঁশি, নৌবত নাগরা ।
প্রভাত সপ্তমী নিশি, নেয়েছে শঙ্করী পিশী,
রাঁধিবে ভোগের রান্না, হাঁড়ি মাল্‌শা ভরা ।
কাঁদি কাঁদি কেটে কলা, ভিজায়েছি ডাল ছোলা,
মোচা কুমড়া আলু বেগুন, আছে কাঁড়ি করা ॥
আর মা চাও বা কি ? মট্‌কিভরা আছে ঘি,
মিহিদানা সীতাভোগ, লুচি মনোহরা !
আজ এ পাহাড়ে মেয়ের, ভাল করে৷ পেট ভরা ।

১৭

আর কি খাইবে মাতা ? ছাগলের মুণ্ড ?
রুধিরে প্রবৃত্তি কেন হে শান্তিরূপিণি !
তুমি গো মা জগন্মাতা, তুমি খাবে কার মাথা ?
তুমি দেহ তুমি আত্মা, সংসারব্যাপিনি !
তুমি কার কে তোমার, তোর কেন মাংসাহার ?
ছাগলে এ তৃপ্তি কেন, সর্ব্বসংহারিণি ?

করি তোমায় কৃতাঞ্জলি, তুমি যদি চাও বলি,
বলি দিব সুখ দুঃখ, চিত্তবৃত্তি জিনি ;
ছ্যাডাং ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাং ! নাচ গো রণরঙ্গিণি !

১৮

ছয় রিপু বলি দিব, শক্তির চরণে
ঐশিকী মানসী শক্তি ! তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ি !
বলি ত দিয়াছি সুখ, এখন বলি দিব দুখ,
শক্তিতে ইন্দ্রিয় জিনি হইব বিজয়ী।
এ শক্তি দিতে কি পার ? ঠুসে তবে পাঁটা মার,
প্রণমামি মহামায়ে তুমি ব্রহ্মময়ী।
নৈলে তুমি মাটির ঢিপি, দশমীতে গলা টিপি,
তোমায় ভাসিয়ে গাঁজা টিপি, সিদ্ধিরস্তু কই।
ঐটুকু মা ভাল দেখি, পূজি তোমায় মৃণ্ময়ি !

১৯

মন-বোতলে ভক্তি-ধেনো রাখিয়াছি তারা,
এঁটেছি সন্দেহ-ছিপি বিদ্যার গালাতে।
শিখিয়াছি লেখা পড়া, দেবতায় মেজাজ কড়া,
হইয়াছি আধ পোড়া, সংসারজ্বালাতে।
সাহেবের হুকুম চড়া, গৃহিণীর নথনাড়া,
ঋণে করলে দেশ ছাড়া, পারি না পালাতে।
তাতে আবার তুমি এলে, টাকার হিসাব না করিলে,
এতে কি মা ভক্তি মেলে সংসার লীলাতে ?
বোতলে এটেছি ছিপি ! পার কি তুমি খোলাতে ?

২০

কাজ নাই সে কথায় : পূজা কর সবে।
দেশের উৎসব এ যে ঠেলিতে কে পারে ?
কর সবে গণ্ডগোল, দাও গোলে হরি বোল,
সাপুটি পাঁঠার ঝোল ফিরি দ্বারে দ্বারে—
যাত্রার লেগেছে ধূম, ছেলে বুড়ার নাহি ঘুম,
দেখ না জ্বলিছে আলো বঙ্গের সংসারে।

দেখ না বাজনা বাজে, দেখ না রমণী সাজে,
কুসুমিত তরু যেন কাতারে কাতারে!
তবু ত এনেছ সুখ মাতা বঙ্গ-কারাগারে।

২১

বর্ষে বর্ষে এসো মা গো, খাও লুচি পাঁটা,
ছোলা কলা কচু ঘেচু যা যোটে কপালে,
যে হলো দেশের দশা, নাই বড় সে ভরসা,
আসবে যাবে খাবে নেবে, সম্বৎসর কালে।
তুমি খাও কলা মূলো, তোমার সন্তানগুলো,
মারিতেছে ব্রাণ্ডি পানি, মুর্গী পালে পালে।
দীন কবি আমি মাতা, পাতিয়া আঙ্গট পাতা,
তোমার প্রসাদ খাই, ঘৃত আলোচালে॥
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে, প্রসীদ নগেন্দ্রবালে।

রাজার উপর রাজা*

গাছ পুঁতিলাম ফলের আশায়,
পেলাম কেবল কাঁটা।
সুখের আশায় বিবাহ করিলাম
পেলাম কেবল ঝাঁটা॥
বাসের জন্য ঘর করিলাম
ঘর গেল পুড়ে।
বুড়া বয়সের জন্য পুঁজি করিলাম
সব গেল উড়ে॥
চাকুরির জন্যে বিদ্যা করিলাম,
ঘটিল উমেদারি।
যশের জন্য কীর্ত্তি করিলাম
ঘটিল টিটকারি॥

* যথার্থ "পদ্য-পদ্য"। কেন না, পদ্যের কোন ছন্দ নাই।

শুদের জন্য কর্জ দিলাম,
আসল গেল মারা।
প্রীতির জন্য প্রাণ দিলাম,
শেষে কেঁদে সারা॥
ধানের জন্য মাঠ চসিলাম
হলো খড় কুটো।
পারের জন্য নৌকা করিলাম,
নৌকা হলো ফুটো॥
লাভের জন্য ব্যবসা করিলাম,
সব লহনা বাকি।
সেটাম দিয়া আদালত করিলাম,
ডিক্রীর বেলায় ফাঁকি॥
তবে আর কেন ভাই, বেড়াও ঘুরে,
বেড়ে ভবের হাট।
ঘূর্ণী জলে নৌকা যেমন, ঝড়ের কুটো,
জ্বলন্ত আগুনের কাঠ॥
মুখে বল হরিনাম ভাই,
হৃদে ভাব হরি।
এ ব্যবসায় লোকসান নেই ভাই,
এসো লাভে ঘর ভরি॥
এক গুণেতে শত লাভ,
শত গুণে হাজার।
হাজারেতে লক্ষ লাভ,
ভারি ফেলাও কারবার॥
ভাই বল হরি, হরি বোল,
ভাঙ্গ ভবের হাট।
রাজার উপর হওগে রাজা
লাট সাহেবের লাট॥

মেঘ

আমি বৃষ্টি করিব না। কেন বৃষ্টি করিব? বৃষ্টি করিয়া আমার কি সুখ? বৃষ্টি করিলে তোমাদের সুখ আছে। তোমাদের সুখে আমার প্রয়োজন কি?

দেখ, আমার কি যন্ত্রণা নাই? এই দারুণ বিদ্যুদগ্নি আমি অহরহ হৃদয়ে ধারণ করিতেছি। আমার হৃদয়ে সেই সুহাসিনীর উদয় দেখিয়া তোমাদের চক্ষু আনন্দিত হয়, কিন্তু ইহার স্পর্শ মাত্রে তোমরা দগ্ধ হও। সেই অগ্নি আমি হৃদয়ে ধরি! আমি ভিন্ন কাহার সাধ্য এ আগুন হৃদয়ে ধরে?

দেখ, বায়ু আমাকে সর্ব্বদা অস্থির করিতেছে। বায়ু, দিগ্‌বিদিক্ বোধ নাই, সকল দিক্ হইতে বহিতেছে। আমি যাই জলভারগুরু, তাই বায়ু আমাকে উড়াইতে পারে না।

তোমরা ভয় করিও না, আমি এখনই বৃষ্টি করিতেছি—পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে। আমার পূজা দিও।

আমার গর্জ্জন অতি ভয়ানক—তোমরা ভয় পাইও না। আমি যখন মন্দগম্ভীর গর্জ্জন করি, বৃক্ষপত্র সকল কম্পিত করিয়া, শিখিকুলকে নাচাইয়া, মৃদু গম্ভীর গর্জ্জন করি, তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দারমালা দুলিয়া উঠে, নন্দসূনুশীর্ষকে শিখিপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে, পর্ব্বত-গুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে। আর বৃত্রনিপাতকালে, বজ্রসহায় হইয়া যে গর্জ্জন করিয়াছিলাম, সে গর্জ্জন শুনিতে চাহিও না—ভয় পাইবে।

বৃষ্টি করিব বৈ কি? দেখ, কত নবযূথিকা-দাম আমার জলকণার আশায় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া আছে। তাহাদিগের শুভ্র, সুবাসিত বদনমণ্ডলে স্বচ্ছ বারিনিষেক, আমি না করিলে কে করে?

বৃষ্টি করিব বৈ কি? দেখ, তটিনীকুলের দেহের এখনও পুষ্টি হয় নাই। তাহারা যে আমার প্রেরিত বারিরাশি প্রাপ্ত হইয়া, পরিপূর্ণ হৃদয়ে, হাসিয়া হাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, কল কল শব্দে উভয় কূল প্রতিহত করিয়া, অনন্ত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া কাহার না বর্ষিতে সাধ করে?

আমি বৃষ্টি করিব না। দেখ, ঐ পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক, আমারই প্রেরিত বারি, নদী হইতে কলসী পুরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং "পোড়া দেবতা একটু ধরণ কর না" বলিয়া আমাকেই গালি দিতেছে। আমি বৃষ্টি করিব না।

দেখ, কৃষকের ঘরে জল পড়িতেছে বলিয়া আমায় গালি দিতেছে। নহিলে সে কৃষক কেন? আমার জল না পাইলে তাহার চাস হইত না—আমি তাহার জীবনদাতা। ভদ্র, আমি বৃষ্টি করিব না।

সেই কথাটি মনে পড়িল,

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরশ্চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।

কালিদাসাদি যেখানে আমার স্তাবক, সেখানে আমি বৃষ্টি করিব না কেন?

আমার ভাষা শেলি বুঝিয়াছিল। যখন বলি, I bring fresh showers for the thirsting flowers, তখন সে গম্ভীরা বাণীর মর্ম্ম শেলি নহিলে কে বুঝিবে? কেন জান? সে আমার মত হৃদয়ে বিদ্যুদগ্নি বহে। প্রতিভাই তাহার বিদ্যুৎ।

আমি অতি ভয়ঙ্কর। যখন অন্ধকারে কৃষ্ণকরাল রূপ ধারণ করি, তখন আমার ভ্রূকুটি কে সহিতে পারে? এই আমার হৃদয়ে কালাগ্নি বিদ্যুৎ তখন পলকে পলকে ঝলসিতে থাকে। আমার নিঃশ্বাসে, স্থাবর জঙ্গম উড়িতে থাকে, আমার রবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়।

আবার আমি কেমন মনোরম! যখন পশ্চিম-গগনে, সন্ধ্যাকালে লোহিতভাস্করাঙ্কে বিহার করিয়া স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করি, তখন কে না আমায় দেখিয়া ভুলে? জ্যোৎস্নাপরিপ্লুত আকাশে মন্দ পবনে আরোহণ করিয়া কেমন মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া আমি বিচরণ করি। শুন পৃথিবীবাসিগণ! আমি বড় সুন্দর, তোমরা আমাকে সুন্দর বলিও।

আর একটা কথা আছে, তাহা বলা হইলেই আমি বৃষ্টি করিতে যাই। পৃথিবীতলে একটি পরম গুণবতী কামিনী আছে, সে আমার মনোহরণ করিয়াছে। সে পর্ব্বত-গুহায় বাস করে, তাহার নাম প্রতিধ্বনি। আমার সাড়া পাইলেই সে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করে। বোধ হয়, আমায় ভাল বাসে। আমিও তাহার আলাপে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমরা কেহ সম্বন্ধ করিয়া আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পার?

বৃষ্টি

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা এক জনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্দ্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে, এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝরপথে স্ফাটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীম বাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু। ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। যুবতীর যত্ননির্ম্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই—সুষুপ্ত সুন্দরীর গায়ের উপর গা ঢালি। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যেই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল কাদম্বিনি! বৃষ্টিকুলপ্রসূতি! আয় মা দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনি; সৌরতেজঃসংহারিণি! এসো, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এসো ভগিনি সুচারুহাসিনি চঞ্চলে! বৃষ্টিকুলমুখ আলো কর! আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে, ভূতলে নামি। তুমি বৃত্রমর্ম্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না—এ উৎসবে তোমার মত বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল গর্ব্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও। এই ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্যমধ্যে পড়িও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্ব্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ; পোড়াও ত ঐ উচ্চ দেবালয়চূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ, কৃষকের ঘরে জল পড়িতেছে বলিয়া আমায় গালি দিতেছে। নহিলে সে কৃষক কেন? আমার জল না পাইলে তাহার চাস হইত না—আমি তাহার জীবনদাতা। ভদ্র, আমি বৃষ্টি করিব না।

সেই কথাটি মনে পড়িল,

> মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
> বামশ্চায়ং নদতি মধুরশ্চাতকস্তে সগর্ব্বঃ।

কালিদাসাদি যেখানে আমার স্তাবক, সেখানে আমি বৃষ্টি করিব না কেন?

আমার ভাষা শেলি বুঝিয়াছিল। যখন বলি, I bring fresh showers for the thirsting flowers, তখন সে গম্ভীরা বাণীর মর্ম্ম শেলি নহিলে কে বুঝিবে? কেন জান? সে আমার মত হৃদয়ে বিদ্যুদগ্নি বহে। প্রতিভাই তাহার বিদ্যুৎ।

আমি অতি ভয়ঙ্কর। যখন অন্ধকারে কৃষ্ণকরাল রূপ ধারণ করি, তখন আমার ভ্রূকুটি কে সহিতে পারে? এই আমার হৃদয়ে কালাগ্নি বিদ্যুৎ তখন পলকে পলকে ঝলসিতে থাকে। আমার নিঃশ্বাসে, স্থাবর জঙ্গম উড়িতে থাকে, আমার রবে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয়।

আবার আমি কেমন মনোরম! যখন পশ্চিম-গগনে, সন্ধ্যাকালে লোহিতভাস্করাঙ্কে বিহার করিয়া স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করি, তখন কে না আমায় দেখিয়া ভুলে? জ্যোৎস্নাপরিপ্লুত আকাশে মন্দ পবনে আরোহণ করিয়া কেমন মনোহর মূর্ত্তি ধরিয়া আমি বিচরণ করি। শুন পৃথিবীবাসিগণ! আমি বড় সুন্দর, তোমরা আমাকে সুন্দর বলিও।

আর একটা কথা আছে, তাহা বলা হইলেই আমি বৃষ্টি করিতে যাই। পৃথিবীতলে একটি পরম গুণবতী কামিনী আছে, সে আমার মনোহরণ করিয়াছে। সে পর্ব্বত-গুহায় বাস করে, তাহার নাম প্রতিধ্বনি। আমার সাড়া পাইলেই সে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করে। বোধ হয়, আমায় ভাল বাসে। আমিও তাহার আলাপে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমরা কেহ সম্বন্ধ করিয়া আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে পার?

বৃষ্টি

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা এক জনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্দ্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে, এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝরপথে স্ফাটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীম বাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু। ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। যুবতীর যত্ননির্ম্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই—সুষুপ্ত সুন্দরীর গায়ের উপর গা ঢালি। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না ঐক্যেই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল কাদম্বিনি! বৃষ্টিকুলপ্রসূতি! আয় মা দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনি; সৌরতেজঃসংহারিণি! এসো, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এসো ভগিনি সুচারুহাসিনি চঞ্চলে! বৃষ্টিকুলমুখ আলো কর! আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে, ভূতলে নামি। তুমি বৃত্রমর্ম্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না—এ উৎসবে তোমার মত বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল গর্ব্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও। এই ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্যমধ্যে পড়িও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্ব্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ; পোড়াও ত ঐ উচ্চ দেবালয়চূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাসা চসিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা! দুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব। দে, মাগীর কাপড় ভিজিয়ে দে।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গ রস জানি। লোকের চাল ফুটা করিয়া ঘরে উঁকি মারি—দম্পতীর গৃহে ছাদ ফুটা করিয়া টু দিই। যে পথে সুন্দর বৌ জলের কলসী লইয়া যাইবে, সেই পথে পিছল করিয়া রাখি। মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া, ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় কদার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরাণী কাপড় শুকুতে দিলে, প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। ভণ্ড বামুনের জন্য আচমনীয় যাইতেছে দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা কি কম পাত্র! তোমরা সবাই বল—আমরা রসিক।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্ব্বতকন্দর, দেশ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ নির্ম্মাণ করিব। বিশীর্ণা সূত্রাকারা তটিনীকে কূলপ্লাবিনী দেশমজ্জিনী অনন্তদেহধারিণী অনন্ত তরঙ্গিণী জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে!

খদ্যোত

খদ্যোত যে কেন আমাদিগের উপহাসের স্থল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, চন্দ্র সূর্য্যাদি বৃহৎ আলোকাধার সংসারে আছে বলিয়াই জোনাকির এত অপমান। যেখানেই অল্পগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহাস করিতে হইবে, সেইখানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে, জোনাকির অল্প হউক, অধিক হউক, কিছু আলো আছে—কই, আমাদের ত কিছুই নাই। এই অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ আলো করিলাম? কে আমাকে দেখিয়া, অন্ধকারে, দুস্তরে, প্রান্তরে, দুর্দ্দিনে, বিপদে, বিপাকে বলিয়াছে, এস ভাই, চল চল, ঐ দেখ আলো জ্বলিতেছে, চল, ঐ আলো দেখিয়া পথ চল? অন্ধকার! এ পৃথিবী ভাই বড় অন্ধকার! পথ চলিতে পারি না। যখন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, তখন পথ চলি—নহিলে পারি না। তারাগণ আকাশে উঠিয়া, কিছু আলো করে বটে, কিন্তু দুর্দ্দিনে ত তাহাদের দেখিতে পাই না। চন্দ্রসূর্য্যও সুদিনে—দুর্দ্দিনে, দুঃসময়ে, যখন মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের

ছটা, একে রাত্রি, তাহাতে ঘোর বর্ষা, তখন কেহ না। মনুষ্যনির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় তাহারাও বলে —"*Hora non numero nisi serenas!*" কেবল তুমি খদ্যোত,—ক্ষুদ্র, হীনভাস, ঘৃণিত, সহজে হন্য, সর্ব্বদা হত—তুমিই সেই অন্ধকার দুর্দ্দিনে বর্ষাবৃষ্টিতে দেখা দাও। তুমিই অন্ধকারে আলো। আমি তোমাকে ভাল বাসি।

আমি তোমায় ভাল বাসি, কেন না, তোমার অল্প, অতি অল্প আলো আছে—আমিও মনে জানি, আমারও অল্প, অতি অল্প আলো আছে—তুমিও অন্ধকারে, আমিও ভাই, ঘোর অন্ধকারে। অন্ধকারে সুখ নাই কি? তুমিও অনেক অন্ধকারে বেড়াইয়াছ—তুমি বল দেখি? যখন নিশীথ-মেঘে জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষা হইতেছে ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হইতেছে; চন্দ্র নাই, তারা নাই, আকাশের নীলিমা নাই, পৃথিবীর দীপ নাই—প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্য্যন্ত নাই—কেবল অন্ধকার, অন্ধকার! কেবল অন্ধকার আছে—আর তুমি আছ—তখন, বল দেখি, অন্ধকারে কি সুখ নাই? সেই তপ্ত রৌদ্রপ্রদীপ্ত কর্কশ স্পর্শপীড়িত, কঠোর শব্দে শব্দায়মান অসহ্য সংসারের পরিবর্ত্তে, সংসার আর তুমি! জগতে অন্ধকার; আর মুদিত কামিনীকুসুম জলনিষেকতরুণায়িত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তুমি! বল দেখি ভাই, সুখ আছে কি না?

আমি ত বলি আছে। নহিলে কি সাহসে, তুমি ঐ বন্যান্ধকারে, আমি এই সামাজিক অন্ধকারে এই ঘোর দুর্দ্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতাম? আছে—অন্ধকারে মাতিয়া আমোদ আছে। কেহ দেখিবে না—অন্ধকারে তুমি জ্বলিবে—আর অন্ধকারে আমি জ্বলিব; অনেক জ্বালায় জ্বলিব। জীবনের তাৎপর্য্য বুঝিতে অতি কঠিন—অতি গূঢ়, অতি ভয়ঙ্কর—ক্ষুদ্র হইয়া তুমি কেন জ্বল, ক্ষুদ্র হইয়া আমি কেন জ্বলি? তুমি তা ভাব কি? আমি ভাবি। তুমি যদি না ভাব, তুমি সুখী। আমি ভাবি—আমি অসুখী। তুমিও কীট—আমিও কীট, ক্ষুদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট—তুমি সুখী,—কোন্ পাপে আমি অসুখী? তুমি ভাব কি? তুমি কেন জগৎসবিতা সূর্য্য হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা যে সুধাকর, কেন তাই হইলে না—কেন গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা,—কিছু না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে, ভাব কি? যিনি এ সকলকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই তোমায় সৃজন করিয়াছেন, যিনিই উহাদিগকে আলোক দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন—তিনি একের বেলা বড় ছাঁদে—অন্যের বেলা ছোট ছাঁদে গড়িলেন কেন? অন্ধকারে এত বেড়াইলে, ভাবিয়া কিছু পাইয়াছ কি?

তুমি ভাব না ভাব, আমি ভাবি। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে, বিধাতা তোমায় আমায় কেবল অন্ধকার রাত্রের জন্য পাঠাইয়াছেন। আলো একই—তোমার আলো ও সূর্য্যের—উভয়ই জগদীশ্বরপ্রেরিত—তবে তুমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য; আমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য। এসো কাঁদি।

এসো কাঁদি—বর্ষার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ কেন? আলোকময়, নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল বসন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের জন্য, সুখীর জন্য, নিশ্চিন্তের জন্য;—বর্ষা তোমার জন্য, দুঃখীর জন্য, আমার জন্য। সেই জন্য কাঁদিতে চাহিতেছিলাম—কিন্তু কাঁদিব না। যিনি তোমার আমার জন্য এই সংসার অন্ধকারময় করিয়াছেন, কাঁদিয়া তাঁহাকে দোষ দিব না। যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য সম্বন্ধই তাঁহার ইচ্ছা, আইস, অন্ধকারই ভালবাসি। আইস, নবীন নীল কাদম্বিনী দেখিয়া, এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমণ্ডলের করাল ছায়া অনুভূত করি; মেঘগর্জ্জন শুনিয়া, সর্ব্বধ্বংসকারী কালের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন স্মরণ করি;—বিদ্যুদ্দাম দেখিয়া কালের কটাক্ষ মনে করি। মনে করি, এই সংসার ভয়ঙ্কর ক্ষণিক,—তুমি আমি ক্ষণিক, বর্ষার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলাম; কাঁদিবার কথা নাই। আইস, নীরবে জ্বলিতে জ্বলিতে, অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে সকল সহ্য করি।

নহিলে, আইস, মরি। তুমি দীপালোক বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মর, আমি আশারূপ প্রবল প্রোজ্জ্বল মহাদীপ বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মরি। দীপালোকে তোমার কি মোহিনী আছে জানি না—আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কত বার ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম, কত বার পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী কি, আমি জানি। জ্যোতিষ্মান্ হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব—বড় সাধ; কিন্তু হায়! আমরা খদ্যোত। এ আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না! কাজ নাই। তুমি ঐ বকুলকুঞ্জকিসলয়কৃত অন্ধকারমধ্যে, তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, দুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।

মনুষ্য খদ্যোত।

বাল্যরচনা

বাল্যরচনা

[এই কবিতাগুলি লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়। লিখিত হওয়ার তিন বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারীতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই। তাহার পর আর এ সকল পুনর্ম্মুদ্রিত করিবার যোগ্য বিবেচনা করি নাই, এখনও আমার এমন বিবেচনা হয় না যে, ইহা পুনর্ম্মুদ্রিত করা বিধেয়। বাল্যকালে কিরূপ লিখিয়াছিলাম, তাহা দেখাইয়া বাহাদুরী করিবার ভরসা কিছু মাত্র নাই ; কেন না, অনেকেই অল্প বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারে। যাহা অপাঠ্য, তাহা বালকপ্রণীত হউক বা বৃদ্ধ-প্রণীত হউক, তুল্যরূপে পরিহার্য্য। অতএব কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া "ললিতা" নামক কাব্যখানি পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। মানস নামক কাব্যখানিতে পরিবর্ত্তন বড় সহজ নহে, এ জন্য সে চেষ্টা করিলাম না। তথাপি সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।]

ললিতা

ভৌতিক গল্প

"O Love! in such a wilderness as this.
Where transport with security entwine.
Here is the Empire of thy perfect bliss.
And here art thou a God indeed divine."

Gertrude of Wyoming.

"But mortal pleasure, what art thou in truth!
The torrents' smoothness ere it dash below."

Ibid.

প্রথম সর্গ

১

মহারণ্যে অন্ধকার, গভীর নিশায়
নিশ্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায়॥
কাননের পাতা ছাদ, নাচে শশিকরে।
পবন দোলায় তায় সুমধুর স্বরে॥
নীচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষুদ্র নদী।
অন্ধকার, মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি॥
ভীম তরুশাখা যথা পড়িয়াছে জলে,
কল কল করি বারি সুরবে উছলে॥
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি, যেন বা স্বপন!
কলিকাস্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ॥
শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধরকর,
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে, নীল জলোপর॥
ঘোর স্তব্ধ নদীতটে: শুধু ক্ষণে ক্ষণে,
কোন কীট যায় আসে নাড়া দিয়ে বনে॥
শুধু অন্ধকার মাঝে, অলক্ষ্য শরীর!
কোন হিংস্র পশু ছাড়ে, নিশ্বাস গভীর॥

অসংখ্য পত্রের শুধু, ভীষণ মর্ম্মর।
আর শুধু শুনি এক, সঙ্গীতের স্বর॥
গভীর সঙ্গীত সেই। ভাসে নদী দিয়ে।
ভাঙ্গিল গভীর স্তব্ধ স্বরে শিহরিয়ে—
কখন কোমল স্থির করুণার স্বরে,
যেন কোন বিরহিণী কেঁদে কেঁদে মরে॥
শুনিয়ে তা মনে হয়, ঈষৎ আভাস,
যেন কত সুখস্বপ্ন, হয়েছে বিনাশ ;
কি কারণে দুঃখোদয় কিসের স্মরণে,
কিছুই বুঝি না তবু, উচাটন মনে॥
ফুলিয়ে উঠিছে ধ্বনি, স্থির শূন্য কেটে।
ইচ্ছা করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে॥
ছেঁড়ে হৃদয়ের ডোর গভীর যাতনে।
ইচ্ছা করে গলি গিয়ে মিশি গান সনে॥
আরে যদি সঙ্গীতের দেহ দেখা পাই !
যতনেতে আলিঙ্গিয়া, মোহে মরে যাই॥

২

নদীতীরে বৃক্ষ নাহি ছিল এক স্থানে।
দীর্ঘ তৃণে চন্দ্রকর জ্বলিছে সেখানে॥
ছোট গাছে তারামত ফুল্ল পুষ্পদলে।
স্থির তার প্রতিরূপ স্থির নদীজলে॥
সুখস্বপ্নে যেন তারা, নিদ্রান্তরে হাসে।
গগন গুমুরে মরে, সুখময় বাসে॥
সেই স্থানে বসি এক নারী একাকিনী।
ফুলহীন বনে যেন স্থলকমলিনী॥
মিশেছে সে চন্দ্রিকায় ; ভাবে তায় চিত্ত
শুধু সে স্বপ্নের ছায়া, অসত্য অনিত্য॥
যৌবন আশার সম ফুল্ল রূপ তার।
দেখিয়া ফিরালে আঁখি, দেখি ফিরে বার॥

স্থিরা ধীরা সুকোমলা বিমলা অবলা।
সবে নব পুরিতেছে যৌবনের কলা ॥
মোহন সঙ্গীতে মন বেঁধেছে যতনে।
প্রেম যেন শুনিতেছে আশায় বচনে ॥
বদনে ললিত রেখা কত হয়ে যায়।
রক্তিম নীরদ যেন শারদ সন্ধ্যায় ॥
গলিল নয়নপঙ্ক ; মুগ্ধ তার মন,
প্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যৌবন,
সকলি করেছে যেন গীতে সমর্পণ ॥
কোথা হতে আসে সেই সুমধুর গান ?
কেন তাতে এত আশা ? কে হরিল প্রাণ ?

৩

ললিতা তাহার নাম—রাজার নন্দিনী।
জননী না ছিল তার, বিমাতা বাঘিনী।
রাজা বড় নিষ্ঠুর সতত দেয় জ্বালা ;
গোপনে কতই কাঁদে মাতৃহীনা বালা।
দুর্জ্জনের সাথে তার বিবাহ সম্বন্ধ—
শুনে কেঁদে কেঁদে তার, চক্ষু যেন অন্ধ।
মন্মথ নামেতে যুবা, সুঠাম সুন্দর,
বচনে অমিয় ক্ষরে নারীমনোহর।
মোহিল ললিতাচিত তার দরশনে।
গোপনে বিবাহ হৈল মিলিল দুজনে।
জানিল বিবাহবার্তা দুরন্ত রাজন্।
কন্যারে ডাকিয়া বলে পরুষ বচন ॥
এ পুরী আঁধার কেন কর কলঙ্কিনী।
শীঘ্র যাও দেশান্তরে না হতে যামিনী ॥
কাল যদি দেখি তোরে, বধিব পরাণ।
ভয়ে বালা সেই দণ্ডে করিলা প্রস্থান ॥

মন্মথ লইয়া তারে তুলিল নৌকায়।
ভয়ে ভীত দুই জনে নদী বেয়ে যায়॥
পথিমধ্যে দস্যুদল আসিয়া রোধিল।
ললিতারে কাড়ি লয়ে বনে প্রবেশিল॥
অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল তারে।
ললিতা একাকী ফিরে নদী ধারে ধারে॥
কোথায় মন্মথ গেল, তরি কোন ভিতে।
রজনী গভীরা তবু ভয় নাই চিতে।
এমন সময়ে শোনে সঙ্গীতের ধ্বনি।
মন্মথ গাইছে গীত বুঝিল অমনি॥
বুঝিল সঙ্কেত করে সেই প্রিয়জন,
নদীতীরে চন্দ্রালোকে বসিল তখন।
তীরেতে লাগিল তরি অতিক্রত হয়ে।
দেখিতে দেখিতে দুয়ে দুয়ের হৃদয়ে॥
কতই আদর করে, পেয়ে সোহাগিনী।
কতই রোদন করে কাতরা কামিনী॥

৪

তখন ললিতা কয়, "আর জ্বালা নাহি সয়,
পড়িয়া দস্যুর হাতে, যে দুঃখ হে পেয়েছি।
কাড়ি নিল অলঙ্কার, লাঞ্ছনা কত আমার,
তীরে তীরে কেঁদে কেঁদে এতদুর এয়েছি॥
দেখা হবে তব সাথ, হেন নাহি জানি নাথ,
দয়া করি কালী আজি রেখেছেন চরণে।"
পতি বলে "শুন প্রিয়ে, তোমা ধনে হারাইয়ে,
মরিব বলিয়ে আজি, প্রবেশিনু কাননে॥
দেখিলাম দুই ধার, মহারণ্যে অন্ধকার,
নীরবে নির্ম্মলা নদী, তার মাঝে বহিছে।
ভীষণ বিজন স্তব্ধ, নাহি জীব নাহি শব্দ,
তরুদলে ঢুলে ঢুলে, ঘুমাইয়া রহিছে॥

যে স্থির অরণ্য নদী, যেন বা সৃজনাবধি,
কোন জীব কোন কীট, তথা নাহি নড়েছে।
প্রথমে যে ছিল যথা, এখনও রয়েছে তথা,
মৃত্যুর ভীষণ ছায়া, সর্ব্বস্থানে পড়েছে ॥
ভয়েতে গগন পানে, চাহিলে ভুলিনু প্রাণে,
বিমল সুনীলাকাশে, শশী হেসে যেতেছে।
ভাবিলাম প্রকৃতির, সিকলি গভীর স্থির,
শুধু এ হৃদয় কেন, এত দুঃখ পেতেছে!
মরি যদি পারিতাম, গোলে জল হইতাম,
এ স্থির সলিলে মিশে, হৃদয় ঘুমাইত।
তথা রিপু চিন্তাহীন, রহিতাম চিরদিন,
ললিতার দুঃখ তবে, কিসে হৃদে আইত ॥

৫

"ভাবি এ প্রকার, ছাড়িতে হুঙ্কার,
কাঁপিল কানন স্তব্ধ।
শিহরি অন্তরে, কি জানি কি ডরে,
কাঁপে হৃদি শুনি শব্দ ॥
হুতাশ নাশিতে, সঙ্কেত বাঁশীতে,
গায়িলাম দুখ যত।
বাজাইয়া তায়, মরি লো তোমায়,
সঙ্কেত করেছি কত!
একবার যাই, মুরলী বাজাই,
আপনি নয়ন ঝোরে।
গলে হৃদি দুখে, এক মাত্র সুখে;
বাঁশী কি মোহিল মোরে!
গাই পরক্ষণে, দেখি নিশাবনে,
একাকিনী রূপবতী।
হয়ে চমকিত, তরি এই ভীত,
লইলাম শীঘ্রগতি ॥

কে জানে কেমনে, আশা এলো মনে,
আমারি ললিতা হবে।
কত ভাগ্য যদি, পাই হারা মণি,
আর ছাড়া নাহি হবে?"

৬

ললিতা।

"নারে প্রাণ নারে, আর হে তোমারে,
আঁখি ছাড়া করিব না।
রহিব দুজনে, গোপনে কাননে,
দেখিবে না কোন জনা॥
কাজ নাই দেশে, তথা শুধু দ্বেষে,
হেন প্রেম নাশ করে।
গঞ্জন যন্ত্রণা, কলঙ্ক রটনা,
মিলন না হয় ডরে॥
যেখানে প্রণয়, হৃদয়ে না রয়,
যেখানে তোমা না পাই।
সে দেশ কি দেশ, সে গৃহে বিদ্বেষ,
কখন যেন না যাই॥
এখানে মন্মথ, প্রণয়ের পথ;
কলঙ্কের কাঁটা হীন।
হেরি তব মুখে, নিরমল সুখে,
স্বর্গসুখে হব লীন॥
জ্বালা পৃথিবীর, সব হবে স্থির,
শুধু সুখময় মন।
লইয়ে মন্মথ, যাহা মনোমত,
করিব সকল ক্ষণ॥"

মন্মথ।

"হে বিধি হে বিধি, কর কর বিধি,
এই কপালে আমার।

বল তার চেয়ে, স্বর্গপদ পেয়ে,
কি সুখ আছে হে আর ॥
বিচ্ছেদ যাতনা, দিব না দিব না,
এ জনমে প্রেয়সীরে।
কাল পূর্ণ হলে, সুখে তব কোলে,
মরে যাব ধীরে ধীরে ॥"

দ্বিতীয় সর্গ

১

মরি প্রেম যার মনে, সে কি চায় রাজ্যধনে,
প্রিয়মুখ ত্রিসংসার তায়।
হৃদে তার যে রতন, আলো করে ত্রিভুবন,
অন্য মণি নিবায় বিভায় ॥
এক মোহে সদা মত্ত, না জানে আপনি মর্ত্ত্য,
যাহা দেখে তাই প্রেমাকুল।
রবি শশী তারাকাশ, পয়োদ পবনশ্বাস,
সাগর শিখর বনফুল ॥
যেন লক্ষ বিদ্যাধরে, সদা কর্ণে গান করে,
কি মধুর শব্দহীন ভাষা।
হেরিয়ে সামান্য কলি, নয়ন সলিলে গলি,
উছলে অন্তরে ভালবাসা ॥
প্রেমে যার মন বাঁধা, না পারে দিবারে বাধা,
সমুদ্র শিখর নদী বনে।
তবে যদি করে বিধি, চির বিরহের বিধি,
তবু স্বর্গ মনের মিলনে ॥
কলঙ্ক বিপদ ক্লেশ, ঝটিকার ধরি বেশ,
শিরোপরি গরজয়ে যত।
আশ্রয় করিয়া আশা, প্রণয়ীতে ভালবাসা,
প্রণয়ীর প্রাণে বাড়ে তত ॥

জ্বালা সয় নিরবধি, সেও ভাল পায় যদি,
একবার আঁখির মিলন।
দুখের গভীর বনে, সেই বপ্নে সুখ মনে,
প্রেম রীতি কে জানে কেমন॥

২

চলিল চরণে চন্দ্রবদনী।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে মন্দচরণী।
উষার প্রখর তারকা ধনী।
চলিল গজেশগামিনী॥
উভয়ে মরেছে হৃদি যাতনে।
উভয়ে পেয়েছে প্রাণরতনে।
কাঁধে কাঁধে ধরি চলে কাননে।
গভীর নীরব যামিনী॥
শিরোপরে শাখা বিনান ঘন।
আসিবে কেমনে শশিকিরণ।
তরল তিমির ভীষণ বন।
দেখিয়া শিহরে কামিনী॥
আঁধার আকাশে নক্ষত্রাবলি।
তেমনি কাননে কুসুম কলি।
আমোদে হৃদয়ে যেতেছে গলি।
সে নব নীরদ দামিনী॥
ভীষণ তিমিরে ভীষণ স্থির।
মাঝে মাঝে খসে পত্র শাখীর।
ধীরে ধীরে ঝরে নির্ঝর নীর।
আঁধারে নিরখে রঙ্গিণী॥
লাগিয়া নির্ঝরে ঈষৎ আলো।
দেখে ফুলময় সে জল কালো।
আঁধারে কুসুম পরশে গাল।
শিহরে সরোজ অঙ্গিনী॥

যেতে পতি সনে চন্দ্রবদনী
মরি কি সঙ্গীত শুনিল ধনী।
ললিত মোহন গভীর ধ্বনি।
নির্ঝর নিনাদ সঙ্গিনী॥
নীরব কানন উঠে শিহরি।
শিহরে দুজনে দুজনে ধরি।
হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথিল মরি।
বাঁধিল মনঃকুরঙ্গিণী॥

৩

স্তব্ধ বনে অন্ধকারে, ভেসে ভেসে চারি ধারে
মোহে তায় দুই জনে, আপনাকে ভুলিল।
দুজনার মুখ চেয়ে, দুজনারে বুকে পেয়ে,
প্রেম আর সেই গানে, এক হয়ে মিলিল॥
জ্ঞান পেয়ে কহে কেন, এ গহনে ধ্বনি হেন,
এ ধ্বনি দেবের যেন, চল দেখি যাইয়ে।
আ মরি! কহিছে ধনী, শুনি নাই হেন ধ্বনি,
হরিল কানন ভয়, হৃদয় নাচাইয়ে॥
বনমাঝে যায় যত, ধ্বনি সুনিকট তত,
দেখে শেষে তরু কত, কুঞ্জ এক ঘেরেছে।
স্থির শোভা কিবা তার, বুঝি প্রেম আপনার,
সাধের প্রমোদাগার, তার মাঝে করেছে॥

৪

এ কুঞ্জ হইতে যেন আসিছে সঙ্গীত।
হেন ভাবি দুই জনে আইল ত্বরিত॥
নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামিল সে ধ্বনি।
কানন পূর্ব্বের মত নীরব অমনি॥
আশ্চর্য্য হইয়া দোঁহে রহিলেক স্থির।
দেখিতেছে শোভা কুঞ্জ গগন শশীর॥

কেহ নাই বন কিম্বা গগন ভিতর।
তথাপি কেমনে এলো এ মধুর স্বর॥
ললিতার জ্ঞান হলো প্রবেশ সময়।
যেন কোন স্বপ্ন-দৃষ্ট মত শোভাময়
দুই মনোরম রূপ নারী নরাকারে,
দেখিল চকিত মত নিকুঞ্জের দ্বারে॥
মন্মথ মোহিনী প্রতি কহিছে হে প্রিয়ে।
দেখি কালিকার দিন এখানে রহিয়ে॥
আজিকার মত যদি কালিকায় হবে।
দেব কি মানব যক্ষ জানা যাবে তবে॥
আজিকার মত এসো রই এই স্থানে।
এমন মোহন স্থান পাবে কোন্‌খানে॥

৫

মোহিনী মন্মথ সনে মনোমত স্থলে।
এমন যামিনী যাপে এমন বিরলে॥
এমন বিপদহীন বিজন কানন।
এমন বিরল প্রেম গভীর এমন॥
কে জানে সে সত্য কি না স্বপন নিশার।
বনে এলে কে জানিত হেন হবে তার॥
রবে না এমন সুখ মানব কপালে।
ভাবিয়ে বিচল চিত্ত এ সুখের কালে॥
এই ভয় মনোমাঝে হয় আর যায়।
যেন কোন মেঘ-ছায়া পড়িছে ধরায়॥
এই মত গেল নিশি নিকুঞ্জ মন্দিরে।
সে দিন কাটালে সুখে নিশি এলো ফিরে॥

৬

কাননে যামিনী পরকাশে, নিরমল নীলে শশী ভাসে।
নিশীথে নিস্তব্ধ বন, নিদ্রা যায় মেঘগণ,
নিদ্রা যায় বাতাস আকাশে॥

উঠিল নীরবে আচম্বিত, প্রেমময় ললিত সঙ্গীত।
স্থির শূন্যে ভেসে যায়, গগন গহন তায়,
শিহরিছে পুলক পূরিত॥
যেন কেহ বিরহের জ্বরে, প্রেমময়ী পরশে শিহরে।
নাথহৃদে ছিল ধনী, গলিল শুনিয়ে ধ্বনি,
মোহে মিশে প্রাণে প্রাণেশ্বরে॥
গভীর নিশ্বাসে থামে গান, অবকাশে তারা পায় জ্ঞান।
জানিল সে কালিকার, সেই ধ্বনি পুনর্ব্বার,
হেথা হতে গেছে অন্য স্থান॥
প্রেয়সীরে কহিছে মন্মথ, ধ্বনি যে জুড়ায় শ্রুতিপথ।
এখানে গেয়েছে কাল, কামিনি লো কি কপাল।
আজ ধ্বনি অন্য স্থান গত॥
আজি গীত গাইছে যথায়, চল মোরা যাইব তথায়।
কে গায় কিসের তরে, কেন গায় স্থানান্তরে,
করি চল যাহে জানা যায়॥
নাথ সনে লক্ষ্য করি ধ্বনি, চলে বনে শশাঙ্কবদনী।
ঘন গাঁথা তরুদলে, ঘন তম তার তলে,
ভয়ঙ্কর নীরব কেমনি॥
পূর্ব্বমত নিকুঞ্জ মণ্ডলে, আসিল সে প্রেমিক যুগলে।
পূর্ব্বমত স্বপ্নসম, দুই রূপ নিরুপম,
যথা হইতে দ্রুত গেল চলে॥

৭

কাঁপিয়ে বিষম ভয়ে বলে হাঁ রে বিধি।
এমন সুখেতে কেন হেন কর বিধি॥
পৃথিবীতে কোন স্থান সুখের কি নয়?
কানন বাসেও কি গো বিপদ নিশ্চয়॥
দেবতা কুপিত বলি দুজনাতে ভীত।
কি হবে তৃতীয় রাত্রে দেখিতে চিন্তিত॥
তৃতীয় নিশীথে গীত আর এক স্থানে।
পূর্ব্বমত তথা গিয়া ভয়ে মরে প্রাণে॥

সেই মত পেলে ভয় চতুর্থ রজনী।
পঞ্চম রজনীযোগে কোথায় সে ধ্বনি ?

৮

তমিস্রা পঞ্চম নিশা, গগন মণ্ডলে।
ভীষণ আঁধার বসি, ঘন বনতলে॥
নীরব নিস্পন্দ তম, সঙ্গীতের আশে।
সময় হইল তবু, সে ধ্বনি না আসে॥
বিকট আননে ভয়, ঘুমায় কাননে।
দেখে স্তব্ধ স্পন্দহীন, যত তরুগণে—
পাপান্ধ-তিমিরময়, যেন কার মন,
নীরবে করাল কার্য্য, করিছে কল্পন॥
শুধু শুষ্ক পাতা খসি, মাঝে মাঝে পড়ে।
যথা পড়ে তথা পচে, নাহি আর নড়ে॥
পাইয়া অলক্ষ্য লক্ষ্য, কুসুমের বাস।
আমোদে আঁধার দেহ, না ছাড়ে নিশ্বাস॥
পত্র-চন্দ্রাতপ তলে, ক্ষুদ্র খাল চলে।
নাহি দেখা যায় ভাল, নাহি শব্দ জলে॥
ঘুমায়ে পড়িয়ে জলে, পুষ্পবৃক্ষাবলী।
আঁধারে কলিকাগুচ্ছ, নিরখি কেবলি॥
নীরবে ঝরিয়া ফুল, স্রোতে ভেসে যায়।
পতিহীনা বিরহীর, প্রেম আশা প্রায়॥
শুষ্ক ফল খসি জলে, পড়ে একবার।
অমনি চমকে বুক, মন্মথ বামার॥
অন্ধকার মাঝে আলো, হুয়ের বদন।
বরষার শশী যেন, মেঘে আচ্ছাদন॥
ভীম স্তব্ধে ভয়ে ভীত, বসি তারা তথা।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, নাহি সরে কথা॥
ভাবে আজি কেন, এত কাঁদিছে অন্তর।
বলিতে বলিতে নারে, হৃদি গরগর॥

সুখের কাননে আজি, কেন কাল ভাব।
ভীষণ স্বপন যেন, দেখিছে স্বভাব॥
আপনি নয়ন কেন, ঝরে অকারণ।
বুঝি আজি ছেড়ে যাবে, জীবন রতন॥
হৃদে ধরি পরস্পরে, মুখপানে চায়।
কেঁদে যেন কি বলিবে, বলিতে না পায়॥
ললিতা লুকাল মাথা, প্রাণনাথ কোলে।
কাঁদিয়ে মুছায় পতি, প্রিয়া আঁখিজলে॥

৯

এখনো এলো না কেন সঙ্গীতের ধ্বনি।
ভীষণ নীরব! হা রে! আছে কি ধরণী?
অকস্মাৎ কোথা হয় গভীর গর্জ্জন।
কাঁপিল গভীর বন কাঁপিল দুজন॥
অদ্ভুত নিনাদ উড়ে যায় বন দিয়ে।
অন্ধকার ভীমতর হইল আসিয়ে॥
ভীমতর নাদে যেন কাঁপে নভ হৃদি।
কাঁদিয়া উঠিল দোঁহে, "হা বিধি! হা বিধি!"

১০

গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্তবন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ॥
ঘোরতর চীৎকার, লক্ষ লক্ষ অনিবার,
মানুষ চিবায় ভূতগণে।

সমুদ্র সমান সোয়ে, বরিষা আছাড়ে জোরে
রেগে রেগে গর্জ্জে বায়ু সনে ॥
উপরি উপরি ধ্বনি, আছাড়ে সহস্রাশনি,
খণ্ডে খণ্ডে ছেঁড়ে বা গগন।
বিদারিয়ে বিটপীরে, বজ্রাগ্নি পোড়ায় শিরে,
কাঁদে যত সিংহ ব্যাঘ্রগণ ॥

১১

ভীষণ নীরব! যেন মরেছে ধরণী।
হে ধাতঃ কাঁপালো স্তব্ধ আবার কি ধ্বনি ॥
বলিছে গম্ভীর স্বরে, "রে নরযুগল!
দেবের নিকুঞ্জে এসে পাও কর্ম্মফল।"
ফিরে বায় ঘর ঘর, গরজিল জলধর,
মাতিল মরুৎ ফিরে বায়।
চেচায় অশনি ঘন, ভীমবলে তরুগণ,
মত্ত শির নাড়িছে আবার ॥

১২

থামিল ঝটিকারণ, হলো নিশাশেষ।
শ্বেতমেঘময়াকাশে, উদিল নিশেশ ॥
জলে করে জলময়, কানন নিকুঞ্জ।
তরু লতা তৃণ দ্রুম, পুষ্পলতা পুঞ্জ ॥
কুলময় ছোট খাল বিমল চঞ্চল।
ছায়াকারী শাখা হতে ঝরে বিন্দুজল ॥
উজ্জ্বল পুলিনতলে ম্লান তারা মত।
মরিয়ে রয়েছে ঝড়ে ললিতা মন্মথ ॥
মানবের কি কপাল! সংসার কি ছার!
বহিতে জীবন ভার কে চাহিবে আর?
নাথভুজে মাথা দিয়ে পড়েছে মোহিনী।
মুখে মুখে কাঁদে যেন ছুটি সরোজিনী ॥

ললিতার মুখশশী ভিজে বরিষায়।
সরোজ শিশির মাথা মাটিতে লোটায়॥
শীতল ললাটে জলে জলে শশধর।
জলে ভিজে পড়ে আছে অলকানিকর॥
লুটায় কবরী চারু, দীর্ঘ তৃণোপরে।
মন্মথ রয়েছে তবু নাহি তুলে ধরে॥
এখনো সুস্থির মুখ রূপের ছায়ায়।
প্রাণ গেল তবু রূপ নাহি ছাড়ে তায়॥
সেরূপ ঘুমায় যেন, সন্ধ্যা ধরাপরে:
ভয়ে প্রকৃতির যেন নিশ্বাস না সরে॥
স্থির শ্বেত ভাল সেই, নহে নিরমল।
দেখিলে শিহরি হয় শরীর বিকল॥
পড়ি তায় মরণের, ভয়ঙ্কর ছায়া।
চন্দ্রিকায় যেন কালো, কাদম্বিনী কায়া॥
যেন চন্দ্রকরে স্থির বারিধি বিস্তার।
পড়ে তায় শিখরীর ছায়া অন্ধকার॥
কোমল পল্লব নীল মুদেছে নয়ন।
এরি কি কটাক্ষে ছিল সুখের স্বপন?
এখনি কেঁদেছে কত কাঁদিবে না আর।
সফরী সমান নাহি নাচিবে আবার॥
বুঝি তার প্রিয় তারা মন্মথ বদনে।
চাহিতে চাহিতে বুঝি মুদেছে মরণে॥
মানবের কি কপাল! এই সে হৃদয়।
কোথা তার প্রেম মোহ কোথা আশা ভয়!
বিবাস বিমল পড়ি শশীর কিরণে।
ভিতরে নিস্পন্দ যেন জগৎ এক্ষণে॥
এক বৃন্তে দুটি ফুল মুখে মুখ দিয়ে।
সে হৃদি কুসুমাসনে পড়েছে ছিঁড়িয়ে॥
তেমনি একাঙ্গে এরা থেকে চিরকাল।
মরিল অধরাধরে কি সুখ কপাল॥

যার লাগি ছিল বেঁচে পারিত বাঁচিতে।
তারি সনে মরে গেল তাহারি হৃদিতে॥
সুখের কপাল! কত সংসার যাতনা।
বিকার বিয়োগ শোক সহিতে হলো না॥
ছিঁড়িয়াছে ভীম ঝড়ে একই প্রহারে।
কাটে নি ক্রমশঃ কীট, প্রাণের সুসারে॥
গভীর গোপনগামী দুখ-স্রোতোপরে।
পড়ে নাই ভেসে ভেসে ডুবিতে সাগরে॥
যা হবার হইয়াছে এই মাত্র স্থির।
এই আছে অবশেষ, সে প্রেমশরীর॥
ওইখানে দেহাম্বুজ মাটি হয়ে যাবে।
জানিবে কে? দেখিবে কে? কেঁদে কে ভিজাবে?

চন্দ্রিকার নীলাকাশ গায়, দুটি দেবদারু দেখা যায়।
ভীম বনে তলে তার, অতি স্তব্ধ অনিবার,
কাল যেন প্রহরী তাহায়॥
সেই নদী সেই তরুবরে, দুখময় তর তর স্বরে,
বারেক না ক্ষান্ত আছে, নক্ষত্রমণ্ডলী কাছে,
অদ্যাপি বিলাপ কেন করে॥
গম্ভীর সে ধ্বনি নিরবধি, যেন বা সন্ধ্যায় শরন্নদী।
শুনিলে শিহরি স্মরি, মেধার মারুতোপরি,
জানিনে যেতেছি কি জলধি॥
শ্যামলা গুল্মিনী চির নব, ব্যাপিয়াছে সেই স্থান সব।
তারাফুল তারা ধরে, অনন্ত আমোদ করে,
সুধাপানে শিহরিছে নভ॥
এ কাননে গভীর এমন, কে করে রে বাঁশরী বাদন।
অনিবার নিশাভাগে, যেন কার অনুরাগে,
গায় সাধে মনের যাতন॥

মোহমন্ত্রে তায় স্থির বন, শোনে ধ্বনি-বিহীন স্পন্দন।
পত্রটি নাহিক সরে, যেতে যেতে শুনে স্বরে,
নাহি সরে নীরধরগণ॥
চন্দ্রিকার শূন্য কুঞ্জোপর, মোহন স্বপ্নজ শোভাধর।
কারা যেন শুনে তায়, উড়ে নীল নভ গায়,
মর্ম্মরিত প্রচুর অম্বর॥
তাহে কত সুধাবাস ঝরে, কুসুম বরিষে কুঞ্জোপরে।
ভাঙ্গে স্বপ্ন ঊষা আসি, অমনি নীরব বাঁশী,
গল্যে যায় সে রূপ নিকরে॥
ধূলি হয়ে এই কুঞ্জবনে মন্মথ-মোহিনী নাথ সনে।
প্রতি নিশি এই মত, হয় যথা নিদ্রাগত,
ললিতা মন্মথ দুই জনে॥

মানস

ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে
গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিশ্যৈব বিচিত্রপাদপং
সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নির্বৃতিঃ॥

বাল্মীকি।

There is pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore.

Childe Harold

হা ধরণি ধর কি রে হৃদয়মণ্ডলে,
ধর কি কোথাও মম, মনোমত স্থলে?
কি আছে সংসারে আর বাঁধিবারে মোরে!
যে কালে কেটেছে কাল ভরসার ডোরে॥
মনে করি কাঁদিব না রব অহঙ্কারে।
আপনি নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে॥

গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধার।
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার॥
আঁধার নিকুঞ্জে যেন নীরবেতে নদী।
একাকী কুসুম তায় চলে নিরবধি॥
কারে নাহি বাসি ভাল, কেহ নাহি বাসে।
হৃদে চাপা প্রেমাগুন, হৃদয় বিনাশে॥
সংসার বিজন বন, অন্তরে আঁধার।
দেখিতে অপ্রেমী মুখ, না পারি রে আর॥
বিজন বিপিনময় দ্বীপে একা থাকি।
ভাবিয়া মনের দুঃখ ভ্রমিব একাকী॥
দেখিব দ্বীপের শোভা মোহিত নয়নে।
বিপিন বারিধি নীল বিশাল গগনে॥
চারি পাশে গরজিবে ভীষণ তরঙ্গে।
শ্বেত ফেনা শিরোমালা নাচাইব রঙ্গে॥
শিরে মত্ত সমীরণ, শব্দে মিশে তার।
থেকে থেকে রেগে রেগে ছাড়িব হুঙ্কার॥
নিরখিব নীরধারে, ভীষণ ভূধর।
ফুলায়ে বিশাল বক্ষ জলধি উপর॥
তুলিয়া ললাট ভীম প্রবেশে গগনে।
গরজে গভীর স্বরে নব মেঘগণে॥
পদে তার আছাড়িবে প্রমত্ত তরঙ্গ,
        বুকে তার প্রহারিবে পাগল পবন।
মহীধর মানিবে না অধমের রঙ্গ,
        ললাটের রাগে করি ভয় প্রদর্শন॥
কর্কশ সানুতে তার বিহরি বিজনে।
আ মরি এসব কবে হেরিব নয়নে॥
মোহে মন মজাইবে প্রকৃতি মোহিনী।
জীবন যাইবে যেন স্বপনে যামিনী॥
আলো মাখা কালো বাস উষা পরে যবে।
শুনিব সে তরতর জলনিধিরবে॥

দেখিব বিশাল বক্ষ মিলিছে আকাশে।
শ্বেত শশিছায়া নীলে ধীরে ধীরে ভাসে ॥
শিহরিবে হৃদি মোর, সে স্নিগ্ধ সমীরে।
পাশে কুঞ্জ লতা ফুল নাচাবে সুধীরে ॥
নিরখিব শশী শ্বেত গগনমণ্ডলে।
কত মেঘ বায়ুভরে শ্বেতাকাশে চলে।
গিরিপরে সুখ-তারা নেচে নিবে যায়।
যেন শেষ মন আশা নিরাশা নিবায় ॥
নাচাইবে কর তার জলের ভিতর।
তাহারি পানেতে চেঁয়ে রব নিরন্তর ॥
শুনিব সুরব মৃদু সমীরণ করে।
সুধার শিশির মাখা নিকুঞ্জ নিকরে ॥
পুলকে দেখিব আমি লোহিত আকাশে।
পয়োধির পাশ থেকে তপন প্রকাশে ॥
তরল তরঙ্গ মেঘ অনল সাগরে।
রবি নিজে নভরাজ দেখাইবে করে ॥
চঞ্চল সুনীল জলে তরুণ তপন,
        চিকিমিকি চিকিমিক নাচাইবে কর।
তরুলতা তৃণ মাঝে করিবে তখন,
        ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি নীহারনিকর ॥
দ্বিপ্রহরে ঘননীল বিমল অম্বরে,
রাগিয়া রহিলে রবি অনলসাগরে,
শ্বেত মেঘ অগ্নি মেখে ফিরিয়া বেড়ায়,
রব তবে অন্ধকার নিকুঞ্জ মাঝায় ॥
দীর্ঘ ভীম তরুগণ আচ্ছাদে আধার,
করিবেক চারুলতা স্নিগ্ধ চারি ধার ॥
নীরব নিশ্চল দীপে রহিবে সকল।
স্পন্দহীন পত্র আর কুসুমের দল ॥
শুনিব গরজে ঘোর তরঙ্গনিকরে।
অথবা বিদরে বন এক পিকস্বরে ॥

তরুলতা মাঝে দিয়া বিমল গগন।
কিম্বা জলে রবিকর হবে দরশন॥
কালো জলে ঢাকা দিলে প্রদোষ আঁধার—
অনিবার তরঙ্গর বিশাল বিস্তার—
সেই দুঃখস্বরে হৃদি, শিহরি চঞ্চল,
কাঁদিবে ; না জানি কেন আঁখিময় জল!
মনে হয় যেন কোন সুখের সঙ্গীত।
নাচাইয়ে হৃদি ভোরে জাগে আচম্বিত॥
আপনি ভাসিবে আঁখি দর দর ধারে।
অনন্ত স্মরিব চেয়ে পয়োধির পারে॥
নবীনা রূপসী একা কাঁপে এক তারা,
যেন নব প্রণয়িনী প্রণয়সাগরে।
ছেড়ে গেছে কর্ণধার একা পথহারা.
কত আশা কত ভয়ে কাঁপিছে অন্তরে।
যখন সন্ধ্যায় শ্বেত অর্দ্ধ শশধরে
ধীরে ধীরে ভেসে যাবে নীলের সাগরে
আকাশ বারিধি সনে করি পরশন
চারি পাশে ধরিবেক বিঘোর বসন
বারেক ভাবিব সেই রমণীরতন
রেখেছিল বেঁধে যার প্রেমমোহে মন॥
যবে ভাসি অর্দ্ধ শশী তারাময়াকাশে
স্বপ্নভূমি সম ধরা অস্পষ্ট প্রকাশে
ঝর্ঝর বাতাস বয় ক্ষীণালোকে যবে
ধাইবে সমুদ্র স্থির:অনিবার রবে
অনিবার সর সর উর্দ্ধে তরঙ্গণ
দেখিব মিশিবে শূন্যে রমণীরতন॥
আঁখি'আর নীলাকাশ মাঝে তার ছায়া।
আলোময় বেশে সেই ফুলময় কায়া॥
নিবিড় কুন্তল দাম খেলিছে পবনে।
মৃদু স্থির মোহময় প্রণয় বদনে॥

দেখিতে দেখিতে মোহে হারাব চেতন।
চেয়ে রব ; জানিব না মিলাল কখন ॥
পূর্ণ শশী মোহমন্ত্রে চন্দ্রিকায় যবে
গিরি বারি বনাকাশ নিদ্রিত নীরবে ॥
মনঃসুখে মনোদুখে মোহিত হৃদয়ে।
তার মাঝে বেড়াইব চারু তরি লয়ে ॥
ভাসিবে নিবিড় নীলে একা শশধর।
দেখিব জ্বলিছে স্থির নক্ষত্রনিকর ॥
পাশে নীল জল স্থির রব অনিবার।
যেমন স্বপনে কথা যৌবনে আশার ॥
একবার পরশিবে মলয়সমীরে।
যেমন সে পরশিত ভাগীরথীতীরে ॥
ধূমেতে আকাশে মিশে তরুদলতীরে।
পরস্পর গায় পড়ে ঢলে ধীরে ধীরে ॥
প্রেমমোহ ভরে যেন, আবেশের রঙ্গে।
প্রণয়ী ঢুলিয়া পড়ে প্রণয়ীর অঙ্গে ॥
ভীম স্থির মাঝে কোন রব শুনিব না।
তবে যদি নিরুপমা স্বর্গীয় ললনা
শূন্যভরে শশিকরে স্বপ্নসম মিশে,
 বাজায় মুরলী মৃত মনোমোহ ভরে,
প্রকাশিয়ে যত জ্বালা প্রণয়ের বিষে,
 গভীর কোমল ধীর যাতনার স্বরে ॥
মনোসাধে মজে তায় ভাবিবেক মন,
স্বপনে নিরাশা সঙ্গে আশার মিলন ॥
মরি রে মোহিত মনে শুনিব সে স্বরে,
 মোহভরে মুখ পানে চেয়ে রব তার।
হা বিধাতঃ বল বল বারেক বল রে ;
 হবে কি এমন দিন কপালে আমার ॥
অথবা দেখিব স্তব্ধ লতিকার কুঞ্জে।
জলে যথা শশিকর স্থির পাতাপুঞ্জে ॥

নবীন কুসুম হাসি ছাড়িছে সুবাস।
যেন তৃণ লতা মাঝে নক্ষত্র প্রকাশ॥
দেবের ললনা দলে নাচে মাঝে তার।
চন্দ্রের কিরণে যেন চম্পকের হার॥
শত বীণা স্বর্গস্বরে অম্বরে বাজায়।
শত গান এক সুরে শূন্যেতে মিশায়॥
ঝরে ফুল জ্বলে মণি দেহের বর্ত্তনে।
কতই তরঙ্গ বয় আলোক বসনে॥
তারা গেলে হবে কুঞ্জে বিজন আঁধার।
একাকী কাঁদিব দেখে ঝরা ফুলহার॥
নিমিষে ঘুচিবে স্বপ্ন বিজনমণ্ডলে!
সেই ফুল সেই লতা ধীরে ধীরে দোলে॥
কাননে সাগরে যবে অমাবস্যা বসি—
কালো মেঘে ঢাকা শির ভীষণ রাক্ষসী—
গিরিগুহা মাঝে গর্জ্জে ক্রোধ ঝটিকার।
শুনে তাহে মিশাইব, অংশ হব তার॥
ভীমরণে প্রাণপণে পাগল পবন।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাগে করে গরজন॥
গরজিবে রেগে রেগে অসংখ্য তরঙ্গ।
তমোমাঝে শ্বেত ফেনা আছাড়িবে অঙ্গ॥
শুনিব গভীর ধীর জলধরধ্বনি।
ফাটাবে গগন হৃদি চেচায়ে অশনি॥
উপরি উপরি রেগে ছিঁড়িবে শিখর।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে যেন হতেছে সমর॥
ভয়ঙ্কর ভূতগণ, নেচে নেচে ঝড়ে,
        উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিবেক ঝড়নাদ সঙ্গে।
বিকট বদন ভঙ্গী গিরি পরি চড়ো,
        ভীম শ্বেত দন্তাবলী দেখাইবে রঙ্গে॥
পরেতে গভীর স্থির জগৎসংসার।
কাঁদিয়া ঘুমালো যেন নবীন কুমার॥

যেন তাঁর করুণার প্রতিমা প্রকাশ ।
পূজিব গভীর মোহে, বিগত বিলাস ॥
সঁপিয়া জীবন মন, যৌবন রতন ।
এমন সুধীর মনে হইবে পতন ॥
ভাবিব ঝটিকা মত ছিল মম মন ।
এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন ॥
কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন ।
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন ॥
অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়িব এ দেহ ।
জানিবে না শুনিবে না কাঁদিবে না কেহ ॥
অনিবার জলরব কাঁদিবে কেবল ।
আছে কি পৃথিবি হেন বিমোহন স্থল !

পাঠভেদ

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁহার কাব্য ও কবিতার এবং কাব্যাত্মক কয়েকটি গদ্য-নিবন্ধের এই সংগ্রহ মাত্র দুই বার মুদ্রিত হয়; প্রথম—'কবিতাপুস্তক' নামে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে; তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' (১৮৫৬ খ্রীঃ) এই সংগ্রহে সংশোধিত ও পুনর্লিখিত হইয়া মুদ্রিত হয়; দ্বিতীয়—'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' নামে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে; সমগ্র 'কবিতাপুস্তক' ছাড়া ইহাতে 'প্রচার' হইতে দুইটি এবং 'বঙ্গদর্শন' হইতে একটি রচনা সন্নিবিষ্ট হয়।

'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস'-এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪১।

'কবিতাপুস্তক'-এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১২।

'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'-এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৪৪।

'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তকে'র সহিত 'কবিতাপুস্তকে'র পার্থক্য যৎসামান্য—নিম্ন-লিখিত পাঠভেদগুলি উল্লেখযোগ্য।—

পৃ. ৬৭, পংক্তি ৬-৭, 'এ আগুন হৃদয়ে করে?' কথাগুলির স্থলে 'এ আগুন হৃদয়ে ধারণ করে?' ছিল।

পৃ. ৬৮, প, ১৭, 'পৃথিবীবাসিগণ' কথাটির পরিবর্তে 'পৃথিবীবাসিনীগণ' ছিল।

পৃ. ৯১, সংস্কৃত শ্লোকটি প্রথম সংস্করণে বাংলা হরফে, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে দেবনাগরী হরফে ছিল।

পৃ. ৯৪, প, ১০, 'অনন্ত' কথাটির স্থলে 'স্বদেশ' ছিল।

'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত হইয়া 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তকে' কিঞ্চিৎ ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই পার্থক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

পৃ. ৭৫, ১৬ পংক্তির পরিবর্তে ছিল—পবন চলিছে তায়, সর্‌সর্‌ স্বরে॥

১৯-২২ " " "—তীর তরুশাখা সব, জলে পরিণত।
গভীর নিস্পন্দ কায় যেন নিদ্রাগত॥
রেখে স্থির নীরে শির ক্ষুদ্র তরুগণ।
কলিকাগুবন্দময় নিদ্রায় মগন॥

পৃ. ৭৫, ২৬ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—কোন কীট পতঙ্গাঘাতে নাড়া দেয় বনে ॥
২৮ " " "—কোন ভীম পশু ছাড়ে, নিশ্বাস গভীর ॥

পৃ. ৭৬, ৪ " " "—ভীম স্তব্ধে বনাকাশ, উঠে শিহরিয়ে ।
৬ " " "—যেন কোন সুখময়ী মলো প্রেমভরে ॥
১০ " " "—কিছুই না জেনে তবু, সলিল নয়নে ॥
১০ " পর "—কখন গম্ভীরতর পূর্ণতান ধরে ।
সুগভীর মোহে মন গুমুরিয়ে মরে ॥

১৩ ১৪ পংক্তি দুইটি ১১ ১২ পংক্তির পূর্ব্বে ছিল ।

পৃ. ৭৬, ২৯ পংক্তির পর ছিল— যেন যে মধুর ডোরে বাধা তায় মন ।
স্বর্গ সুখ তরে তার না চাই ছেদন ॥
যে রূপ যৌবন মোহে কবিরা ধেয়ায় ।
বারেক স্বপনে আসি হাসে আর যায় ॥
কি গভীর নিরমল প্রেমের প্রতিমা ।
ইচ্ছা করে পায়ে ধরি পূজি সে মহিমা ॥

পৃ. ৭৭, ৪ পংক্তির পর ছিল— কত মোহে গলে হৃদি প্রকাশ না হয় ।
গোপনে উন্মাদ প্রাণ হৃদি বিদরয় ॥

৯-১১ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—ললিত সে নীল আঁখি মজে মন তার ।
কিছুই যেন বা আর না ধরে সংসার ॥
প্রাণ মন জ্ঞান ধন জীবন যৌবন ।
সকলি করেছে যেন তায় সমর্পণ ॥
এমন আশায় তার হৃদয় না চায় ।
সে স্তব্ধে হৃদয়াঘাত যেন শোনা যায় ॥
কোথা হতে আসে সেই সুমধুর গান ।
তাহে কেন আশাভরে মোহে তার প্রাণ ॥

পৃ. ৭৭, ১৩ পংক্তি হইতে পৃ. ৭৮,
১৬ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—ললিতা সে রাজাঙ্গনা, জনক তাহার ।
প্রেম দোষে পাঠাইল কানন মাঝার ॥
মরি তার সর্ব্ব সার কমলা সে কলি ।
কোন প্রাণে পদতলে ফেলিল তা দলি ॥
কি কায রাজ্যেতে তার তারে দিয়ে জ্বালা ।
যৌবনের দোষ সে যে কি করিবে বালা ॥
যৌবন যামিনী মাঝে শশধর তার ।
প্রাণ মন ধন জ্ঞান যাহে ললিতার ॥

সে মন্মথে প্রাণ মন সঁপিল গোপন।
বলে বুঝি এই মত কাটাবে জীবন॥
একাকিনী তারে যবে দিয়ে এলো বনে।
তখন বুঝি বা কত ভয়ে মলো মনে॥
আ মরি সে কাননে কি স্বর্গপুরে যায়।
ভুলিল ভুলিল এক গভীর চিন্তায়॥
হারাতে কি আছে আর কি ভয় কাননে।
সংসার সকলি বন বিনে এক জনে॥
চাঁদমুখ দেখা যদি পেত একবার।
তাই ভেবে যেত সুখে চিরদিন তার॥
জীবনে যে দিগে চায় শুধু শূন্যময়।
গতসুখ কালসাপ কাটিছে হৃদয়॥
একাকিনী রাজাঙ্গনা নিবিড় নিশায়।
গেছে সুখ গেছে মান প্রাণ বুঝি যায়॥
এ সব ত্যজিতে পারে যার মুখ দেখে।
হে বিধি এখন তারে কোথা দিলি রেখে॥
যেন নভ রবি শশী তারা মেঘহীন।
আশা ভয় সুখ বিনা যাবে তার দিন॥
মোহিনী কুসুম কলি হৃদয়ে পালিল।
কণ্টক কাননে কেন ছিঁড়িয়া ফেলিল॥
মলয়ে যে শিহরিত ঝটিকা কি সবে।
একাকিনী ধরি মাটি মাটি হয়ে যাবে॥
এমন চিন্তায় ধনী এলো নদীস্থান।
পুলকে আপনি হৃদি কাঁপে শুনে গান॥
নদী দিয়ে আসিতেছে একা এক তরি।
তাহে নব যুবা এক গাহিছে বাসরী॥
একবার বলে বটে আমারি মন্মথ।
তখন নিভায় বুঝে মিছে মনোরথ॥
বিধি কেন লিখিবে তা আমার কপালে।
কিন্তু আর কেবা আসে এখানে একালে॥
পুলকে নিস্পন্দ বামা নাহি সরে কথা।
ইচ্ছা করে দেহ রেখে উড়ে যায় তথা॥

তীরে আসিয়াছে তরি অতি দ্রুত হয়ে।
দেখিতে দেখিতে ডুবে ডুবের হৃদয়ে॥

(৪)

দুজনে দুজনে পেয়ে, দুজনার মুখ চেয়ে,
অনিমিক্ ঝরিছে নয়ন।
হৃদয়ে ভাসিছে হৃদি, কেন কেন আরে বিধি,
সে সময় হলো না মরণ॥
কপালে কি হয় কবে, আর কি কখন হবে,
এমন অচেত সুখক্ষণ।
যেন সুখ জপি মনে, দুখের গভীর বনে,
একা ভয় না হয় কখন॥
"ললিতে ললিতে কিরে, পুনঃ কি পেয়েছি ফিরে,"
কহিল মন্মথ বহুক্ষণে।
আর না বচন সরে, নীরবেতে আঁখি ঝরে,
চেয়ে রয় মন্মথ বদনে॥
লেখা তথা প্রেমাক্ষরে, যে মন্ত্রে মোহিত করে,
রহিবারে এ ছার জীবনে।
"হা বিধি" এ শব্দ করে, রহিল তাহার ধরে,
মনঃকথা সুনীল নয়নে॥
আ মরি বিধির বিধি, না রয় এ সুখনিধি,
মানবের ললাটে লিখন।
ঘুচে গেল মোহ ঘোর, বলে প্রাণনাথ মোর,
ছেড়ে যাবে আর কি কখন॥
"না লো না" মন্মথ কয়, "য দিন জীবন রয়,
হৃদয়ে রাখিব তোমা ধনে।"
বামা বলে বল পতি, কেন একা বনে গতি,
আমি হেথা জানিলে কেমনে॥

৫

মন্মথ।

"আজি দিবা দ্বিপ্রহরে, নাহি জানি নিদ্রাভরে,
কি কাল ঘটেছে আচম্বিতে।
না জানি কিসের লাগি, জলের কল্লোলে জাগি,
দেখি আমি একা এ তরিতে॥

জুয়ারে পুরেছে নদী, তরং নিরবধি।
নাচে তাহে শশীর কিরণ।
রবে হলো ভয় প্রাণে, বিস্ময় হলেম স্থানে,
দেখি এই বন্ধুর লিখন॥
'রাজা জানে বিবরণ, ললিতারে দেছে বন,
তব প্রাণ বধিবে আপনি।
তোমাকে নিদ্রিত লয়ে, এনেছি এখানে বয়ে,
তরি লয়ে পলাও এখনি॥
তব প্রিয় বন্ধু ক * *'

৬

"পড়িলাম কাল লিপি মস্তক ঘুরিল।
যেন ধরা অন্ধকারে ঘুরিতে লাগিল॥
জানিতে পারিনে পরে কি হলো আমার।
ছিল কি জীবন মম ছিল কি সংসার॥
প্রলয় পবনে যদি ব্রহ্মাণ্ড ফাটিত।
আমার গভীর মোহ ভাঙ্গিতে নারিত॥
ভাবি নাই, কাঁদি নাই, কথা নাই আর।
ছাড়ি নাই দীর্ঘ শ্বাস, ছাড়িনে হুঙ্কার॥
দেখি নাই, শুনি নাই, হলেম পাথর।
জানি নাই নভ নদী ছিল শোভাকর॥
চেয়ে দেখি ধরা পানে প্রান্তর প্রাকার।
জীবহীন, তরুহীন, কর্কশ, আধার॥
চাহিতাম ধরণীর তখনি দহন।
যদি না ধরিত তায় এক প্রিয়জন॥
সে মোহ ভাঙ্গিল পড়ি নিশ্বাস গভীর।
যেন তাহে খণ্ডে২ ফাটিল শরীর॥
আপনি আলোকে তরি ধীরে২ যায়।
আর কোথা রবে, যাক্, যথায় তথায়॥
ভাবি লয়ে যাক্ কোন অগম্য সাগর।
নীরব নিশীথ যথা বসি নিরন্তর॥
ললিতা কাননে? বালা, একা এ যামিনী।
আমারে সুঁপিয়া প্রাণ কাননে কামিনী॥

আমারি লাগিয়া বনে গেছে প্রেমাধার।
হা ধরণি খণ্ডে খণ্ডে হও রে বিদার ॥

পৃ. ৭৮, ১৭ পংক্তির '৪' সংখ্যাটি '৭' ছিল।
১৮-২৫ পংক্তিগুলি ছিল না।

পৃ. ৭৯, ৫ পংক্তির পরিবর্তে ছিল—ভয়েতে গগন পানে, চাহিলে মোহিল প্রাণে,
৮ ,, ,, ,, —শুধু এ হৃদয় কেন, ঝটিকায় মেতেছে ॥
১৩ ,, '৫' সংখ্যাটি '৮' ছিল।
২৮ ,, পরিবর্তে ছিল—হয়ে চমকিত, প্রতি এই ভীত,

পৃ. ৮০, ৪ ,, ,, ,, —কভু আর ছাড়াবে ॥
৫ পংক্তির '৬' সংখ্যাটি '৯' ছিল।
২৬ পংক্তির পর ছিল—পিতার সাম্রাজ্য, নাহি তাহে কার্য্য,
লউক্ না সে যে কেহ।
খেয়ে বনফল, খেয়ে নদীজল,
পালন করিব দেহ ॥

পৃ. ৮১, ৬ পংক্তির পর ছিল—চল আসি গিয়ে, ভ্রমিয়ে দেখিয়ে,
কেমন এ মহাবন।
শ্রান্ত আছ শ্রমে, কোন ঋষ্যাশ্রমে,
করি গিয়ে নিকেতন ॥
১২ পংক্তির পরিবর্তে ছিল— অন্ত মণি নিভায় নিভায় ॥
১৩ ,, ,, ,, —যেন লক্ষ বিদ্যাধরে, সদা তারা গান করে,
২৪ ,, পর ,, —যেন বা বারিধি পরে, সঙ্গীহীন দৃষ্টি করে,
প্রভাতের প্রিয় তারা করে।
মোহকর মনোদুখে, শুধু ভেবে সেই মুখে,
মন মজে সুখের বিকাবে ॥
যদি কোন মতে তায়, আঁখির মিলন পায়,
যেন তায় দুখী বনে বসি।
দেখে ভমস্বিনী ভাগে, ভীম ঝটিকার রাগে,
ঘন মাঝে ক্ষণ দৃষ্ট শশী ॥

পৃ. ৮২, ৪ পংক্তির পর ছিল— দেখ দেখি প্রণয়ের কত চতুরালি।
চলিল আঁধার বনে রাজার দুলালি ॥

পৃ. ৮৩, ৭ পংক্তির পরিবর্তে ছিল— হৃদয়ে গাঁথিল আমরি মরি।

পৃ. ৮৪, ৪ ,, ,, ,, — যেন কোন স্বপ্নে দেখা মত শোভাময় ॥
১০ ,, ,, ,, — দেব কি মানব রক্ষ জানা যাবে তবে ॥
১৭ ,, ,, ,, — এমন বিমল প্রেম গভীর এমন ॥

পৃ. ৮৫, ১০ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল —প্রেয়সীরে কহিছে মন্মথ, ধনি লো ধ্বনি কি মনোমথ।
১৫ „ পর „ —এ ধ্বনিতে বুঝি অনুভবে, বুঝি কোন দেবতারা হবে!
আমাদের নরনিলা, এ স্থানেতে নিরখিলা,
অপবিত্র হলো হেথা ভবে॥
এমন ভাবিয়ে স্থানান্তরে, গিয়ে বুঝি তাই ধনি করে
বুঝি বা হয়েছে দোষ, দেবতা করেছে রোষ,
চল তথা তুষিবার তরে॥

পৃ. ৮৫, ২৬ পংক্তির পর ছিল— পৃথিবীতে সুখ কিরে নাহিক কপালে।
হে ঈশ্বর ক্রোড়ে করি লও এই কালে॥

পৃ. ৮৬, ১৪ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল— পেয়ে লক্ষ অদর্শন, কুসুমের বাস।
১৬-১৭ „ „ „ — পত্র আচ্ছাদন তলে, ক্ষুদ্র খাল বয়।
আঁধার ঈষৎ দেখি, রবহীন রয়॥
২১ „ „ „ — কলঙ্কিনী বিরহিনী নাথ আশা প্রায়॥
২৬ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল— ভীম স্তব্ধ ভয়ে স্তব্ধ বসি তারা তথা।

পৃ. ৮৭, ৮ „ পর „ — ধরিয়াছে প্রাণ তারা পরস্পর তরে।
মের না মের না বিধি মের না অন্তরে॥
১৮ পংক্তির '১০' সংখ্যাটি ছিল না।
২১ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল— সমুদ্র কল্লোল সোরে, পবন পাগল জোরে,
২৬ „ „ „ — ভীম২ মহীরুহগণ॥
২৭ „ „ „ —ঘোর ভীম চীৎকার, লক্ষ২ অনিবার,

পৃ. ৮৮, ৬ „ „ „ — কাঁদে ঘোর সিংহ ব্যাঘ্রগণ॥
৭ পংক্তির '১১' সংখ্যাটি ছিল না।
১৬ পংক্তির '১২' সংখ্যাটির স্থলে '১০' ছিল।
১৭-১৮ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—থামিল ঝটিকারণ, দেখি নিশাশেষ।
শ্বেত মেঘময়াকাশ, ক্ষীণাজী নিশেশ॥
২৬ „ পর „— যতন কুসুম কলি যদি যত আশ।
বারেক পবনাঘাতে হয় হেন নাশ॥
এই কি ললিতা ছিল এই কি মন্মথ।
যে প্রেম দেখ যে এসে কি রত্ন বিগত॥

পৃ. ৮৯, ৭-৮ „ „ „— এখনো গম্ভীর স্থির বসি ম্লান মুখে।
ছাড়িবার মমতায়, মোহময় দুখে॥

পৃ. ৮৯, ১০ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল —নিস্তব্ধে ভয় পেয়ে, নিশ্বাস না সরে ॥

১২ „ „ „ —দেখিলে শিহরি হয় শরীর শীতল ॥

২০ „ „ „ —সফরী সম না নীল নাচিবে আবার ॥

পৃ. ৯০, ১৫ „ „ „ — অদ্যাবধি প্রহরী তাহায় ।

পৃ. ৯১, ১২ „ „ „ — প্রেম হৃদি রতন দুজনে ॥

২৫ „ „ „ —যে কালে কেটেছে কাল প্রণয়ের ভোরে ॥

২৫ „ পর „ —এক মাত্র সুখ মম ছিল যে সংসারে,
আঁধার জীবনাকাশে একাকিনী তারা ।
একবার জ্বলিয়ে সে মিশেছে আঁধারে,
সংসার জন্মেরি মত হইয়াছে সারা ॥
যেতে যদি চিহ্ন মাত্র রাখিয়ে আমায় ।
ভিজাতেম আঁখি জলে, বুকে করি তায় ॥
অনিবার দহে হৃদি একই যাতনা ।
সে যেন জীবন মাঝে, একই ঘটনা ॥
হৃদয় কুসুম যারা ভাবিত আমায় ।
কে জানে কেন রে আর, ফিরিয়া না চায় ॥
তবু যে বাসিত ভাল মুছাতো নয়ন ।
তাহারো হয়েছি বিষ কপাল যেমন ॥

পৃ. ৯২, ২ পংক্তিটি ১ পংক্তির পূর্ব্বে ছিল ।

৮ পংক্তির পর ছিল —রব না তাদের মাঝে, সে নাই যেখানে ।
ধর কি ধরণি মম মনোমত স্থানে ॥

১০ „ পরিবর্ত্তে „ —ভাবিয়া হৃদির জ্বালা ভ্রমিব একাকী ॥

১৪ „ „ „ —শ্বেত ফেণা শিরোমালা নাচাইয়া রঙ্গে ॥

১৬ „ „ „ —থেকে২ বেগে২ ছাড়িবে হুঙ্কার ॥

পৃ. ৯২, পং ২৯-৩০,
এবং পৃ. ৯৩, পং ১এর „ „ —আলো মাখা কালো বাস পড়িলে উষায় ।
অনিবার ভয়ঙ্কর জলনিধি ধায় ॥
মিশায় বিশাল বক্ষ অন্তরে আকাশে ।

পৃ. ৯৩, ১৬ পংক্তির „ „ —নিজে রবি নভরাজ দেখাইছে করে ॥

পৃ. ৯৪, ৭ „ „ „ —যেন সুখ কালে শোনা সুখের সঙ্গীত ।

১০ „ „ „ —স্বদেশ স্মরিত চেয়ে পয়োধির পারে ॥

পৃ. ৯৪, ২০ পংক্তির পর ছিল —অন্ধকারে স্থির স্রোতে অন্ধকার বনে।
যেন বালা জ্বালা দীপ একা ভেসে যায়।
এক আলো ছিল প্রিয়ে আঁধার জীবনে।
কেন রে সমীর কাল নিভালে রে তায়॥
এমনি বিপিন মাঝে এমনি সময়ে।
ভাবিব সঁপেছি কত হৃদয়ে হৃদয়ে।
এমনি করেছে কেঁদে তর২ বারি।
নয়ন মুদিল যবে রতন আমারি॥

২৬ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল—দেখিব মিশিবে শূন্যে প্রাণেরি রতন।

পৃ. ৯৪, পং ২৯-৩০, এবং পৃ. ৯৫,
১ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল —সেই সে কুন্তল মাঝে খেলিছে পবনে।
সেই স্থির মোহময় প্রণয় বদনে॥
গভীর দর্শন মোহে ভুলিব দর্শন।

পৃ. ৯৫, ৪ পংক্তির পর ছিল —চন্দ্রিকায় ভীম স্থির নীল জলধির।
চকমক্ নাচে তায় কিরণ শশীর॥

১০ পংক্তির পরিবর্ত্তে ছিল —যেমন স্বপনে কথা প্রণয়ী বামার॥

২৯ „ „ „ —অথবা দেখিব শুষ্ক লতিকার কুঞ্জে।

পৃ. ৯৬, ৬-৮ „ „ „ —শত গান গন্ধ সনে শূন্যেতে মিশায়॥
ঝরে ফুল জলে মণি ফেরে যত ভাবে।
রতন বসন রয় কখন কি ভাবে॥

১১ „ „ „ —নিমিষে ঘুচিল স্বপ্ন মোহিনী মণ্ডলে।

১৫ „ „ „ —গিরি গুহা হতে শিরে ক্রোধ ঝটিকার।

২১ „ „ „ —গভীর গম্ভীর ধীর জলধর ধ্বনি।

২৪ „ „ „ —সবে যেন কন স্রষ্টা, "প্রলয় রে নর॥"

২৮ „ পর „ —বারেক চমকে দেখি চপলা কারণ।
কড়মড় করি করে মানুষ চর্ব্বণ॥
মর্ত্ত হয়ে শুনিব সে ভীষণ সঙ্গীতে।
সে যদি গিয়াছে আর ভয় কি এ চিতে॥

পৃ. ৯৭, ৬ „ পর „ —মনের মানস এই রই হেন স্থলে।
ধেয়াইব শশিমুখী নয়নের জলে॥

৯ „ পরিবর্ত্তে „ —প্রিয়া মৃত্যু মুখ স্মরি ছাড়িবে এ দেহ।

বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত

[১২৯০ সালে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৪৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র ১৩৫১,
তৃতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ ১৩৫৯

মূল্য বারো আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
৭.২—২০।৭।১৯৫২

ভূমিকা

১২৮৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে) 'বঙ্গদর্শনে' (পৃষ্ঠা ২৪১-২৬৪) "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" প্রকাশিত হয়। ইহা "শ্রীদর্পনারায়ণ পূতিতুণ্ড প্রণীত" বলিয়া উল্লিখিত ছিল। ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন; মানসম্ভ্রম এবং অর্থাগমের দিক্ দিয়া তখন তাঁহার জীবন খুবই সুখপ্রদ ছিল বলিতে হইবে, এখানেই তিনি বৰ্দ্ধমানের বিভাগীয় কমিশনারের অস্থায়ী পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট নিযুক্ত হন। ঠিক এই কালেই মুচিরাম-জাতীয় জীবেদের প্রতি তিনি কেন এরূপ বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা বুঝা কঠিন। বঙ্কিমের এক জন জীবনীকার তাঁহার অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি পদলাভ ও পদচ্যুতির সহিত এই রচনাকে সম্পর্কিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই যদিও তিনি সেক্রেটারি পদ গ্রহণ ও পরিত্যাগের বিরক্তিকর অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, 'মুচিরাম' রচিত হয় তাঁহার সেক্রেটারি হইবার অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব্বে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৩২৭) পুস্তকের ২৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

> ...রাজপদে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সৌভাগ্যবলে অনুচিত সম্মান লাভ করে বটে এবং হয়ত যোগ্যতর অনেক ব্যক্তিও নানা ঘটনাচক্রে উপযুক্তরূপ সম্মান ও পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জীবনে সরকারের নিকট হইতে কখনও অনাদর পান নাই। এমত অবস্থায় মুচিরামের সৃষ্টি কেন এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে। তিনি নিজ সার্ব্বিসে এবং হয়ত নিজ ষ্টেশনেই নিজের পার্শ্বে অনেক মুচিরাম, ঘটিরাম দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরকারে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল। মুচিরামে বঙ্কিম পাঠকগণকে সেই হাস্যরসের ভাগ দিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে হাস্যের সঙ্গে যে বিদ্রূপের বিষজ্বালা মিশ্রিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে'র একটি মাত্র সংস্করণ "কলিকাতা, ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত" ও "শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত" হইয়াছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৭।

'বঙ্গদর্শন' হইতে পুনর্মুদ্রণের সময়ে "নবম পরিচ্ছেদে"র শিরোনামাটি (পৃ. ১৭) ভ্রমক্রমে বাদ পড়িয়াছিল।

বিজ্ঞাপন

পাঠকদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই গ্রন্থ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের লোককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। সাধারণ সমাজ ভিন্ন, কাহারও প্রতি ইহাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক যেরূপ মনুষ্যচরিত্র দেখিবেন, সেরূপ মনুষ্যচরিত্র সকল সমাজে, সকল কালেই বিদ্যমান। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজ, এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষ্য বটে ; কিন্তু তৎস্থিত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ তাহার লক্ষ্য নহে। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে, তিনিই ইহার লক্ষ্য, তবে ভরসা করি, তিনি কথাটা মনে মনেই রাখিবেন। প্রকাশে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখি না।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্য, কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেকপ্রকার বদমাইসি করিয়া থাকে। এ দেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত।

যশোদা দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কেন না, উচ্চবংশের কথা কিছুই বলিতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। গুড় শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে, তিনি মিষ্টবিশেষ হইতে জন্মিয়াছিলেন।

সাফলরাম গুড় কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সাধুভাষায় মোহনপল্লী, অপর ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘর কতক কৈবর্ত্তের বাস। গুড় মহাশয় মোনাপাড়ায় একমাত্র ব্রাহ্মণ—যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক সূর্য্যই দিনমণি, যেমন এক বার্ত্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফলরাম এক ব্রাহ্মণ মোহনপল্লী উজ্জ্বল করিতেন। শ্রাদ্ধশান্তিতে কাঁচা পাকা কদলী, আতপ তণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠী মাকালের পূজায়, অন্নপ্রাশনাদিতে নারিকেল নাড়ু, ছোলা, কলা আদি তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনক্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী এবং তদর্জ্জিত রম্ভাভোজনের হক্‌দার হইয়া মুচিরাম শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। দেখিয়া যশোদা, সেটা বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, অতিশয় গর্ব্বান্বিতা হইলেন। যথাকালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল মুচিরাম। এত নগেন্দ্র গজেন্দ্র চন্দ্রভূষণ বিধুভূষণ থাকিতে তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না, তবে দুষ্ট লোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো-কোলো কোঁকড়া-চুল নধরশরীর মুচিরাম দাস নামা কৈবর্ত্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কাণে মিষ্ট লাগিত।

যাহাই হউক, যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরাম শর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে "মা," "বাবা," "দু," "দে" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত হইলেন। তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজনে দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন। যশোদা কাঁদিয়া বলিতেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচ্‌লে হয়।

পাঁচ বৎসরে সাফলরাম গুড় মহাশয় কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচ বৎসরে পুত্রের হাতে খড়ি হয়। সর্ব্বনাশ! সাফলরামের তিন পুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই। মাগী বলে কি? যে দিন কথা পড়িল, সে দিন সাফলরামের নিদ্রা হইল না।

যমুনার জল উজান বহিতে পারে, তবু গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না। সুতরাং সাফলরাম হাতে খড়ির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিন ক্রোশের মধ্যে পাঠশালা বা গুরু মহাশয় নাই। কে লেখাপড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষণ্ণবদনে বিনীতভাবে যশোদা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে এই সম্বাদ-সুনিবেদিত হইলেন। যশোদা বলিলেন, "ভাল, তুমি কেন আপনিই হাতে খড়ি দিয়া ক, খ শিখাও না।" সাফলরাম একটু ম্লান হইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা আমি পারি, তবে কি জান, শিষ্যসেবক যজমানের জ্বালায়—আজি কি রান্না হইল?" শুনিবামাত্র যশোদা দেবীর মনে পড়িল, আজি কৈবর্ত্তেরা পাতিলেবু দিয়া গিয়াছে। বলিলেন, "অধঃপেতে মিন্সে—" এই বলিয়া পতিপুত্রপ্রাণা যশোদা দেবী বিষণ্ণমনে সজলনয়নে পাতিলেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন।

অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানুরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে— "পরা অপরা চ"—গাছে ওঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুরি। কৈবর্ত্ত যজমানদিগের কল্যাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। নারিকেলসন্দেশ এবং অন্যান্য যে সকল জাতীয় সন্দেশের সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহা সর্ব্বদা মুচিরামের ঘরে থাকিত, সে সকল মুচিরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। কৈবর্ত্তের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত—শুনা গিয়াছে, কৈবর্ত্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত।

নবম বৎসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল। তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিয়তম পুত্রকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইলেন। এক বৎসরে মুচিরাম সন্ধ্যা আহ্নিক শিখিয়াছিলেন কি না, আমরা জানি না। কেন না, প্রমাণাভাব। তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা আহ্নিক করেন নাই।

তৎপরে একদিন সাফলরাম গুড় অকস্মাৎ ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যশোদার আর দিন যায় না। যজমানদিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্ত্তেরা আর এক ঘর বামন আনিল। যশোদা অন্নকষ্টে—ধান ভানিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন মুচিরামের বয়স দশ বৎসর, কৈবর্ত্তেরা চাঁদা করিয়া একটা বারোইয়ারি পূজা করিল। যাত্রা দিবার জন্য বারোইয়ারি; কৈবর্ত্তেরা শস্তা দরে হারাণ অধিকারীকে তিন দিনের জন্য বায়না করিয়া আনিয়া, কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া, তিন রাত্রি যাত্রা শুনিল। মুচিরাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল। যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক শুনিয়াছিল—কিন্তু একটা আস্ত-যাত্রা এই প্রথম শুনিল: চূড়া ধড়া, ঠেঙ্গা লাঠি সহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহ্লাদ উছলিয়া উঠিল। নিশ্চিত সম্বাদ রাখি যে, পরদিন মুচিরাম, গালাগালি মারামারি বা চুরি বা মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই করে নাই।

মুচিরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথম দিন যাত্রা শুনিয়া বহু যত্নে একটা গানের মোহাড়াটা শিখিয়াছিল। পরদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া ফিরিতে লাগিল। দৈবাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, পুষ্করিণীতে হস্তমুখ-প্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন—প্রভাতবায়ুপরিচালিত হইয়া মুচিরামের সুস্বর অধিকারী মহাশয়ের কাণের ভিতর গেল। কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল,—মনের ভিতর গিয়া, কল্পনার সাহায্যে টাকার সিন্দুকের ভিতরও প্রবেশ করিল। অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেন—জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকীল মহাশয়েরা ইহার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন! তাঁহাদের কাছেও গলার আওয়াজ টাকার

আওয়াজে পরিণত হয়। উকীলবাবুদেরই বা দোষ কি—*Glorious British Constitution*! হায়! গলাবাজি সার!

অধিকারী মহাশয়—মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না—ব্রিটিষ পার্লিমেণ্টের মত এবঞ্চ কুরঙ্গিণীসদৃশ, মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ—অতএব তিনি হাত নাড়িয়া মুচিরামকে ডাকিলেন। মুচিরাম আসিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার যাত্রার দলে থাকিবে?"

মুচিরাম আহ্লাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না—তখনই সঙ্গে যায়। কিন্তু অধিকারী মনে করিল যে, পরের ছেলে না বলিয়া লইয়া যাওয়া কিছু নয়। অতএব মুচিরামকে সঙ্গে করিয়া তার মার নিকট গেল।

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল—সবে একটি ছেলে—আর কেহ নাই—কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এদিকে আবার অন্ন জুটে না—যদি একটা খাবার উপায় হইতেছে—কেমন করিয়াই বা না বলে? বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? আমি না দেখিতে পাই, তবু ত মুচিরাম ভাল খাইবে, ভাল পরিবে। যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিত না। অগত্যা পাঁচ টাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিল। তার পর আছাড়িয়া পড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুচিরাম অল্পদিনেই জানিল যে, যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায় না। অল্পদিনে মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছুটি করিতে করিতে সকল দিন আহার হয় না; রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল; গায়ে খড়ি উড়িতে লাগিল; অধিকারীর কাণমলায় কাণমলায় দুই কাণে ঘা হইল। শুধু তাই নয়; অধিকারী মহাশয়ের পা টিপিতে হয়, তাঁকে বাতাস করিতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্পদিনেই মুচিরামের সোণার মেঘ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল।

মুচিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ নহে। গীতের তাল যে, পুষ্করিণীতীরস্থ দীর্ঘ বৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাহার বহুকাল গেল। ফলে তালিমের সময়ে তালের কথা পড়িলে, মুচিরাম অন্যমনস্ক হইত—মনে পড়িত, মা কেমন তালের বড়া করে!—মুচিরামের চক্ষু দিয়া এবং রসনা দিয়া জল বহিয়া যাইত।

আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়—কিছুতেই মুখস্থ হইত না—কাণমলায় কাণমলায় কাণ রাঙ্গা হইয়া গেল। সুতরাং আসরে গায়িবার সময়ে পিছন হইতে তাহাকে বলিয়া দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাঁধিত—সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে পারিত না। একদিন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—

"নীরদকুন্তলা—লোচনচঞ্চলা
দধতি সুন্দররূপং"

মুচিরাম গায়িল—"নীরদ কুন্তলা—" থামিল—আবার পিছন হইতে বলিল, "লোচন-চঞ্চলা"—মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গায়িল, "লুচি চিনি ছোলা"। পিছন হইতে বলিয়া দিল, "দধতি সুন্দররূপং"—মুচিরাম না বুঝিয়া গায়িল, "দধিতে সন্দেশ রূপং"। সেদিন আর গায়িতে পাইল না।

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত—কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইত—কেবল "আ—বা—আ—বা ধবলী"টি মুখস্থ ছিল। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে—পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে বলিতে হইবে, "মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও।" মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতক দূর বলিল, "মানময়ি রাধে, একবার বদন তুলে—" সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া বলিতেছিল, "গুড়ুক খাও—" শুনিয়া মুচিরাম বলিল, "রাধে—একবার বদন তুলে—গুড়ুক খাও।" হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না—হাসি কিসের—যাত্রা ভাঙ্গিল কেন? কিন্তু যখন দেখিল, অধিকারী সাজঘরে আসিয়া একগাছা বাঁক সাপটিয়া ধরিয়া, তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝিল যে, এই বাঁক তাহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা—অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মুচিরাম অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

অধিকারী মহাশয় বাঁকহস্তে তৎপশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, তাহার ও তাহার পিতৃপিতামহ, মাতা ও ভগিনীর নানাবিধ অযশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মুচিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া অস্ফুটস্বরে অধিকারী মহাশয়ের পিতৃমাতৃ সম্বন্ধে তদ্রূপ অপবাদ রটনা করিতে লাগিল। অধিকারী মুচিরামের সন্ধান পাইয়া, সাজঘরে গিয়া বেশ ত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। দেখিয়া মুচিরাম বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া, রুদ্ধদ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া অধিকারীকে নানাবিধ অবক্তব্য কদর্য্য ভাষায় মনে মনে সম্বোধন করিতে লাগিল; এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উত্থিত করিয়া তাহাকে কদলীভোজনের অনুমতি করিল। তৎপরে রুদ্ধ কবাটকে বা কবাটের অন্তরালস্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাথি দেখাইয়া, মুচিরাম ঠাকুরবাড়ীর মন্দিরের রোয়াকে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া অধিকারী মহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুনিলেন, মুচিরাম আইসে নাই—কেহ কেহ বলিল, তাহাকে খুঁজিয়া আনিব? অধিকারী মহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, "জুট্‌তে হয়, আপনি জুট্‌বে, এখন আমি খুঁজে বেড়াতে পারিনে।" দয়ালুচিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল, "ছেলেমানুষ—যদি নাই জুট্‌তে পারে—আমি খুঁজে আনিব।" অধিকারী ধমকাইলেন—মনে মনে ইচ্ছা, মুচিরামের হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকাগুলি ফাঁকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবিল—মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে। আর কিছু বলিল না।

যাত্রার দল চলিয়া গেল—মুচিরাম জুটিল না। রাত্রিজাগরণ—দেবালয়বরণ্ডে সে অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল; এমন বুদ্ধি নাই যে, অধিকারী কোন্ পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়। কেবল কাঁদিতে লাগিল। পূজারি বামন অনুগ্রহ করিয়া বেলা তিন প্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিল। খাইয়া, মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিল।' যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে লাগিল—আমি কেন পালাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না!

গ্রন্থকার ভনে, এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ পাতিয়া দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপচৌদ্দপুরুষ বুড়া সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্য জগতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাঁকপেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না—রাখাল ছাড়া কি গোরু থাকিতে পারে হে বাপু? ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, তোমাদের যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঈশানবাবু একজন সৎকুলোদ্ভূত কায়স্থ। অতি ক্ষুদ্র লোক—কেন না, বেতন এক শত টাকা মাত্র—কোন জেলার ফৌজদারী আপিসের হেড কেরাণী। বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর, তার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী চরণ-শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।

ঈশানবাবু ক্ষুদ্র ব্যক্তি—ল্যাজ খাটো, বানরত্বে খাটো—কিন্তু মনুষ্যত্বে নহে। যে গ্রামে হারাণ অধিকারী সেই অপূর্ব্ব মানভঞ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশানবাবুর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটা যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছুটি লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। যাত্রার ব্যাপার তিনি কিছু জানিতেন কি না বলিতে পারি না। যাত্রার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি পথে বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন, একটি ছেলে—শুষ্কশরীর, দীর্ঘকেশ—অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে—পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

ঈশানবাবু ছেলেটির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ্‌ছিস্ কেন বাবা?" ছেলে কথা কয় না। ঈশানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

ছেলে বলিল, "আমি মুচিরাম।"

ঈশা। তুমি কাদের ছেলে?

মুচি। বামনদের।

ঈশা। কোন্ বামনদের?

মুচি। আমি গুড়েদের ছেলে।

ঈশা। তোমার বাড়ী কোথায়?

মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া।

ঈশা। সে কোথা?

তা ত মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে। যাই হৌক, ঈশানবাবু অল্প সময়ে মুচিরামের দুর্ঘটনা বুঝিয়া লইলেন। "তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব" এই বলিয়া মুচিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন। মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশানবাবু তাহার আহারাদি ও অবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মোনাপাড়ার ত কোন ঠিকানা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশানবাবুর গৃহে বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহার পরিচ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম, এবং কাণমলার অত্যন্তাভাব, দেখিয়া মুচিরাম বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না।

এদিকে ঈশানবাবুর ছুটি ফুরাইল—সপরিবারে কর্ম্মস্থানে যাইবেন। অগত্যা মুচিরামও সঙ্গে চলিল। কর্ম্মস্থানে গিয়াও ঈশান মোনাপাড়ার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাঁহার গলায় পড়িল। মুচিরামও, যেখানে আহারের ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ নহে—তবে ঈশানবাবুর একটা ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশানবাবু বলিলেন, "বাপু, যদি গলায় পড়িলে, তবে একটু লেখাপড়া শিখিতে হইবে।" ঈশানবাবু তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন।

এখানে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সম্বাদ না পাইয়া, পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া, শেষ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে, যশোদানন্দন শ্রীশ্রীমুচিরাম শর্ম্মা—ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান—সম্পূর্ণরূপে মাতৃবিস্মৃত। যদি কখন মাকে মনে পড়িত, তবে সে আহারের সময়—ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্লমল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন, দানাদার গব্য ঘৃত, সুগন্ধি ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমৎস্য, পৃথিবীর ন্যায় নিটোল গোলাকার সদ্যভর্জ্জিত লুচির রাশি—এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন, "মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!" সে সময়ে মাকে মনে পড়িত—অন্য সময় নহে।

মুচিরামের পাঠশালার লেখা পড়া সমাপ্ত হইল—অর্থাৎ গুরু মহাশয় বলিল, সমাপ্ত হইয়াছে। মুচিরামের কোন গুণ ছিল না, এমত বলি না; তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইতাম না। মুচিরামের কণ্ঠস্বর ভাল ছিল বলিয়াছি—গুণ নম্বর এক। গুণ নম্বর দুই, তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইল। আর কিছু হইল না। ঈশানবাবু মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন।

মুচিরাম, ধেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢুকিয়া বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। মাষ্টরেরা তামাসা করে, ছোট ছোট ছেলেরা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে। মুচিরাম রাগ করে, কিন্তু পড়ে না। সুতরাং মাষ্টরেরা হারাণ অধিকারীর পথে গেলেন। আবার কাণমলায় কাণমলায় মুচিরামের কাণ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রথমে কাণমলা, তার পর বেত্রাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, কীলাঘাত, এবং ঘুসাঘাত। ঈশানবাবুর ঘরের তপ্ত লুচির জোরে মুচিরাম নির্ব্বিবাদে সব হজম করিল।

এইরূপে মুচিরাম, তপ্ত লুচি ও বেত খাইয়া, স্কুলে পাঁচ সাত বৎসর কাটাইল। কিছু হইল না। ঈশানবাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঈশানবাবুর দয়ার শেষ নাই—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি—মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল—ঈশানবাবু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "ঘুস ঘাস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া দিব।" মুচিরাম শর্ম্মা প্রথম দিনেই একটা হুকুমের চোরাও নকল দিয়া আট গণ্ডা পয়সা হাত করিলেন, এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই তাহা প্রতিবাসিনীবিশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন।

এদিকে ঈশানবাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া স্বকর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন এবং মুচিরামকে পৃথক্ বাসা করিয়া দিয়া, সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মুচিরাম ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার পোয়া বারো পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পোয়া বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুই চারি আনা লইত। তার পর দাও শিখিল। ফেলু সেখের ধানগুলি জমীদার জোর করিয়া কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া পুলিষকে হুকুম দিলেন, ফেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে। সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পুলিষের নামে পরওয়ানাখানি লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মুচিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেলু মুচিরামকে এক টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা, ক্রমে পাঁচ টাকা স্বীকার করিল—তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন মাজিষ্ট্রেটেরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না—

এক কোণে বসিয়া এক এক জন মুহুরি ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লিখত। সাক্ষীরা এক রকম বলিত, মুচিরাম আর এক রকম জোবানবন্দী লিখিতেন, মোকদ্দমা বুঝিয়া ফি সাক্ষ্য-প্রতি চারি আনা, আট আনা, এক টাকা পাইতেন। মোকদ্দমা বুঝিয়া মুচি দাঁও মারিতেন; অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইরূপে নানাপ্রকার ফিকির ফন্দীতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—তিনি একা নহেন, সকলেই করিত—তবে মুচি কিছু অধিক নির্লজ্জ—কখন কখন লোকের টেঁক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।

যাই হৌক, মুচি শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল—কোন্ মুচি না হয়?—অচিরাৎ সেই অকৃতনাম্নী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল। মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিঙ্গ—যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম করিতে নাই—সকলই মুচিবাবুর গৃহকে অহর্নিশি আলোক ও ধূমময় করিতে লাগিল। মুচিরামেরও চেহারা ফিরিতে লাগিল—গালে মাস লাগিল—হাড় ঢাকিয়া আসিল—বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় পৌছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল—শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্ব্বদা রঞ্জিত। রাত্রি দিন মাথায় তেড়ি কাটা, অধরে তাম্বুলের রাগ এবং কণ্ঠে নিধুর টপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়া বারো।

দোষের মধ্যে সাহেব বড় খিট্‌খিট্ করে। মুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কর্ম্মই ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে আবার দুর্জ্জয় লোভ,—সকল-তাতে মুচিরাম গালি খাইত! সাহেবটাও বড় বদরাগী—অনেক সময়ে মুচিরামকে কাগজ পত্র ছুঁড়িয়া মারিত। সাহেবের ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল—নচেৎ মুচিরামের চাকরী অধিক কাল টিকিত না।

সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলি হইয়া গেল—আর এক জন আসিল।

এই নূতন সাহেবটির নাম (Grongerham) লিখিবার সময়ে লোকে লিখিত গ্রঙ্গারহ্যাম—বলিবার সময়ে বলিত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব অতি ভদ্রলোক, দয়ার সাগর, কাহারও কোন অনিষ্ট করিতেন না, মোকদ্দমা করিতে গিয়া, কেবল ডিযমিশ করিতেন। তবে সাহেব কিছু অলস, কাজ কর্ম্মে বড় মন দিতেন না, এবং নিজে সরল বলিয়া তাঁবেদারদিগের উপর বড় বিশ্বাস ছিল। সকল কর্ম্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যত দিন সাহেব ঐ জেলায় ছিলেন, একদিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মুশাবিদা করেন নাই—হেড কেরাণী সব করিত।

সাহেব প্রথম আসিয়া, মুচিরামের কালোকোলো নধর সুচিক্কণ শরীরটি দেখিয়া, এবং তাহার আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দেখিয়া নিজের সরলচিত্তে একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আপিসের মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই গেল না। যাইবারও কোন কারণ ছিল না—কেন না, কাজ কর্ম্মের তিনি খবর রাখিতেন না। একদিন আপিসের মীর মুন্সী, মিরজা গোলাম সর্ফদর খাঁ সাহেব, ছুনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন। সাহেব পরদিনেই মুচিরামকে ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর মুন্সীর বেতন কুড়ি টাকা—কিন্তু বেতনে কি করে? পদটি রুধিরে পরিপ্লুত। অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্ম্মা রুধিরসঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

দোষ কি? অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। ছুইটা একজনে পারে না—মুচিরাম বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন; কোষ্ঠীতে তাহা লেখে নাই—অতএব বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশানুসারে মৃত্যুভয় রহিত হইয়া তিনি অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত। যদি সেই "হিতোপদেশ"-গুলি অধীত হইবার যোগ্য হয়—যদি সে গ্রন্থ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও পূজার যোগ্য হয়—তবে মুচিরামও প্রাজ্ঞ—আর এ দেশের সকল মুচিই প্রাজ্ঞ।

বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতবর্ষের মাকিয়াবেল্লি—চাণক্য ভারতের রোশফুকল। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, তাহাদিগের উচিত, আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা। তাহাদের শিক্ষা হয় নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম ছুই তিন বৎসর মীর মুন্সীগিরি করিল—তার পর কালেক্টরীর পেস্কারি খালি হইল। পেস্কারিতে বেতন পঞ্চাশ টাকা—আর উপার্জ্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম ভাবিল, কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব।

তখন কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময় হোম নামা এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মঠ লোক ছিলেন, কিন্তু একটা দোষ ছিল—কিছু মিষ্ট কথার বশ।

মুচিরাম একখানি ইংরেজী দরখাস্ত লিখাইয়া লইল—মুচিরামের নিজবিদ্যা দরখাস্ত পর্য্যন্ত কুলায় না। যে দরখাস্ত লিখিল, মুচিরাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, "দেখিও যেন ভাল ইংরেজী না হয়। আর যা হোক না হোক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুড়ি

"মাই লাড" আর "ইওর লার্ডশিপ" থাকে। লিপিকার সেই রকম দরখাস্ত লিখিয়া দিল। তখন শ্রীমুচিরাম বেশভূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার চারখানির ঢিলা পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া, থানের ধুতি শ্রীঅঙ্গে পরিধান করিলেন; চুড়িদার আস্তীন আল্লাকার চাপকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বুকফাঁক বন্ধকওয়ালা ঢিলে আস্তীন লাংক্লাথের চাপকান গ্রহণ করিলেন। লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া, স্বহস্তে মাথায় বিঁড়া জড়াইলেন; এবং চাঁদনির আম্‌দানি নূতন চক্‌চকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চারুচরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া, কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, একখান সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ চিঠি, দরখাস্ত ও বিহিত সজ্জাসহিত সেই শ্রীমুচিরামচন্দ্র, যথায় হোম সাহেব এজলাসে বসিয়া হুনিয়া জলুস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন।

রেল দেওয়া কাটরার ভিতর, উঁচুতে হোম সাহেব এজলাস করিতেছেন। চারি দিকে অনেক মাথায় পাগড়ি ও বসিয়াছে—লোকে কথা কহিলেই চাপরাশী বাবাজিউরা দাড়ি ঘুরাইয়া গালি দিতেছেন—একটা স্পানিয়েল টেবিলের নীচে শুইয়া, আথগণের নয়নপথে লাঙ্গুল-শোভা বিকাশ করিতেছে। এক ফোঁটা গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহস্র পিপীলিকা তাহা বেষ্টন করে, খালি চাকরিটির মালিক হোম সাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব উমেদওয়ারদিগের দরখাস্ত শুনিতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরেজীনবীশ আসিয়াছেন—সেকেলে কেঁদো কেঁদো স্কলার্শিপ হোল্‌ডর। সাহেব তাহাদিগকে এক এক কথায় বিদায় করিলেন। "I dare say you are well up in Shakspeare and Milton and Bacon and so forth. Unfortunately we don't want quotations from Shakspeare and Milton and Bacon in the office. It is not the most learned man who is best fitted for this kind of work. So you can go, Baboo." অনেকে শামলা মাথায় দিয়া, চেন ঝুলাইয়া, পরিপাটী বেশ করিয়া আসিয়াছিলেন; সাহেব দৃষ্টিমাত্র তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। "You are very rich I see; I want a poor man who will work for his bread. You will throw up your place on the slightest quarrel. You can go." শামলা চেনের দল, অভিমন্যুসম্মুখে কুরুসৈন্যের ন্যায় বিমুখ হইতে লাগিল। বাকি রহিল মুচিরাম, এবং তাহার সমকক্ষ জনকয়—বানর। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পড়িলেন—হাসিয়া বলিলেন, "Why do you call me, my Lord? I am not a Lord."

মুচিরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল, "বান্দা কো মালুম থা কি হজুর লার্ড-ঘরানা।"

এখন হোম সাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দূরসম্বন্ধ ছিল। সেই জন্য তাঁহার মনে বংশমর্য্যাদা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল; মুচিরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বলিলেন, "হো সকতা; লার্ড ঘরানা হো সকতা; লার্ড ঘরানা হোনে সে হি লার্ড হোতা নেহি।"

সকলেই বুঝিল যে, মুচিরাম কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল, "বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হজুর লার্ড হেঁয়।"

সাহেব মুচিরামকে আর দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেস্কারিতে বহাল করিলেন।

Struggle for existence? Survival of the Fittest! মুচির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী।

হোম সাহেবের কিছু মাত্র দোষ নাই। দেশী, বিদেশী, সকল মনুষ্যই এইরূপ। সকলেই মিষ্ট কথার বশ। অবোধ বাঙ্গালীরা আজকাল মিষ্ট কথা ভুলিতেছে। হোম সাহেব একজন অতিশয় সুদক্ষ, সুবিজ্ঞ লোক। মূর্খ মুচিরামও তাঁহাকে ভুলাইতে পারিল—কেবল মিষ্ট কথার বলে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুচিরামবাবু—এখন তিনি একটা ভারি রকম বাবু, এখন তাঁহাকে শুধু মুচিরাম বলা যাইতে পারে না—মুচিরামবাবু পেস্কারি পাইয়া বড় ফাঁফরে পড়িলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে পেস্কারি পর্য্যন্ত কুলায় না—কাজ চলে কি প্রকারে? "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—মুচিরামবাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একজন তাইদনবীশ সেই কালেক্টরী আপিসে থাকে। ভজগোবিন্দ বার বৎসর তাইদনবীশ আছে। সে বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ, কালেক্টরীর সকল কর্ম্ম কাজ বার বৎসর ধরিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু মুরুব্বি নাই—ভাগ্য নাই—এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। তাহার বাসাখরচ চলে না। মুচিরাম তাহাকে অবলম্বন করিলেন। আপনার বাসায় লইয়া গিয়া রাখিলেন। ভজগোবিন্দ মুচিরামের বাসায় থাকে, খায় পরে, গৃহকর্ম্মে সহায়তা করে, রাত্রিকালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহেবী করে, এবং আপিসের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়। মুচিরাম তাহাকে টাকাটা সিকেটা দেওয়াইয়া দেন। ভজগোবিন্দের সাহায্যে মুচিরামের কর্ম্ম কাজ

রেলগাড়ির মত গড়গড় করিয়া চলিল। হোম সাহেব অনেক প্রশংসা করিতেন। বিশেষ মুচিরাম বিশুদ্ধ প্রণালীতে সেলাম করিত, এবং "মাই লার্ড" এবং "ইওর আনর" কিছুতেই ছাড়িত না।

মুচিরামবাবুর উপার্জ্জনের আর সীমা রহিল না। হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল। ভজগোবিন্দ বলিল, "টাকা ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই—তালুক মুলুক করুন।" মুচিরাম সম্মত হইলেন, কিন্তু যে যে জেলায় কর্ম্ম করে, সে জেলায় বিষয় খরিদ করা নিষেধ। ভজগোবিন্দ বলিল যে, বেনামীতে কিনুন। কাহার বেনামীতে? ভজগোবিন্দের ইচ্ছা, ভজগোবিন্দের নামেই বিষয় খরিদ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিল না। এ দিকে মুচিরাম কাহারও বাসায় গল্প শুনিয়া আসিলেন যে, স্ত্রীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই। কথাটায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল কি না জানি না—কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে, স্ত্রীর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। এই এখনকার দেবত্র। আগে লোকে বিষয় করিত ঠাকুরের নামে—এখন বিষয় করিতে হয় ঠাকুরুণের নামে। উভয় স্থলেই বিষয়কর্ত্তা "সেবাইত" মাত্র—পরম ভক্ত—পাদপদ্মে বিক্রীত। এইরূপ রাধাকান্ত জিউর স্থানে রাধামণি, শ্যামসুন্দরের স্থানে শ্যামসুন্দরী দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, জানি না—তবে একটা কথা বুঝা যায়। বিষয় হস্তান্তরের কিছু সুবিধা হইয়াছে। দধি ভোজনের পক্ষে নেপোর খুব সুযোগ হইয়াছে।

স্ত্রীর বেনামীতে বিষয় করা শ্রেয়ঃ, ইহা মুচিরাম বুঝিলেন, কিন্তু এই সঙ্কল্পে একটা সামান্য রকম বিঘ্ন উপস্থিত হইল—মুচিরামের স্ত্রী নাই। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ করা হয় নাই—অনুকল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু এ স্থলে অনুকল্প চলিবে কি না, তদ্বিষয়ে পেস্কার মহাশয় কিছু সন্দিহান হইলেন। ভজগোবিন্দের সঙ্গে কিছু বিচার হইল—কিন্তু ভজগোবিন্দ একপ্রকার বুঝাইয়া দিল যে, এ স্থলে অনুকল্প চলিবে না। অতএব মুচিরাম দারগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোন্ কুল পবিত্র করিবেন, তাহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ভজগোবিন্দ জানাইল যে, তাহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—ভজগোবিন্দের পিতৃকুল উজ্জ্বল করায় ক্ষতি নাই। অতএব মুচিরাম একদিন সন্ধ্যার পর শুভ লগ্নে মাথায় টোপর দিয়া, হাতে সুতা বাঁধিয়া, এবং পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রকালী নাম্নী ভজগোবিন্দের সহোদরাকে সৌভাগ্যশালিনী করিলেন। তাহার পর হইতে ভদ্রকালীর নামে অনেক জমীদারী পত্তনী ছলে, বলে, কলে, কৌশলে খরিদ হইতে লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে একজন প্রধানা ভূম্যধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

ভদ্রকালীর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়—মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট—বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌদ্দ বৎসরের হইল। চৌদ্দ বৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরির জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল, সুতরাং মুচিরাম চেষ্টা চরিত্র করিয়া ভজগোবিন্দের একটি মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন।

ইহাতে মুচিরাম কিছু বিপন্ন হইলেন। এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হইল—সে মনোযোগ দিয়া নিজের কাজ করে; মুচিরামের কাজ করিয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র—শীঘ্রই হোম সাহেবের প্রিয়পাত্র হইল। মুচিরামের কাজের যে সকল ত্রুটি হইতে লাগিল, হোম সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আভূমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বুলির গুণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিলেন। মুচিরামের প্রতি তাঁহার দয়া অচলা রহিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সময়ে হোম সাহেব বদলি হইয়া গেলেন, তাঁহার স্থানে রীড সাহেব আসিলেন। রীড অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতি অল্প দিনেই বুঝিলেন—মুচিরাম একটি বৃক্ষভ্রষ্ট বানর—অকর্ম্মা অথচ ভারি রকমের ঘুষখোর। মুচিরামকে আপিস হইতে বহিষ্কৃত করা মনে স্থির করিলেন। কিন্তু রীড সাহেব যেমন বিচক্ষণ, তেমনি দয়াশীল ও ন্যায়বান্; সে কালের হেলীবরির সিবিলিয়ান সাহেবেরা বাঙ্গালীদিগকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। মিছে ছুতাছলে কাহাকে অন্নহীন করিতে রীড সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছুক; কাহাকে একেবারে অন্নহীন করিতে অনিচ্ছুক। মুচিরাম যে বিপুল ভূসম্পত্তি করিয়াছে—রীড সাহেব তাহা জানিতে পারেন নাই। রীড সাহেব মুচিরামকে দুই একবার ইস্তেফা দিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুচিরাম চোখে জল আনিয়া দুই চারি বার "গরিব খানা বেগর মারা যায়েগা" বলাতে তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন। তার পর, তাহাকে পেস্কারির তুল্য বেতনে আবকারির দারোগাই দিতে চাহিয়াছিলেন—অন্যান্য মফস্বলি চাকরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু আবার মুচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে যে, আমার শরীর ভাল নহে, মফস্বলে গেলে মরিয়া যাইব—হুজুরের চরণের নিকট থাকিতে চাই। সুতরাং দয়ালুচিত্ত রীড সাহেব নিরস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাকে লইয়া আর কাজও চলে না। অগত্যা রীড সাহেব মুচিরামকে ডিপুটি কালেক্টর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গাল আপিসে সেক্রেটরি ছিলেন—রিপোর্ট পৌঁছিবামাত্র মুচিরাম ডিপুটি বাহাদুরিতে নিযুক্ত হইলেন।

রীড সাহেব ইহাতে বিজ্ঞ লোকের মতই কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, ভারি ঘুষখোরেও ডিপুটি হইলেই ঘুষ খাওয়া ত্যাগ করে; ডিপুটিগিরি এক প্রকারে আমলাদিগের বৈধব্য—বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই। আর মুচিরাম যে মূর্খ, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; সেরূপ অনেক ডিপুটি আছে; ডিপুটিগিরিতে বিদ্যা-বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব রীড সাহেব লোকহিতার্থ মুচিরামকে ডিপুটি করিবার জন্য রিপোর্ট করিয়াছিলেন।

আপিসে সম্বাদ পৌঁছিল যে, মুচিরামের উচ্চ পদ হইয়াছে। একজন বুড়া মুহুরি ছিল, সে বড় সাধুভাষা বুঝিত না। "উচ্চ পদ" শুনিয়া সে বলিল, "কি? ঠ্যাঙ্গ উঁচু করেছেন না কি? ভাগাড়ে দিয়া আইবা।"

দশম পরিচ্ছেদ

মুচিরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি পেস্কারিতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার করেন—আড়াই শত টাকার ডিপুটিগিরিতে তাঁহার কি হইবে। মুচিরাম সিদ্ধান্ত করিলেন—ডিপুটিগিরি অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ভজগোবিন্দ বুঝাইলেন যে, অস্বীকার করিলে রীড সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে, মুচিরাম ঘুষের লোভে পেস্কারি ছাড়িতেছে না—তাহা হইলে শীঘ্রই তাড়াইয়া দিবে। তখন দুই দিক্ যাইবে। অগত্যা মুচিরাম ডিপুটিগিরি স্বীকার করিলেন।

মুচিরাম ডিপুটি হইয়া প্রথম রূবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে, শ্রীযুক্ত বাবু মুচিরাম গুড় রায় বাহাদুর ডিপোটি কালেক্টর। প্রথমটা বড়ই আহ্লাদ হইল—কিন্তু শেষ কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মুহুরি রূবকারী লিখিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে—গুড়টা নাই লিখিলে। শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুর লেখায় ক্ষতি কি? কি জান, আমরা গুড় বটে, কিন্তু আমাদের খেতাব রায়। তবে যখন অবস্থা তেমন ছিল না, তখন রায় খেতাব আমরা লিখিতাম না। তা' এখন গুড়েও কাজ নাই—রায়েও কাজ নাই, শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুর লিখিলেই হইবে।" মুহুরি ইঙ্গিত বুঝিল, হাকিমের মন সবাই রাখিতে চায়। সে মুহুরি দ্বিতীয় রূবকারীতে লিখিল, "বাবু মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর।" মুচিরাম দেখিয়া কিছু বলিলেন না, দস্তখত করিয়া দিলেন। সেই অবধি মুচিরাম "রায়" চলিতে লাগিল; কেহ লিখিত, "মুচিরাম রায়,

রায় বাহাদুর," কেহ লিখিত, "রায় মুচিরাম রায় বাহাদুর।" মুচিরামের একটা যন্ত্রণা ঘুচিল—গুড় পদবীতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, এখন সে জ্বালা গেল। তবে লোকে অসাক্ষাতে বলিত "গুড়ের পো"—অথবা "গুড়ে ডিপুটি।" আর স্কুলের ছেলেরা কবিতা করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত,

"গুড়ের কল্‌সীতে ডুবিয়ে হাত
বুঝতে নারি সার কি মাত ?"

কেহ বলিত,

"সরা মাল্‌সায় খুসি নই।
ও গুড় তোর নাগরী কই ?"

মুচিরাম তাহাদের তাড়াইয়া মারিতে গেলেন, তাহারা তাঁহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সন্দর্শন করাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে পলাইল। লাভের মধ্যে মুচিরাম লম্বা কোঁচা বাধিয়া আছাড় খাইলেন—ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষে মুচিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া দিয়া কবিতা হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু আর একটা নূতন গোল হইল। শীতকালে খেজুরে গুড়ের সন্দেশ উঠিল—ময়রারা তাহার নাম দিল ডিপুটি মণ্ডা।

বাজারে যাহা হউক, সাহেবমহলে মুচিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডিপুটি আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ—

প্রথম। সেই মিষ্ট কথা। একবার তিনি কমিশনর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এতেলা হইবামাত্র বলিলেন, "নেকাল দেও শালাকো।" বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেইখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে।"

দ্বিতীয়। মুচিরাম ডিপুটির হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্চমের কাজ ছিল—অন্য কাজ বড় ছিল না। হপ্তম পঞ্চমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন হইত না—তাতে আবার মুচিরাম বিচার আচারের বড় ধার ধারিতেন না—চোখ বুজিয়া ডিক্রী দিতেন—নথির কাগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং মাস্কাবার দেখিয়া সাহেবেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। জনরব যে, মুচিরামের একেবারে হঠাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবৃদ্ধি হইবে। কতকগুলা চেঙ্গড়া ছোঁড়া শুনিয়া বলিল, "আবও পদবৃদ্ধি ? ছটা পা হবে না কি ?"

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। গোল মিটাইবার জন্য সেখানকার কমিশ্যনর একজন ভারি বিচক্ষণ ডিপুটি কালেক্টর পাইবার প্রার্থনা করিলেন। বোর্ড বলিলেন—বিচক্ষণ ডিপুটি ? সে ত মুচিরাম ভিন্ন আর কাহাকে দেখি না—তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান হৌক। গবর্ণমেণ্ট সেই কথা মঞ্জুর করিয়া মুচিরামকে চাটিগাঁ বদলি করিলেন।

সম্বাদ পাইয়া মুচিরাম বলিলেন, এইবার চাকরি ছাড়িতে হইল। তাঁহার শোনা ছিল, চাটিগাঁ গেলেই লোকে জ্বর প্লীহা হইয়া মরিয়া যায়। আরও শোনা ছিল, চাটিগাঁ যাইতে সমুদ্র পার হইতে হয়—একদিন এক রাত্রের পাড়ি। সুতরাং চাটিগাঁ যাওয়া কি প্রকারে হইতে পারে ? বিশেষ ভদ্রকালী—ভদ্রকালী এখন পূর্ণযৌবনা—সে বলিল, "আমি কোন মতেই চাটিগাঁ যাইব না—কি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যদি যাও, তবে আমি বিষ খাইব।" এই বলিয়া ভদ্রকালী একটা বড় খোরা লইয়া তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। ভদ্রকালী তেঁতুল ভালবাসিতেন—মুচিরাম বলিতেন, "ওতে ভারি অম্ল হয়—ও বিষ।" তাই ভদ্রকালী তেঁতুল গুলিতে বসিলেন—মুচিরাম হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন—ভদ্রকালী তাহা না শুনিয়া "বিষ খাইব" বলিয়া সেই তেঁতুলগোলায় লবণ ও শর্করা সংযোগপূর্ব্বক আধ সের চাউলের অন্ন মাখিয়া লইলেন। মুচিরাম অশ্রুপূর্ণলোচনে শপথ করিলেন যে, তিনি কখনই চাটিগাঁ যাইবেন না। ভদ্রকালী কিছুতেই শুনিল না—সমুদায় তেঁতুলমাখা ভাতগুলি খাইয়া বিষপান-কার্য্য সমাধা করিল। মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকরিতে ইস্তেফা পাঠাইয়া দিলেন।

স্থূল কথা, মুচিরামের জমীদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ডিপুটিগিরির সামান্য বেতন, তাঁহার ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চাকরি ছাড়িয়া দিয়া মুচিরাম ভদ্রকালীকে বলিলেন, "প্রিয়ে।" (তিনি সে কালের যাত্রার বাছা বাছা সম্বোধন পদগুলি ব্যবহার করিতেন) "প্রিয়ে। বিষয় যেমন আছে—তেমনি একটি বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী করিলে হয় না ?"

ভদ্র। দাদা বলে, এখানে বড় বাড়ী করিলে, লোকে বল্‌বে, ঘুষের টাকায় বড় মানুষ হয়েছে।

মুচি। তা, এখানেই বা বাড়ী করায় কাজ কি? এখানে বুক পূরে বড়ামানুষি করা যাবে না। চল, আর কোথাও গিয়া বাস করি।

ভদ্রকালী সম্মত হইলেন, কিন্তু নিজ পিত্রালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামেই বাস করাই বিধেয় বলিয়া পরামর্শ দিলেন। ফলে ভদ্রকালী আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না।

মুচিরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, যত বড়মানুষের বাড়ী কলিকাতায়—তিনিও বড়মানুষ, সুতরাং কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এখন ভদ্রকালীর এক মাতুল, একদা কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়া, এক কালে কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়াছিলেন, এবং বাটী গিয়া গল্প করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার কুলকামিনীগণ সজ্জিতা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাকে ভূতলস্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাঁহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া সর্ব্বজননয়নপথবর্ত্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের স্বার্থকতা হয়—ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন।

তখন ভজগোবিন্দ ছুটি লইয়া, আগে কলিকাতায় বাড়ী কিনিতে আসিল। বাড়ীর দাম শুনিয়া, মুচিরামের বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল—যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না,—অট্টালিকা ক্রীত হইল। যথাকালে মুচিরাম ও ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া নূতন গৃহে বিরাজমান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার কুলকামিনী রাজপথ আলোকিত করা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ। যাহারা রাজপথ কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকালী রাখেন না—সুতরাং তাঁহার কলিকাতায় আসা বৃথা হইল। বিশেষ দেখিলেন, তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া কলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ব্ব ঘুচিয়া গেল।

মুচিরামের কলিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তিনি প্রত্যহ গাড়ী করিয়া বাজার যাইতেন, এবং যাহা দেখিতেন, তাহাই কিনিতেন। বাবুটি নূতন আমদানি দেখিয়া

বিক্রেতৃবর্গ পাঁচ টাকার জিনিসে দেড় শত টাকা হাঁকিত, এবং নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ টাকা না পাইলে ছাড়িত না। হঠাৎ মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল যে, বাবুটি মধুচক্রবিশেষ। পাড়ার যত বানর মধু লুঠিতে ছুটিল। জুয়াচোর, বদমাশ, মাতাল, লম্পট, নিষ্কর্ম্মা ভাল ধুতি চাদর, জুতা ও লাঠিতে অঙ্গ পরিশোভিত করিয়া, চুল ফিরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ করিতে আসিল। মুচিরাম তাহাদিগকে কলিকাতার বড় বড় বাবু মনে করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল—তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজানা বাজায়, গান করে, পোলাও ধ্বংসায়, এবং বাবুর প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া আনে। টাকাটায় আপনারা বার আনা মুনাফা রাখে, বলে, দাঁওয়ে যোওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি। উভয় পক্ষের সুখের সীমা রহিল না।

যে গলিতে মুচিরাম বাড়ী লইয়াছিলেন, সেই গলিতে একজন প্রথমশ্রেণীর বাটপাড় বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্রবাবু প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়—একটু ব্রাণ্ডি বা একখানা কাটলেটের লোভে কাহারও আনুগত্য করিবার লোক নহেন। তাঁহার ত্রিতল গৃহ, প্রস্তরমুকুর কাষ্ঠ কাচ কার্পেটাদিতে সকুসুম উদ্যানতুল্য রঞ্জিত; তাঁহার দরওয়াজায় অনেকগুলা দ্বারবান্ গালচাল্লা বাঁধিয়া সিদ্ধি ঘোঁটে; আস্তাবলে অনেকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনা যায়—তিনখানা গাড়ী আছে, সোণাবাঁধা হুঁকা, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হ্যাণ্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক, এবং তাড়াবাঁধা 'কাগজ'—সকলই ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর,—জুয়াচুরিতেই এ সকল হইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন, টাকার বোঝা লইয়া একটা গ্রাম্য গর্দ্দভ পাড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন ভাবিলেন যে, গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করিতে হইবে। আহা! অবোধ পশু! এত ভারি বোঝা বহিবে কি প্রকারে—বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করি।

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। রামচন্দ্রবাবু বড়লোক—মুচিরামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়া একজন অনুচর মুচিরামের কাণে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্রবাবু কলিকাতার অতি প্রধান লোক, আর মুচিরামের প্রতিবাসী—মুচিরামের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতি ব্যস্ত। সুতরাং মুচিরাম গিয়া উপস্থিত।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে লাগিল। ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি। রামচন্দ্রবাবুর সেই ইচ্ছা।

তিনি চতুর, মুচিরাম নির্ব্বোধ ; মুচিরাম গ্রাম্য, তিনি নাগরিক। অল্প কালেই মুচিরাম-মৎস্য ফাঁদে পড়িল—রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল। রামচন্দ্র তাঁহার মুরুব্বি হইলেন—মুচিরামের নাগরিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহে শিক্ষাগুরু হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তিনি নাগরিক জীবননির্ব্বাহে মুচিরামের শিক্ষাগুরু—কলিকাতারূপ গোচারণভূমে তাঁহার রাখাল—কালীঘাট হইতে চিতপুর পর্য্যন্ত, তখন মুচিরামবলদ সুখের গাড়ি টানিয়া যায়, রামবাবু তখন তাহার গাড়োয়ান ; সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি জুড়িয়া, রামচন্দ্র পাকা কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাঁহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য বানর সহুরে বানরে পরিণত হইল। কি গতিকের বানর, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ পড়িলেই বুঝা যাইতে পারে। এই সময় তিনি ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা গেল—

"তোমার পুত্রের বিবাহ শুনিয়া আহ্লাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না—মাপ করিও। দুইখানা গাড়ী কিনিয়াছি—একখানা বেরুষ—একখানা ব্রৌনবেরি। একটা আরবের যুড়িতে ২২০০ টাকা পড়িয়াছে। ছবিতে, আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার এত খরচ, তাহা জানিলে কখন আসিতাম না—সেখানে সাত সিকায় কাপড় ও মজুরিসমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত—এখানে একটা চাপকানে ৮৫৲ টাকা পড়িয়াছে। এক সেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের কথা বলিতেছি না—এ সেট টেবিলের জন্য। বরকন্যাকে আমার হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।"

এই হলো বানরামি নম্বর এক। তার পর, মুচিরাম, কলিকাতায় যে কেহ একটু খ্যাতিযুক্ত, তাহারই বাড়ীতে, রামচন্দ্রবাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন নামজাদা বাবু তাঁহার বাড়ীতে আসিলে জন্ম সার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে, সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। এইরূপ আচরণে, রামবাবুর সাহায্যে, কলিকাতার সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। টাকার মান সর্ব্বত্র ; মুচিরামের টাকা আছে ; সুতরাং সকলেরই কাছে তাঁহার মান হইল।

তার পর মুচিরাম কলিকাতার ইংরেজ মহল আক্রমণ করিলেন। রামবাবুর পরিচয়ে যত ছোট বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত করিলেন। অনেক যায়গাতেই ঝাঁটা লাথি খাইলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্ট কথা পাইলেন। অনেক স্থানেই একজন মাতালো জমীদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

তার পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশ্যনে ঢুকিলেন। নাম লেখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। রামবাবু কথিত মহামহিমমহাসভার "একটি বড় কামান।" তিনি যখনই বড় কামান দাগিতে যাইতেন, এই ছোট মুচিপিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন—সুতরাং পিস্তলটি ক্রমে মুখ খুলিয়া পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় একজন বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথামুণ্ড, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার। মুচিরাম নিজে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পড়িয়া নিন্দা করিত না। সুতরাং মুচিরাম ক্রমে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন। যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন যায়গায় যাইতেই ছাড়িত না। গবর্ণমেণ্ট হৌসে ও বেলবিডীরে গেলে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে গবর্ণমেণ্ট হৌসে ও বেলবিডীরে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট সুপরিচিত হইল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নম্র, নিরহঙ্কারী, নিরীহ লোক বলিয়া জানিলেন। জমীদারী সভার একজন নায়ক বলিয়া পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়াছিলেন।

সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌন্সিলে একটি পদ খালি হইল। একজন জমীদারী সভার অধিনায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির করিলেন। বাছনি করিতে মনে মনে ভাবিলেন, "মুচিরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে? নিরহঙ্কারী, নিরীহ—সেকেলে খাঁটি সোণা, একালের ঠন্‌ঠনে পিতল নয়। অতএব মুচিরামকে বাহাল করিব।"

অচিরাৎ অনরেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বড় বাড়াবাড়িতে অনরেবল মুচিরাম রায়ের রুধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবিন্দ ফিকিরফন্দিতে অল্প দামে অধিক লাভের বিষয়গুলি কিনিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় ক্রীত সম্পত্তির আয় বাড়িয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতেও অনাটন হইয়া আসিল। দুই একখানি তালুক বাঁধা পড়িল—রামচন্দ্রবাবুর কাছে। রামচন্দ্রবাবুর সঙ্কল্প এত দিনে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—এই জন্য তিনি আত্মীয়তা করিয়া মুচিরামকে এত বড় বাবু করিয়া তুলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অর্দ্ধেক মূল্যে তালুকগুলি বাঁধা রাখিলেন —জানেন যে, মুচিরাম কখনও শুধরাইতে পারিবে না—অর্দ্ধেক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে। আরও তালুক বাঁধা পড়ে, এমন গতিক হইয়া আসিল। এই সময়ে ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল যে, গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাহার ভগিনীপতির হাতধরা—এই সুযোগে একটা বড় চাকরী যোটাইয়া লইতে হইবে—এই ভরসায় ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন, মুচিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন।

বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। তালুকে যান।"

মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, "তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।" মুচিরাম খুশী হইয়া, ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল।

চন্দনপুর নামে তালুক—সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত—কিন্তু সে মহালে কিছু না। কখন মুচিরাম প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গন মাথট লয়েন নাই। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক—তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে সশরীরে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত—বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দাও।" প্রজারা দয়া করিল—প্রজা সুখে থাকিলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া করিতে প্রস্তুত। জমীদার আসিয়াছে সম্বাদ পাইয়া, পালে পালে প্রজা, টেঁকে টাকা লইয়া মুচিরাম-দর্শনে আসিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামের চেষ্ট টাকায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আর একদিকে তাঁহার আর একপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল।

প্রজারা দলে দলে মুচিরাম-দর্শনে আসে—কোন দিন পঞ্চাশ, কোন দিন ষাট, কোন দিন আশী, কোন দিন একশত এইরূপ। যাহাদের বাড়ী নিকট, তাহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া একটা বাগানের ভিতর রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। মহালটি একে খুব বড়—মুচিরামের এত বড় জমীদারী আর নাই—তাহাতে গ্রামগুলির মধ্যে বিল খাল অনেক থাকায়, দুই চারিজন প্রজাকে প্রায় রাঁধিয়া খাইয়া যাইতে হইত। একদিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে—তাহাদের বাড়ী একটা ভারি জলা পার; নিকাশ প্রকাশে তাহাদের বেলা গেল; তাহারা বাড়ী ফিরিতে পারিল না। বাগানে রাঁধাবাড়া করিতে লাগিল। রাত্রি থাকিয়া প্রাতে যাত্রা করিবে। তাহারা যখন খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকটস্থ মাঠ পার হইয়া, অশ্বযানে, একটি সাহেব যাইতেছিলেন।

সাহেবটির নাম মীন্‌ওয়েল্‌। তিনি ঐ জেলার প্রধান রাজপুরুষ—মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর। সাহেবটি ভাল লোক—ন্যায়বান্‌—হিতৈষী, এবং পরিশ্রমী। কিসে এ দেশের লোকের মঙ্গল সাধন করিবেন, সেই জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে বৎসর ঐ অঞ্চলে একটা দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সাহেব দুর্ভিক্ষ তদারকে বাহির হইয়াছিলেন। নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছিল—তিনি এখন অশ্বারোহণে তাম্বুতে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলা লোক ভোজন করিতেছে।

দেখিয়াই সহজেই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসী দরিদ্র লোক, কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন করাইতেছে। সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য, নিকটে একজন চাসাকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

চাসা অবশ্য ইংরেজী জানে না। সাহেব উত্তম বাঙ্গালা জানেন, পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন; সুতরাং চাসার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সাহেব চাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাডিগের গ্‌ড়ামে* ডুড়্‌বেক্কো† কেমন আছে?"

চাসা ত জানে না ডুড়্‌বেক্কো কাহাকে বলে। সে ফাঁফরে পড়িল। ডুড়্‌বেক্কো কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম হইবে, ইহা একপ্রকার স্থির হইল। কিন্তু "কেমন আছে?" ইহার উত্তর কি দিবে? যদি বলে যে, সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব

* গ্রামে। † দুর্ভিক্ষ।

হয় ত এক ঘা চাবুক দিবে, যদি বলে যে, ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয় ত ডুড়ুবেক্কাকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে ; তাহা হইলে কি করিবে ? চাসা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, "বেমার আছে।"

"বেমার—Sick ?" সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, "Well, there may be much sickness without there being any scarcity—the fellow does not understand perhaps ; these people are so dull—I say ডুড়বেক্কা কেমন আছে—অটিক আছে কিম্বা অল্প আছে ?"

এখন চাসা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে, এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য হাকিম। (সে দেশে নীলকর নাই) হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, ডুড়ুবেক্কা অধিক আছে, কি অল্প আছে—তখন ডুড়ুবেক্কা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল, কই, আমরা ত ডুড়ুবেক্কার টেক্স দিই না ; কিন্তু যদি বলি, আমাদের গ্রামে সে টেক্স নাই—তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে। অতএব মিছা কথা বলাই ভাল। সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাডের গ্ড়ামে ডুড়ুবেক্কা অটিক কিম্বা অল্প আছে ?"

চাসা উত্তর করিল, "হুজুর, আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুড়ুবেক্কা আছে।"

সাহেব ভাবিলেন, "Humph ! I thought as much—" পরে বাগানে যে সকল লোক খাইতেছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বোজন করিল ?" (উদ্দেশ্য "ভোজন করাইল")

চাসা। প্রজারা ভোজন কোচ্ছে।

সাহেব, চটিয়া, "টাহা আমি জানে—They eat, that I see—but who pays ?—টাকা কাহাড় ?"

এখন সে চাসা জানে যে, যত টাকা আসিতেছে, সকলই জমীদারের সিন্দুকে যাইতেছে ; সে নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল—অতএব এবার বিনা বিলম্বে উত্তর করিল, "টাকা জমীদারের।"

সাহেব। Ah ! there it is ; they do their duty—how it is that some people find pleasure in maligning them ? জমীদারের নাম কি ?

চাসা। মুচিরাম রায়।

সাহেব। কট ডিবস বোজন কড়িয়াছে ?

চাসা। তা ধর্ম্মাবতার, প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া দাওয়া করে।

সাহেব। এ গ্ড়ামের নাম কি ?

চাসা। চন্ননপুর।

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিলেন,

For Famine Report

"Babu Muchiram Ray, Zemindar of Chinnapur—feeds every day a large number of his ryots."

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া টাপে চলিলেন। চাসা আসিয়া গ্রামে রটাইল, একটা সাহেব টাকায় আট আনা হিসাবে টেক্স বসাইতে আসিয়াছিল, চাসা মহাশয়ের বুদ্ধিকৌশলে বিমুখ হইয়াছে।

এ দিকে মীন্‌ওয়েল্ সাহেব যথাকালে ফেমিন্ রিপোর্ট লিখিলেন। একটি পারাগ্রাফ শুবু মুচিরাম রায় সম্বন্ধে। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, মুচিরাম জমীদারদিগের আদর্শস্থল। এই দুঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রজাগুলির প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

রিপোর্ট কমিশ্যনরীতে গেল। কমিশ্যনরের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া—কমিশ্যনর সাহেব লেখক ভাল—গবর্ণমেণ্টে গেল। গবর্ণমেণ্টের এই বিবেচনা—যে যার প্রজা, সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলেই "দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের" উত্তম মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামের ন্যায় বদান্য জমীদারদিগকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টর নিকট অনুরোধ করিলেন যে, বাবু মুচিরাম রায় মহাশয়কে—পাঠক একবার হরি হরি বল—রাজাবাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট বলিলেন, তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর। তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।

সম্পূর্ণ